কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো : কলিকাতা

KABI SATYENDRANATHER GRANTHABALI
EDITED BY BISU MUKHOPADHYAY
VOLUME : TWO

প্রথম প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

"তাপস তুমি ! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি'
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠ্‌ল জীয়ে ভস্মরাশি !
মৌন মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়জয়ন্তী গাইল তারা নূতন ক'রে তোমার সুরে !
শব্দ-সাগর যেথায় ছিল, মিলিয়ে দিলে সেই মোহানায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগ্‌লা-ঝোরা, সরযূ সাথে শোণ-যমুনায় !

আন্‌লে ভ'রে ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলিল !
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোনার বীণায় হার-মানালো !
'কুহু-কেকা'য় ফুল-ফাগুয়ায় চম্‌কে ওঠে বিজলী-আলো !
'অভ্র-আবীর' অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি—
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' !"

মোহিতলাল মজুমদার

সম্পাদকীয়

'কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান ঘটেছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। নানা কারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহের অসুবিধা এবং বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে মুদ্রণকার্য ব্যাহত হওয়াও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই গ্রন্থাবলীর আরও দুটি বৃহৎ খণ্ড প্রকাশিত হবে এবং আমরা সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমূহ রচনাবলীই উক্ত দুই খণ্ডের অন্তর্ভূত করে যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশ করতে সমর্থ হব বলে আশা করি।

প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসমূহের মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একটি দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লেখেন এবং স্নেহভাজন অধ্যাপক ডঃ অলোক রায় বংশতালিকাসহ বিশদ তথ্যবহুল জীবন-কথা রচনা করেন। এই ভূমিকা ও জীবন-কথা পরবর্তী খণ্ডগুলিতে পুনর্মুদ্রণ আমরা সমীচীন মনে না করায়, এই খণ্ডে সে দুটি সংশ্লিষ্ট হয়নি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হ'ল : যাঁরা গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেন, তাঁরা একটি খণ্ড হস্তগত করেই নিশ্চেষ্ট থাকেন না, যথাসম্ভব চেষ্টা করেন অবশিষ্ট খণ্ডগুলি সংগ্রহ করতে। সে কারণ প্রতিটি খণ্ডে ঐ একই ভূমিকা ও জীবন-কথা মুদ্রিত করে গ্রন্থের মূল্যভার বৃদ্ধি করার কোন সার্থকতা আছে বলে আশা করি কেউই মনে করবেন না।

এই গ্রন্থাবলীর খণ্ডগুলির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে প্রতি খণ্ডের মূল্য কিছু কম করার পক্ষেও অনেকে হয়ত যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু এই চার খণ্ডের পরিবর্তে সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীকে যদি আট খণ্ডে বিভক্ত করা হ'ত, তা'হলে তার মূল্য একত্রে নিশ্চয়ই যে চার খণ্ডের সমতুল হওয়া সম্ভব ছিল না, তা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করবেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বসাকল্যে চিন্তা করলে, প্রকাশিত খণ্ডগুলির বৃহৎ আকার, মূল্যবান কাগজ, চিত্রাবলী, মুদ্রণ-সৌকর্য প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ব্যয়ের তুলনায় যে মূল্য ধার্য হয়েছে, বর্তমান সময়ের পক্ষে তা মোটেই অসঙ্গত হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল গ্রন্থ এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে তিনটি অনূদিত কাব্যগ্রন্থের অন্যতম 'তীর্থরেণু' এবং অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি 'ফুলের ফসল' ও অপরটি 'কুহু ও কেকা'। প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডেও এই কাব্যগ্রন্থগুলির প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে 'বেণু ও বীণা' (১৩১৩) কাব্যগ্রন্থের পর আসে 'হোমশিখা' (১৩১৪) এবং তারপর 'তীর্থ-সলিল' (১৩১৫)। অতঃপর এসেছে গদ্য ও নাট্য-সাহিত্য। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই আমরা পাবো 'তীর্থরেণু' (১৩১৭), তারপর 'ফুলের ফসল' (১৩১৮) এবং 'কুহু ও কেকা' (১৩১৯)। কাব্য-গ্রন্থগুলির পর এই খণ্ডেও আছে কিছু গদ্য ও নাট্য রচনা। একটি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত নাটক 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৩৩৬) ও অপরটি গ্রন্থ হিসাবে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত ছন্দ-বিষয়ক রচনা 'ছন্দ-সরস্বতী'। এই 'ছন্দ-সরস্বতী' নিবন্ধটির বৈশিষ্ট্য বিদ্বজন সমাজে দীর্ঘদিন আলোচিত হলেও এবং প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় ও পরবর্তীকালে 'শনিবারের চিঠি'-তে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও, ডঃ অলোক রায়ের সম্পাদনায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মাত্র ১৩৬৮ সালে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'গ্রন্থপরিচয়'-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

গদ্য-সাহিত্যেও তীক্ষ্ণধী সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কুশলী ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছে অসাধারণ নৈপুণ্যে। পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা ও ভঙ্গীর কাঠিন্যকে অতিক্রম করে বীরবলের ন্যায় এক নূতন কাব্যধর্মী গদ্য-রচনার সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। কেবলমাত্র মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেই নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রেও পদ্যের ন্যায় গদ্যে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশেষভাবে তার কৃতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে 'জন্মদুঃখী' উপন্যাস ও 'রঙ্গমল্লী' নাটকের মধ্যে। 'চীনের ধূপ' প্রবন্ধ এবং মৌলিক নাটক 'ধূপের ধোঁয়ায়' গ্রন্থ দু'খানিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত গদ্য-সাহিত্য বলতে 'বারোয়ারি' উপন্যাসের অংশবিশেষ এবং অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ডঙ্কা-নিশান'-এর কিয়দংশ পাঠ করলেও পাঠক তাঁর গদ্যরীতির স্বাদু আস্বাদ অনুভব করতে পারবেন।

এছাড়া আজও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল নিবন্ধ-প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, একালের পাঠক-পাঠিকারা তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবেন এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে। ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে এই ধরনের কিছু কবিতা ও গদ্যরচনা আমরা সংযোজিত করেছি এবং আলোচ্য খণ্ডেও তা অব্যাহত আছে।

এই খণ্ডে সত্যেন্দ্রনাথের কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। কারণ অনূদিত উপন্যাস 'জন্মদুঃখী'র পর সম্পূর্ণ আর কোন উপন্যাস তিনি লেখেন নি। 'ডঙ্কা-নিশান' যা 'প্রবাসী'তে (আষাঢ়-কার্তিক, ১৩৩০) আরম্ভ হয়েছিল, তা সমাপ্ত হয়নি। বাকী বারোজন লেখকের লেখা 'বারোয়ারি' (প্রকাশকাল, ১৯২১) উপন্যাসের একাদশ ব্যক্তি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ছত্রিশটি পরিচ্ছেদে এই উপন্যাসটি সমাপ্ত হয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ তার উনত্রিশ থেকে বত্রিশ পর্যন্ত চারটি পরিচ্ছেদ রচনা করেন। উপন্যাসটি সূচনা করেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং সমাপ্ত করেন প্রমথ চৌধুরী। মধ্যে ছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই 'বারোয়ারি' উপন্যাসে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা অংশ এবং অসমাপ্ত 'ডঙ্কা-নিশান' পরবর্তী তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এই দুই খণ্ডের নানাবিধ রচনার সঙ্গে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুবান্ধবের বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল ছড়া, গান বা কবিতা রচনা করে গিয়েছেন, অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থে স্বীয় বংশের যে পরিচয় দিয়েছেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আরও যে সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে, সে সমস্তই তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিঞ্চিৎ অধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে বাঙালী মাত্রেই যেমন মর্মান্তিক শোকে অভিভূত হয়েছিলেন, তেমনি দেশের কবি ও সাহিত্যিক মহলেও নেমে এসেছিল নিদারুণ বেদনার ছায়া। প্রচুর শোক-সভা হয়েছিল দেশের সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে সর্বাপেক্ষা বিরাট সভার আয়োজন হয়। সেই সভার বিষয় সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর 'আমার কাল আমার দেশ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তীকালে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বিশদভাবে লিখে গিয়েছেন তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথের শেষের কয়েকটি দিন' নিবন্ধে। ('অমৃত', ২০শে কার্তিক, ১৩৭১)। সে সময় এমন কোন নামকরা লেখক ছিলেন না, যিনি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে গদ্যে-পদ্যে কিছু না কিছু লিখেছেন। একমাত্র 'ভারতী' (শ্রাবণ, ১৩২৯) পত্রিকাতেই কবিতা লিখেছিলেন—মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি কবিগণ। এই সংখ্যাতেই একটি নিবন্ধে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সত্য-কবি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর মনের ফুলের ফসল পৃথিবীর বুক জুড়ে। বইয়ে দিয়ে গেলেন ছন্দের ধারা শত-শত শরতের মধ্যে দিয়ে—যার ভরপুর জোয়ার চলবে মন থেকে মনে, এক সকাল থেকে আর এক সকালে, এসেছে যারা তাদের দিকে, আসবে যারা তাদের দিকে, আসেও নি যারা তাদের জন্যে!"...

রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কবিতাটি রামমোহন লাইব্রেরীতে তাঁর শোক-সভায় পড়েছিলেন, সেই বিখ্যাত কবিতাটি সে সময়কার বহু-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর যে সকল কাব্যগ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সেই সকল গ্রন্থের প্রারম্ভেও এই কবিতাটি স্থান লাভ করে। এই কবিতাটির অংশবিশেষ আমরা প্রথম খণ্ডের সূচনাতেই প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে কবিগুরু অনুজ কবির যে মূল্যায়ন করেছেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি ও কবিতা' (৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৮) পত্রিকায় কবির হস্তাক্ষরের অনুলিপিসহ উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত করে, একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন পঙ্‌ক্তি পরম্পরায়। তিনি একথা বলতে কুণ্ঠিত হননি যে, "অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন বিয়োগে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] যে সব কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' সর্বাগ্রগণ্য।"

সংগীত-সাধক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায় তাঁর সংকলিত 'দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন যে, "বোধহয় তিনজনের

বেশি প্রধান কবি ব'লে গণ্য হবেন না কালের দরবারে: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ হলেও ছন্দে তথা কাব্যে তিনি যে বরিষ্ঠ কবিদের অন্যতম একথা সবাই স্বীকার করবেন।"

ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই স্বীকৃতির সপক্ষে সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র-স্মরণ' ('ভারতী', শ্রাবণ ১৩২৯) নিবন্ধের উল্লেখ করা যায়। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙলায় কেন, বিশ্বের কোন কবি কোনদিন দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ! বাঙলা ছন্দে তিনি যে বৈচিত্র্য যে ভঙ্গী আনিয়াছেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার পূর্বে কেহ কল্পনাও করে নাই যে, বাঙলা ভাষার ছন্দে এমন কারিগরি চলিতে পারে। নানা বিদেশী ছন্দ—ইংরাজী, গ্রীক, ইতালিয়ান, স্কচ, ফরাসী, জাপানী, জার্মান ছন্দের সুর, সংস্কৃত জটিল ছন্দের সুর বাঙলায় তিনিই আমদানী করেন।"

এস্থলে কবির কাব্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র সত্যেন্দ্রনাথের কথা যাঁরা আলোচনা করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের উপর যাঁরা গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরই স্মরণ করেছি মাত্র। এই প্রসঙ্গে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্‌জীতা খাতুন প্রভৃতির নাম অল্পবিস্তর উল্লিখিত হয়েছে প্রথম খণ্ডে। পরবর্তী কাজ হিসাবে এই সঙ্গে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। ১৩৬৮ সালে তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত দুই শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মধ্যে ডঃ গুপ্ত বিভিন্ন দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার সত্য-স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে দেশ,কাল ও রাজনীতির প্রভাব এবং বিংশ শতকের পাশ্চাত্যের প্রভাব তাঁর উপর কোন প্রতিক্রিয়া করেছিল কিনা, এই প্রসঙ্গে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের অনুভূতি সম্পর্কে কিছুটা শৈথিল্যের ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু ইঙ্গিতটি যে অমূলক তার সপক্ষে বহু বিদ্বজ্জনের বহু মন্তব্যের উল্লেখ করা যায়। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে ডঃ অলোক রায় রচিত সত্যেন্দ্রনাথের 'জীবন-কথা'র মধ্যে, অমল হোম-এর 'সত্যেন্দ্রস্মৃতি' নিবন্ধ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্তি:

'He was a fiery nationalist, almost a revolutionary'. এবং সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'তে স্কটীশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ওয়াট সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের উত্তেজনাপূর্ণ ভূমিকা, ডঃ গুপ্তর অভিমতের অবশ্যই বিরোধিতা করে।

এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য যা সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর 'কবি-পরিচয়'-এর মধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার উপর আলোকপাত করে তিনি লিখেছিলেন, "কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ করিয়াও দেশের অবস্থা, দুঃখ-দুর্দশা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্যসাধারণ নিপুণতা ছিল।"

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বক্তব্য আপাততঃ এইখানেই শেষ করি। এই খণ্ডের 'বিবিধ' অংশে 'গ্রন্থপরিচয়'-এর মধ্যে 'ফুলের ফসল' কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা' ও 'উৎসর্গ'টি মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি যথাসময়ে হস্তগত না হওয়ায়, অন্যান্যগুলির ন্যায় এই দুটি মূল গ্রন্থাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

এই খণ্ডের জন্য নানা জনের সহযোগিতার মধ্যে প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ এবং প্রুফ-সংশোধনের কার্যে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্নেহভাজন শ্রীমঙ্গলময় দত্ত এবং শ্রীমৃণালকৃষ্ণ দেবের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ১—৬

তীর্থরেণু (কাব্য) ৩-১৫৮

অঙ্কুর ১১
অতুলন ৫৩
অদৃষ্ট ও প্রেম ৬৭
অনাথ ১৪
অনুতাপ ৯০
অভিমান ১৩৩
অভেদ ১২৩
অভ্যর্থনা ৬৩
'অমৃতং বালভাষিতং' ৯
অম্বনালা ৩৫
অলক্ষণ ৩৭
অলক্ষ্যে ১১৯
অসাধ্য-সাধন ৬৩
আত্মঘাতিনী ৮৯
আদর্শ যাত্রী ১৩৮
আনন্দ-বাণী ১৩৮
আপান-গীতি ৮১
আমার দেবতা ১৫৩
আমি ১৪৯
উচ্চ শিক্ষা ৩২
উড়ো পাখী ৭৯
উপদেশ ৬০
ঋণী ঠাকুর ১৪০
একা ৭৯
কবি ৪২
কর্তব্য ও পুরস্কার-লোভ ৪০
করুণার দান ১২৪
'কা বার্তা' ১২১
কামনা ১৪৮
কুতার্কিক ও কাঠঠোকরা ৩৭
কৃপা-কার্পণ্য ৪৭
কৌশলী ৫১
ক্লান্ত সিপাহী ১০৬
ক্ষুদ্রগাথা ১২৮
খেয়ালীর প্রেম ৬৪
খোকার আগমনী ৭
খোয়ানো ও খোঁজা ১২৬
গান ৬৪
গুপ্তপ্রেম ৬১
গ্রন্থাগারে ৭৯
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ১০
ঘুমপাড়ানী গান ৮
ঘুম-ভাঙা ১
চড়ুই ১১
চাঁদের লোভ ৭
চিঠি ১১
চির বিচিত্র ১৩৯
ছোটোখাটো ৩
জন্মদিন ১১১
জাতীয় সঙ্গীত ১১৭
জিজ্ঞাসা ১৩৪
টিন্ ৩৭
জীবন ১২৪
জ্ঞানপাপী ৮৭
তবু ৬০
তাজা-বে-তাজা ৭৮

তান্‌কা ৯০
তিনটি কথা ১২৭
তুমি ১৫৬
তেলুগু ছড়া ৮
তৈমুর-স্মরণ ১১৩
ত্রিলোকী ১৩১
দরবেশের ঘূর্ণি নৃত্য ১৪৮
দান-পুণ্য ১৫
দুঃখলোপী মিলন ১৫২
দুঃখ ও সুখ ৯৯
দুঃখ কামার ১৫
দুঃসহ দুঃখ ৫৯
দুপুরে ১৭
দুয়ো-সুয়ো ৩২
দুর্গম-চারী ১০২
দুর্বোধ ১২১
ধর্ম ১৩৬
নববর্ষে ১৬
নবাব ও গোয়ালিনী ১১০
নব্য অলংকার ৩৮
নয়ন জলের জাজিম ৮৮
নম্বর ১৩১
নস্য ১২২
নারী ৪৯
নিশানের মর্যাদা ১০৬
নিষ্ফলারম্ভ ৬১
নীতি চতুষ্টয় ১৩
নীরব প্রেম ৫৪
নৃত্য-নিমন্ত্রণ ৯৩
নৃত্য-গীতিকা ৪৯
পতঙ্গ ও প্রদীপ ৪৬
পতিতার প্রতি ৮০
পথিক-বধূ ৭৫
পল্লব ১১৯
পহেলি ৫
পিতৃপীঠ ১১৬
পূজার পুষ্প ১৫২
পূর্ণ-মিলন ১৫২
প্রথম সম্ভাষণ ৫৫
প্রহরায় ১২৬
প্রাণ-দেবতা ১৫৫
প্রার্থনা ১৪১—৪২
প্রিয়তমের প্রতি ১৪৫
প্রেম ৭১
প্রেমতত্ত্ব ৭১
প্রেম-নির্মাল্য ১৪৭
প্রেম-পত্রিকা ৫৬
প্রেমিক ও প্রেমহীন ৫১
প্রেমের অত্যুক্তি ৬৬
প্রেমের ঠাকুর ১৫১
ফৌজদার ১১২
বৎসরান্তে ৮২
বন-গীতি ৬৮
বন্দী ১০৩
বন্দী সারস ১০৪
বন্ধন-দুঃখ ৮৭
বর্মার কবিতা ৭৪
বসন্তে অশ্রু ৯৯
বসন্তের প্রত্যাবর্তন ৫০
বহুরূপ ১৫৫
বাঁকা ৩৬
বানর ২৩
বাল-বিধবা ৮৮
বাসন্তী বর্ষা ২১
বাসন্তী স্বপ্ন ৭৩
বিকাশ-ভিখারী ৬

বিগ্রহ ১৩৪
বিচার প্রার্থী ১৪৬
বিচিত্রকর্মা ১১৮
বিদায় ১২৭
বিদায় ক্ষণে ৭২
বিদেশী ৭০
বিপদের দিনে ১১৬
বিবাহ-মঙ্গল ৯৪
বিবাহান্তে বিদায় ৯৫
বিরহী ১৪৫, ১৪৭
বীরের ধর্ম ১০০
বৃক্ষ-বাটিকায় ১৭
বেদনার আশ্বাস ১২৯
বৌ-দিদি ৫১
ব্রহ্মপ্রবেশ ১৫৭
ব্রাহুই গান ৫৭
ভবিষ্যতের স্বপ্ন ১১৭
ভাবান্তর ৭৬
ভাবের ব্যাপারী ৪১
ভালবাসার সামগ্রী ৫২
ভোলামনের প্রতি ১৫১
মণিহারা ৮৭
মন যারে চায় ৫০
মনের মানুষ ৬৭
মনোজ্ঞা ৭০
মনোদেবতা ১৫৪
মরণ ১২৯
মরুযাত্রী ২৪
মল্লদেব ১০৮
মহাদেব ১৩৫
মহানগর ২০
মহাশঙ্খ ৩৩
মায়া ১৩০
মিলনানন্দ ৬৮
মিশর-মহিমা ১২
মুকুলের গান ৫
মুগ্ধ ৫৫
মেলার যাত্রী ৪৬
মৌন ১৫৭
'যোগ্যং যোগ্যেন' ৩৬
যোদ্ধৃ জননী ১০১
রণচণ্ডীর গান ৯৭
রণমৃত্যু ১০৬
রহস্যময় ১৪৩
লয়লার প্রতি ৮৯
লুব্ধা ৬৯
শিকারীর গান ৪৮
শিণি ১৫৭
শিশির যাপন ২১
শিশিরের গান ১৯
শীত-সন্ধ্যা ২০
শুক্ল-নিশীথে ১১৮
শুভযাত্রা ১৪৬
শ্রেষ্ঠ ভক্ত ১৩৭
সংকেত গীতিকা ৪৬
সংকোচ ৫৮
সংগীত মিস্ত্রীর নিবেদন ৪২
সন্ধ্যার পূর্বে ৬৩
সন্ধ্যার সুর ৫৩
সাঁওতালী গান ৯৫
সাকীর প্রতি ৮১
সাগরের প্রতি ২৬
সাধ ৫৭
সাধু ১৪০
সাযুজ্য-সাধনা ১৪৪
সুপ্রভাত ৯৪

সুলতানের প্রেম ৬৫
সে ১৫৪
সৈনিকের গান ১০০
স্ত্রী ও পুরুষ ৯৬
স্নেহের নিরিখ ১৩
স্বদেশ ১১৫
স্বপ্নাতীত ৭৩
স্বর্ণমৃগ ৪০
স্মৃতি ১২০
স্রোতে

ফুলের ফসল (কাব্য) ১৫৯-২৩৭

অনুরোধ ১৭১
অপরাজিতা ২২৭
অবসান ২২৪
অভিমানের আয়ু ১৮৮
অশোক ১৬৯
আনন্দ ফুল ২০১
আপন হওয়া ১৭৬
আফিমের ফুল ১৮৬
আবির্ভাব ২২৫
আমন্ত্রণী ১৬১
উন্মনা ১৮০
একটি স্থলপদ্মের প্রতি ২২২
একের অভাব ১৯৫
এস ১৬২
করবী ১৮৬
কাঞ্চন ফুল ২৩২
কামিনী ফুল ২০৭
কালো ২০৪
কিশোরী ২০৯
কুঁড়ি ১৬৫
কুণ্ঠিতা ১৭১
কুন্দ ২৩০
কুমুদ ২২০
কৃষ্ণকেলি ২১৫
কেতকী ২০৮
কেন ১৮৩
কেলি কদম্ব ২০৫
গান ১৬৭-৬৯, ১৭১, ১৭৩-৭৫, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯-৯১, ১৯৪, ২১৫, ২২১
গোলাপ ১৮৪
ঘূর্ণি ১৮২
চম্পা ২০০
চির সুদূর ১৭৯
চৈত্র হাওয়ায় ১৮৩
চোখে চোখে ১৭৩
জলের আলপনা ১৮৯
জুঁই ২০৫
জোটে যদি মোটে ১৬০
জ্যোৎস্না অভিষেক ১৮৬
জ্যোৎস্না-মেঘ ১৭০
জ্যোৎস্নায় ১৬৭
তৃণ-মঞ্জরী ২২৬
তাই ১৮৩
তোড়া ১৯৪
দুধে-আলতা ২০৮
ধারা ১৭০
নব পুষ্পিতা ২০৪
নব মেঘোদয়ে ২০৪
নির্মাল্য ২৩৫
নীরবতার নিবিড়তা ১৭৪
নীলপদ্ম ২২২
পদ্মের প্রতি ২১৭
পারিজাত ২৩৬

পাঙ্কল ২২৬
'পুরবৈঞা' ২০৬
পুরোনো প্রেম ১৯১
পুষ্পময়ী ১৬৬
পুষ্প-মেঘ ২১৬
পুষ্পের নিবেদন ২০২
প্রাণ-পুষ্প ২৩৬
প্রেম-ভাগ্য ১৯২
প্রেমাভিনয় ১৬৬
প্রেমের প্রতিষ্ঠা ১৯৩
ফাল্গুনী হাওয়া ১৬৩
ফুল-দোল ২৩৪
ফুলশয্যা ২৩৩
ফুলের দিনে ১৬৩
ফুলের রাণী ২৩২
বকুল ২০০
বর্ষ-বরণ ১৯৭
বর্ষ-বিদায় ১৯৬
বাঁশী ১৭৬
বাসি ও তাজা ১৮৮
বিরহী ১৮১
ভগ্নহৃদয় ১৯০
মধু ও মদিরা ১৯২
মনের চেনা ১৭৩
মহুয়া ফুল ১৬৬
মৌন বিকাশ ১৬৪
যদি ১৭২
লতার প্রতি ১৬৮
লীলাকমল ২১৮
শতদল ২২৩
শরতের প্রতি ২১৬
শিরীষ ২০১
শিশু ফুল ২২৯
শীতের শাসন ২২৯
শেফালি ২২১
শ্রাবণী ২০৬
সুখ-বেদনা ২০৭
সুধা ২১২
স্বপন ১৮১
স্বপ্নময়ী ০৭২
স্বর্ণমৃগ ১৮০
স্রোতের ফুল ১৮৮
হাস্নুহানা ১৭৯
হেমন্তে ২২৭

কুহু ও কেকা (কাব্য) ২৩৯-৩৮৮

অকারণ ২৫৮
অন্তঃপুরিকা ২৭২
অবগুণ্ঠিতা ২৫৩
অভয় ২৮৫
অর্ঘ্য ৩৪৯
আকিঞ্চন ৩৮২
আনন্দ-দেবতার প্রতি ২৭৩
আবার ৩৭৫
আমরা ৩৫৯
আমি ৩৬৫
ঋষি টলস্টয় ৩৪৬
"ওগো" ২৯৩
ওঙ্কার-ধাম ৩৩০
কনক-ধুতুরা ২৭৫
কবি-প্রশস্তি ৩৪৬
কাঞ্চন-শৃঙ্গ ৩১৫
কাঁটা-ঝাঁপ ৩৭১
কালোর আলো ৩৫৮
কাশ ফুল ২৯৫
কু ? ২৪৩

ক্ষুদ্রের প্রার্থনা ৩৭২
গঙ্গার প্রতি ৩০৮
গান ২৪৫, ৩৬৪, ৩৭২
গ্রাম্য-চিত্র ২৬৮
গ্রীষ্মের সুর ২৭০
চাতকের কথা ২৭৬
চার্বাক ও মঞ্জুভাষা ২৪৬
চূড়ামণি ৩২২
চৌদ্দ প্রদীপ ৩৫৩
ছায়াচ্ছন্না ৩০১
ছিন্ন-মুকুল ৩০৪
ছেলের দল ৩৫৬
জবা ৩০০
জোনাকি ২৯৬
জ্যোৎস্না-মদিরা ২৪২
জ্যোতির্মণ্ডল ৩৫২
ঝোড়ো হাওয়ায় ২৭৮
তখন ও এখন ২৯১
তুমি ও আমি ২৫৭
দার্জিলিঙের চিঠি ৩২৩
দরদী ২৭৪
দুই সুর ২৪১
দুর্দিনে ২৮২
দুর্ভিক্ষে ৩৩৮
দেব-দর্শন ৩৮৭
দেশবন্ধু ৩৫১
ধূলি ৩০৭
নফর কুণ্ডু ৩৫০
নমস্কার ৩৮৫
নষ্টোদ্ধার ৩৬৯
নাগ-পঞ্চমী ২৮৬
নিবেদিতা ৩৫০
নিশান্তে ৩৮৬
নূতন মানুষ ২৮৯
পদ্মার প্রতি ৩৩২
পথের পঙ্কে ৩৭৮
পথের স্মৃতি ৩৩৭
পরীক্ষা ৩৭৬
পাগলা ঝোরা ৩৩৪
পাপীর গান ২৬০
পপাসী ৩৭৯
প্রিয়-প্রদক্ষিণ ২৫৬
পুনর্নব ৩৭৫
প্রথম হাসি ২৯০
প্রভাতের নিবেদন ৩৭৬
প্রাবৃটের গান ২৮৭
প্রার্থনা ৩৮০
ফুল-সাঞ্চি ২৯৬
ফুল-শিবনি ৩৬১
বজ্র কামন ২৭৯
বন্দনা ৩৫৫
বর্ষা ২৮৫
বারাণসী ৩১০
বিশ্ববন্ধু ৩৫১
ভাদ্রশ্রী ২৯১
ভিক্ষা ৩৮১
ভুঁইচাঁপা ৩০৬
ভোজ ও পুত্তলিকা ৩৬৭
মদন মহোৎসবে ২৪৪
মধুমাসে ২৪৫
মাটি ৩০৭
মুগ্ধা ২৬৭
মেঘলোকে ৩১৭
মেথর ৩৩৬
যক্ষের নিবেদন ২৮১
যথার্থ সার্থকতা ৩৭৯

রামধনু ২৮৭
রিক্তা ২৭৪
লব্ধ-দুর্লভ ২৫২
"লরেল" ৩২৩
লীলাকমল ২৫২
শীতান্তে ৩৭২
শূদ্র ৩৩৫
শূন্যের পূর্ণতা ৩৪১
শোণ নদের প্রতি ৩০৯
শ্মশান শয্যায় হরিনাথ দে ৩৪৩
সংশয় ৩৪০
সৎকারান্তে ৩০৩
সফল অশ্রু ৩৮০
সহজিয়া ২৫১
সাগর তর্পণ ৩৪৩
সাড়ে-চুয়াত্তর ২৬৯
সিংহল ৩২৭
সিদ্ধিদাতা ৩১৮
সুদূরের যাত্রী ৩৭৩
হাহাকার ৩৪০
হিমালয়াষ্টক ৩১৩
১৪ জ্যৈষ্ঠ ৩৪১

ধূপের ধোঁয়ায় (নাট্য) ৩৯১-৪৫৬

ছন্দ-সরস্বতী (প্রবন্ধ) ৪৫৯-৫০২

বিবিধ ৫০৩-৫৭০

(কাব্য)

কেন ? ৫০৫
রামছুঁচায়ন ৫০৬
তেহিরান গান ৫০৭
বার্ধক্যে ৫০৭
মেঠো গান ৫০৮
ভাটনেরার যুদ্ধ ৫০৮
আটকে বাঁধা ৫১০
ভিক্ষার দীক্ষা ৫১১
আন্ত-মার্কিন যুদ্ধ-সংগীত ৫১৩

(গদ্য)

কর্মীজনের মনের কথা ৫১৪
আভিজাত্যের নির্ভরভিত্তি ৫১৬
স্বপ্ন-দর্শন ৫২৩

(নাট্য)

তেহাই ৫৩২

(চিঠিপত্র)

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত (১) ৫৪৫
ঐ (২) ৫৪৮
সহধর্মিণী কনকলতা দত্তকে লিখিত (১) ৫৫১
সহধর্মিণী কনকলতা দত্তকে লিখিত (২) ৫৫২
গ্রন্থপরিচয় ৫৫৩

চিত্র-সূচী

১। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ১

২। কবিপত্নী কনকলতা দত্ত ২৩৮

৩। চারবন্ধু—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

জন্মস্থান—নিমতা গ্রামের মাতুলালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর জন্মস্থান (বাম জানালার কক্ষে) ১৯৪৮-৪৯ সালে গৃহিত চিত্র ৫০৩

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

কাব্য

তীর্থরেণু

ভূমিকা

'তীর্থরেণু'র কয়েকটি কবিতা 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন।

'তীর্থসলিলে'র ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখা হইয়াছিল, 'তীর্থরেণু' সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য; সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না।

পরিশেষে, শব্দ-শিল্পী, বর্ণ-তুলিকার বরণীয় কবি, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্য তীর্থরেণুর নামটি ফার্সী ছাঁদে লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

কলিকাতা
ললিতা সপ্তমী, ১৩১৭

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

*　　*　　*

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব
স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের
স্মৃতির উদ্দেশে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভক্তির সহিত
উৎসর্গীকৃত হইল।

পহেলি

শী কিং গ্রন্থ

নবীনে প্রবীণে নারী নরে মহামেলা
বাঁশী সিতারের মিলিত সুরের খেলা !
ঝংকারে, তানে, শিঞ্জনে কোলাকুলি,
গোল না বাধায় ঠেকার যে বোল্‌গুলি।
'সোদর সিনেহ' সুষমায় ভরে গেহ,
তুষ্ট হৃদয় চির-নিরাময় দেহ ;
মিলনের আলো জ্বলিয়াছে মন্দিরে,
শিশু হাসি ঘিরে পুরাতন পৃথিবীরে।

মুকুলের গান

আল্‌বার্ট গায়্‌গার্‌

আঁধার নিশি সে কখন আসিবে,
আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে ?
সবুজ ঘোমটা কবে শিথিলিবে ?
অনতিশীতল শিশির ঢেলে !

প্রতি সাঁঝে আসে একটি বালিকা
মোরা তারে ভাল বাসি গো বাসি,
মোদেরি 'পরে সে যতনে বরষে
সেচন ঘটের মুকুতা রাশি !

হৃদে তার আধ মায়ের মমতা
পিপাসার মত আকুলি' উঠে,

চেয়ে ফিরে ফিরে বলে ধীরে ধীরে,—
'আজো একটিও ওঠেনি ফুটে !'

কখন্ আসিবে আঁধিয়ার রাতি
আঁধারে আর্দ্র নিশাস ফেলে ?
অবগুণ্ঠন ঘুচাবে কখন ?
নিশীথ-শীতল শিশির ঢেলে !

বিকাশ-ভিখারী

অ্যাগ্নেস্ মায়গেল্

মুকুল যখন ফাটিয়া ফুটিছে ফুলে,—
ভরিছে ভুবন তপ্ত ভাস্থর করে,—
বিকাশ-ভিখারী অশরীরী কোন্ শিশু
মোর হিয়া মাঝে কাঁদে ওগো সকাতরে !

কহে সে 'তুমি তো পুলকে ভ্রমিছ একা,
শস্যের ক্ষেতে, গোলাপের উপবনে,
মোর যে এখনো হয়নি জগৎ দেখা,
রেখেছ ক্ষুধিত, সে কথা কি নাই মনে ?

মিনতি রাখ গো, ভিখারীর মুখ চাও,
কত আর রব বিকাশের পথ চেয়ে ?
প্রসন্ন হও, প্রকাশিত হতে দাও,
তুমিও হরষে—দেখিয়ো—উঠিবে গেয়ে ।

নাদুস-নুদুস হাত আমি একখানি,—
স্বপনের ঘোরে খুশি হও যারে চুমি ;

পীযূষ-লুব্ধ দুটি কচি ঠোঁট আমি,—
তৃষিত রয়েছি, তৃপ্ত কর গো তুমি।

আমি চাই তোর সঙ্গী দোসর হতে,
ছোট হই—বশ করে নিতে জানি মন;
আমার ভাষাটি শিখাব নানান্ মতে,
অফুরান্ কথা কহিব অনুক্ষণ।

কি দেখিছ, হায়, বাহিরে, ফুলের বনে?
দেখ, চেয়ে দেখ ভিতরে কি শূন্যতা!
দেখ গো হৃদয় পূরিছে কি ক্রন্দনে!
বিকাশ-ভিখারী কাঁদিছে! ঘুচাও ব্যথা।"

খোকার আগমনী

ক্যাপলন্

রামধনুকের রঙীন সাঁকো দিয়ে
নাম্‌ল কে গো সটান্ স্বর্গ থেকে!
মুখে মুঠায় সোহাগ-সুধা নিয়ে
উজল চোখে স্নেহের কাজল এঁকে!

এগিয়ে তারে দেন্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেখাজোখা!
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত,
বাছনি! আনন্দ দুলাল! খোকা!

তেলুগু ছড়া

খোকামণি মায়ের গলার মাদুলি !
খোকামণির বৌটি হ'ল কুঁদুলি।
কুঁদুলিকে খোকা সাহেব কোণে দিলেন ঠেসে,
কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাকশিয়ালী এসে !

ঘুমপাড়ানী গান

কসাক্

ঘুম যায় রে, ঘুম যায় রে, খোকা ঘুম যায় ;
চাঁদ দেখতে চাঁদ উঠেছে নীল আকাশের গায়
ভয় নেই রে মুদ্‌ব নাকো আমি আঁখির পাত,
চৌকি দিয়ে মানত মেনে কাটিয়ে দেব রাত।
আয় ঘুম আয় !

টেরেক্ নদী টগ্‌বগিয়ে টাট্টু ঘোড়ার মত
গণ্ডশিলার উপর দিয়ে ছুটছে অবিরত ;
রাখছে ঘাঁটি ক্রুদ্ধ কসাক্, তলোয়ারে তার হাত,
চৌকি দিয়ে মানত মেনে কাটাই আমি রাত।
আয় ঘুম আয় !

খোকা রে তুই বেটাছেলে, বেটাছেলের দল
ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোরে, পড়বে চোখের জল।
ঘোড়ায় চড়ে কোন্ সুদূরে যাবি তাদের সাথ !
মাথা খুঁড়ে মানত মেনে কাটবে আমার রাত।
আয় ঘুম আয় !

কসাক্ বংশে জন্ম তোমার, কঠিন তোমার প্রাণ,
মনের মধ্যে তবুও আছে মায়ের প্রতি টান ;

লড়াই তবু বাধলে, খোকা, ছুটবি অকস্মাৎ,
মাথা খুঁড়ে, মানত মেনে, কাটবে আমার রাত।
আয় ঘুম আয়!

বিদায় বেলায় যখন আমি কর্ব আশীর্বাদ,
উড়িয়ে নিশান চড়বি ঘোড়ায় হেলিয়ে ডাহিন হাত।
খোকা আমার যুদ্ধে যাবে কঠিন কসাক্ জাত,
মাথা খুঁড়ে মানত মেনে কাটবে আমার রাত।
আয় ঘুম আয়!

দলের সঙ্গে থাকবি তবু ঠেকবে ফাঁকা ফাঁকা,
আমায় বাছা, থাকতে হবে এই ঘরেতেই একা;
যেথায় থাকিস মনে রাখিস মায়ের আশীর্বাদ,
জানিস মনে মানত মেনে কাটাই আমি রাত।
আয় ঘুম আয়!

প্রসাদী ফুল দেব আমি সঙ্গেতে তোমার,
যুদ্ধে গিয়েও মায়ের কথা ভাবিস এক-একবার।
যেখানে যাস, যেথায় থাকিস, তোর কিছু নেই ভয়,
মানত মেনে আপদ বালাই কর্ব আমি ক্ষয়।
আয় ঘুম আয়!

'অমৃতং বালভাষিতং'

ক্যাপ্‌লন্

রাজার কথা অটল-সুগম্ভীর.
শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত উদার;
ন্যায়ের কথা নিলয় সে যুক্তির,
শিশুর কথা?—পুলক-পারাবার।

ঘুম-ভাঙা

(তামিল ছড়া)

আহা, আহা 'আ-ঈ' !
আহা মরে যাই,
কচি আঙুল ঘুরুনি,
বাছা, পরান জুড়ুনি,
কে বেড়াবে হামা দিয়ে,
কে বেড়াবে দাওয়ায়,
কে খেলবে ধুলো নিয়ে
ছাঁচতলাটির ছাওয়ায় !

আহা, আহা 'আ-ঈ'
ঘুম ভেঙেছে, মায়ি !
মুক্তো ঘেরা টোপর মাথায়
কে দেয় রে হামা ?
চুমু দিয়ে জাগিয়ে দিলেন
মায়ের ভাই মামা।

আহা, আহা 'আ-ঈ'
আহা মরে যাই,
কিচ্ছু ভাল লাগছে নাকো
দুধটি এখন চাই।
রাঙা পলার মালা গলায়,
গায়ে জরির জামা,
দুধ খাওয়াতে জাগিয়ে দিলেন
মায়ের ভাই মামা।

আহা, আহা 'আ-ঈ'
একটি চুমু খাই,

খোকায় কোলে ক'রে মোরা
নেচে নেচে যাই ;
দুধটি খেয়ে কল্‌কলাবি,—
'বকুম্ বকুম্' বোল্ ;
বড় আমোদ হয় রে তোমার
পেলে মামার কোল।

চিঠি

রেক্সফোর্ড্

'প্রণাম শত কোটি,
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,
সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর,
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই,
আমার ছোট ভাই ;
পাঠিয়ে দিয়ো দাঁত, বাপু!
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রী বড় খোকাবাবু।'

অঙ্কুর

নিগ্রো ডান্‌বার

কহে অঙ্কুর আঁধারে মাটির মাঝে,
'মজবুৎ নই, তবুও লাগিব কাজে!'
এত বলি' ধীরে আলোকে তুলিল মাথা,
মৃদু বলে খুলি' দিল একখানি পাতা!

পাতা, নিরখিয়া পরখিয়া চারিধার
ডাকিয়া আনিল ডাঁটি ভাইটিকে তার ;
তার পিছে পিছে কচি পাতা আরো দুটি
কৌতুকে এল বাহিরিয়া গুটিগুটি !
সুরু করি কাজ, খাটিয়া সকাল-সাঁঝে,—
পরিণত হ'ল অঙ্কুর চারা গাছে ;
রবি দিল আলো, মেঘ তারে দিল জল,
দিনে দিনে বাড়ি' লভিল সে ফুল ফল।
যারা ছোট আছ, এস মানুষের মাঝে,
মজবুত নও, তবুও লাগিবে কাজে ;
আলোকের দিকে ধীরে ধীরে তোল মাথা,
রবি আশিসিবে, মেঘেরা ধরিবে ছাতা।
কর্মের ক্লেশে ললাটে ঝরুক জল,
ফুটাও জগতে অক্ষয় ফুল ফল।

মিশর-মহিমা

মিশরে পুরুষ রণপণ্ডিত, রমণী ধনুর্ধর !
স্তনন্ধয় যে শিশু তারে মাতা ধরান্ ধনুঃশর !
মার কাছে ছেলে সত্য বলিতে সত্য পালিতে শেখে,
সহজ সাহসে দুঃখ সহিতে শেখে শৈশব থেকে।
ভয়ে সে কাঁপে না, কষ্টে কাঁদে না, লোহার বাঁটুল ছেলে,
দু'দণ্ডে বশ করিতে সে পারে দুরন্ত ঘোড়া পেলে।
পিতা হাতে তার দেন হাতিয়ার শেখান অস্ত্রখেলা,
বেড়ে ওঠে বুক শড়্কী ধনুক লয়ে ফিরে সারা বেলা।
ভীমরুল পারা দুর্মদ তারা লড়িতে করে না ভয়,
বিনা ছলে কভু তাদের হঠানো নরের সাধ্য নয়।

স্নেহের নিরিখ

ক্যাপলন্

কাঁটায় তুলে তৌল করে মহাজনের মাল,
নিকৃতি ক'রে সোনার ওজন জানে ;
ব্যাভারে পাপ ঢুকলে পরে, দেখছি চিরকাল,
আইন বহির নিরিখ লোকে মানে।

কিন্তু তোরা জানিস কিগো ? বলতে পারিস মোরে ?
পেয়ে কোলে প্রথম ছেলে (ম'রে আবার বেঁচে)
মা-হওয়ায় যে নূতন সুখে মায়ের পরান ভরে,—
সে ধন ওজন করার নিরিখ নিকৃতি কোথায় আছে ?

নীতি চতুষ্টয়

ভর্তৃহরি

সিংহশাবক ক্ষুদ্র হলেও মদ-বিমলিন হাতীরে হানে,
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই ; বিক্রম কভু বয়স মানে।

স্বর্গ হইতে শিবের জটায় সেথা হতে পর্বতে,
পর্বত ছাড়ি ধরণী-পৃষ্ঠে, সাগরে ধরণী হতে ;
এমনি করিয়া গঙ্গা চলেছে অধোগতি অনিবার,
নষ্টমতির নিপাতের লাগি শত দিকে শত দ্বার।

তপ্ত লোহায় সলিল-বিন্দু,—নাম খুঁজে পাওয়া দায় ;
পদ্ম-পাতায় সেই পুন রাজে মুকুতার সুষমায় !
স্বাতী হতে পড়ি' শুক্তিতে হয় মুক্তা সে নিরমল !
মন্দ, মাঝারি, ভালো হওয়া,—সব সংসর্গেরি ফল।

আচারনিষ্ঠে ভণ্ড বলে গো, ধীরজনে ভীরু, সরলে মূঢ় ;
প্রিয়ভাষীজনে ধনহীন গণে, বীরে নির্দয়, তেজীরে রূঢ় !
শান্তস্বভাবে অক্ষম ভাবে, বাগ্মী পুরুষে বাচাল বলে,
হেন কোনো গুণ নাই মানুষের যাহা দুর্জনে দোষেনি ছলে।

অনাথ

(মুণ্ডারি)

ও পাড়াটা ঘুরে এলাম কেউ তো নেই,
এ পাড়াটা মরুভূমির মতন ;
মাগো আমার নেই গো তুমি নেই গো নেই,
নেইক বাবা কর্বে কে আর যতন ?
আজকে যদি বাবা আমার থাকত গো,
মা যদি মোর আজকে বেঁচে থাকত,
পথে পথে খুঁজত কত ডাক্‌ত গো,
কোলে পিঠে করে সদাই রাখ্‌ত।
মা হারিয়ে হারিয়েছি হায় সকলকেই,
কেউ ডাকে না কেউ করে না খোঁজ ;
বাপ গেছে যার জগতে তার্ কেউ তো নেই
একলা পথে ঘুরে বেড়াই রোজ।
মা-হারানো বড় দুখের তুলনা তার নেইকো
বাপ হারানো জগৎ অন্ধকার,
মা গো আমার, সত্যি তুমি নেই কি, তুমি নেই গো
বাবা আমার সত্যিই নেই আর !
পরের দ্বারে দাঁড়াই স্নেহ পাইনে,
চাকরি স্বীকার এই বয়সেই কর্ব ;
ভয়ে কারো মুখের পানে চাইনে,
হয়তো মাগো কেঁদে কেঁদেই মর্ব।

দুঃখ কামার

বডম্যান

একে যে আছে কামার
নামটি তার দুঃখ।
হাতুড়ি তার টঙ্ক
চেহারা তার রুক্ষ ;
হাপরটা তার মস্ত
আগুন সদাই জ্বলছে,
হাঁপিয়ে প্রতি নিশ্বাসে
জাঁতাও জোরে চলছে।
দুঃখ নামে কামার
হৃদয় পেটাই কর্চে,
তার হাতুড়ির ঘায়ে
পড়ছে ঝরে মর্চে ;
ঘায়ের উপর ঘা দিয়ে
কর্চে এমন টঙ্ক,
ফাটবে নাকি চটবে না,
পড়বে নাক' অঙ্ক।
দুঃখ ভারী শিল্পী
বিশ্বকর্মার অংশ,
কর্চে হৃদয় মজবুত
এমনি,—যে নাই ধ্বংস।

দান-পুণ্য

ভিক্ষু ঋষি

ক্ষুধায় সৃষ্টি করেনি দেবতা নরের নিধন তরে,
খাদ্য পেয়ের শ্রাদ্ধ যে করে সেও একদিন মরে।

বিহিত বিধানে দান করি' দাতা কখনো হয় না দীন,
কৃপণই কেবল পায় না শান্তি চির-আনন্দ-হীন।

ক্ষুধাতুর যবে অন্নের লাগি অন্নবানের দ্বারে
হয় উপনীত, তখন যদি সে গৃহের কর্তা তারে
ফিরাইয়া দেন কঠিন হৃদয়ে, কিবা তার আগে ভাগে
নিজের তুষ্টি করেন সাধন, তাঁরে সন্তাপ লাগে।

আতুরে অন্ন দান করে যেই তারে পূজা করে সবে,
দান-যজ্ঞের পুণ্য সে পায় অরির (ও) শ্রদ্ধা লভে ;
বন্ধু হয়ে যে বন্ধুজনেরে অন্ন না করে দান,
সে নহে বন্ধু, তার গৃহ নয় মাথা রাখিবার স্থান।

তাহারে ছাড়িয়া সন্ধান কর উদার জনের ঘর,
আপন জনের চেয়ে সে আপন হ'ক সে হাজার পর।
অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ কর,
সমুখে সরল পথ নিরমল যে পার সে পথ ধর।

ধন বৈভব,—হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে,
কখনো তোমার, কখনো আমার ; স্থির নয় কারো ঘরে।
হীন মন যার,—নহেক উদার অন্ন তাহার কাল,
দেবতা তোষে না বন্ধু পোষে না ঘরে ভরে জঞ্জাল ;
একাকী যে জন ভোগ করে ধন একা সে ভুঞ্জে প প,
ধরার অন্ন হরণ করিয়া একা বহে সন্তাপ।

নববর্ষে

দ্বারে দেবদারু-শাখা,—
চিহ্ন অচিন্ পথে ;
কারো তরে ফুলে ঢাকা,
কারো—ভিজে অশ্রুতে।

বৃক্ষ-বাটিকায়

তরু দত্ত

ঘিরেছে গৃহটি মোর পল্লব-সাগরে,—
নহে সে নির্জীব কিবা বৈচিত্র্যবিহীন ;
পাণ্ডু শ্যাম তিন্তিলী সে হেথা শোভা করে
ঘন শ্যাম আম্রকুঞ্জে রহিয়া নিলীন ;
ধূসর স্তম্ভের মত মাঝে মাঝে তাল ;
নীরব ঝিলের তীরে বিপুল শিমুল,—
সুপ্ত দেশে তূরী যেন বাজায় করাল
শ্যামবনে লালে লাল ফুটাইয়া ফুল।
পূর্ব ভাগে বেণু-বন, শোভা তার সাঁঝে,—
ওঠে যবে চারু চাঁদ পত্র-অন্তরালে,
শুভ্র শতদল যবে সরোবর মাঝে
রৌপ্য পাত্রে পরিণত, চারু ইন্দ্রজালে !
মূরছিতে চাহে মন মৌন সুষমায়,
আদিম নন্দন বনে আঁখি ডুবে যায়।

দুপুরে

তাচিবানে-নো-মাসাতো

দুপুরে,—সোনার করে
ঝাপসা বাতাস ভরে,
কড়ি-পোকাগুলি তায়
ইতি উতি ফর্‌কায় ;
চির প্রশান্ত গ্রাম,
ঘটনার নাহি নাম।

গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

লেকঁৎ-দে-লিল্

মধ্যাহ্ন ; গ্রীষ্মের রাজা, মহোচ্চ সে নীলাকাশে বসি'
নিক্ষেপিল রৌপ্যজাল, বিস্তৃত বিশাল পৃথ্বী 'পরে ;
মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি' ;
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।

ধূধূ করে সারাদেশ ; প্রান্তরে ছায়ার নাহি লেশ ;
লুপ্তধারা গ্রাম-নদী ! বৎস গাভী পানীয় না পায় ;
সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ)
স্পন্দন-বিহীন আজি ; অভিভূত প্রভূত তন্দ্রায়।

গোধূমে সর্ষপে মিলি' ক্ষেত্রে রচে সুবর্ণ সাগর,
সুপ্তিরে করিয়া হেলা বিলসিছে বিস্তারিছে তারা ;
নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,
মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযুষের ধারা।

দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত, সন্তাপিত মর্মতল হতে,
মর্মর উঠিছে কভু আপুষ্ট শস্যের শিষে শিষে ;
মন্থর, মহিমাময় মহোচ্ছ্বাস জাগিয়া জগতে,
যেন গো মরিয়া যায় ধূলিময় দিগন্তের শেষে।

অদূরে তরুর ছায়ে শুয়ে শুয়ে শুভ্র গাভীগুলি
লোল গল-কম্বলেরে রহি' রহি' করিছে লেহন ;
আলসে আয়ত আঁখি স্বপনেতে আছে যেন ভুলি',
আনমনে দেখে যেন অন্তরের অনন্ত স্বপন।

মানব ! চলেছ তুমি তপ্ত মাঠে মধ্যাহ্ন সময়ে,
ও তব হৃদয়-পাত্র দুঃখে কিবা সুখে পরিপূর্ণ !
পলাও ! শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য শোষে তৃষামত্ত হয়ে,
দেহ যে ধরেছে হেথা দুঃখে সুখে সেই হবে চূর্ণ।

কিন্তু, যদি পার তুমি হাসি আর অশ্রু বিবর্জিতে,
চঞ্চল জগত মাঝে যদি থাকে বিস্মৃতির সাধ,
অভিশাপে বরলাভে তুল্য জান,—ক্ষমায় শান্তিতে,
আস্বাদিতে চাহ যদি মহান্ সে বিষণ্ণ আহ্লাদ,—

এস ! সূর্য ডাকে তোমা, শুনায়ে সে কাহিনী নূতন
আপন দুর্জয় তেজে নিঃশেষে তোমারে পান ক'রে,—
শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ,
মর্ম তব সিক্ত করি সপ্তবার নির্বাণ-সাগরে ।

শিশিরের গান

পল্ ভার্লেন্

কাঁদন আজি হায়,
ধ্বনিছে বেহালায়
শিশিরের ;—
উদাস করি প্রাণ,
যেন গো অবসান
নাহি এর !
রুধিয়া নিশ্বাস
ফিরিছে হা-হুতাশ
অবিরল,
অতীত দিন স্মরি'
পড়িছে ঝরি ঝরি
আঁখিজল ।
সমীর মোরে, হায়,
টানিয়া নিতে চায়
করি জোর,
উড়ায় হেথা হোথা,
যেন গো ঝরাপাতা
তনু মোর !

শীত-সন্ধ্যা

বায়েরবম্

আঁধার করিয়া হৃদ গৃধ্র সম ধূসর পাখায়,
রাত্রি আসে, হায় !
দিবসের শবদেহ তাম্রনখে সবলে পাকড়ি'
চলিল সে উড়ি ;
পশ্চিম গগন জুড়ি ছড়াইয়া পড়ে রক্তধারা,
পশ্চাতে তাহার।
বিস্ময়ে চাহিয়া আছে সূক্ষ্ম পল্লবের পক্ষ তুলি
ঝাউ-তরুগুলি !
শত শত কৃষ্ণ ছায়া ছুটিয়াছে দস্যুর পিছনে,
ত্বরিত গমনে।
আকাশ হইতে ধীরে পউষের হিমার্দ্র-বাতাসে,
চিন্তা নেমে আসে ;
নির্বিশেষে সর্ব জীব নীরব চরণে চলে, হায়
বিস্মৃতি-গুহায়।

মহানগর

লিলিয়েংক্রন্

মহানগর— মহাসাগর, তরঙ্গ তায় কত,
লোকের মেলা, লোকের ঠেলা ঢেউয়ের খেলার মত ;
উঠছে ভেসে যাচ্ছে ডুবে, কে কার পানে চায় ?
ডুগডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায়।
যাচ্ছে ভেসে চোখের উপর ডুবছে একে একে,
বিস্মরণের ঘূর্ণি জলে সাধ্য কি যে টেঁকে ?
যে মুখখানি এই দেখিলাম,—আর সে নাহি. হায় !
ডুগডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায়।

শ্মশান-মুখো যাচ্ছে কারা ?—কান্না গেল শোনা !
বন্ধ তবু হয় না হেথা লোকের আনাগোনা !
ডুবছ তুমি, ডুবছি আমি কে কার পানে চায় ?
ডুগডুগি তার বাজিয়ে বাউল আপন মনে গায়।

শিশির যাপন

চোটো নাই ভাই বরফ আজো নড়ছে নাকো দেখে,
হাত পা ভেঙে গিয়েছে তার প'ড়ে আকাশ থেকে !
সকল বাড়ির দুয়ারে সে দিয়ে গেছে হানা,
জলে হাওয়ায় ছোরাছুরি, বাহির হওয়া মানা !
মস্‌জিদে লোক যায় না শীতে, ঘিরেছে উনান্‌,
দেখছি এবার অগ্নি-পূজা ধরলে মুসলমান !
আয় মেসিহি ! শীতের ক'দিন ঘুমিয়ে কাটাই আয়,
বসন্তে সব ফুলের সনে জাগ্‌ব পুনরায়।

বাসন্তী বর্ষা

তু-ফু

ক্ষুদে বাদলের জয় হোক্‌ ওগো, প্রয়োজন বুঝে
দেয় সে দেখা,
শস্য-বীজের তৃষ্ণা ঘুচাতে তপ্ত ঋতুতে
সে আসে একা !
বন্ধু হাওয়ার সঙ্গে নিশীথে নীরব চরণে
বেড়ায় সে যে,
তার সেই পুলকাশ্রুতে ভিজে ধরাতল ওঠে
সবুজে সেজে !
কালি সন্ধ্যায় মেঘের ছায়ায় হয়েছিল পথ
দ্বিগুণ কালো,

দূরে নৌকায় উষার মত জ্বলেছিল শুধু
মশাল-আলো ;
আজ প্রাতে তাজা রঙের পরশে হরষে ফাটিয়া
পড়িছে মাটি,
ফিরে পতঙ্গ মুকুতা-উজ্জ্বল তৃণদলে পরি'
সোনালী শাটী।

চড়ুই

নিগ্রো ডানবার

ছোটো একটি চড়ুই পাখী,
তার পরনে পোশাক খাকী,
মোর ঘরের বাহিরে থাকি
ওঠে 'চিপিক' 'পিচিক' ডাকি !
টোকা দেয় সে সাসির কাচে,
যেন আসিতে চায় গো কাছে,
যেন শোনাতে চায় সে মোরে
তার গান দিনমান ধ'রে ;
আমি কাজ করি আনমনে,
কে বল্ চড়ুয়ের গান শোনে ?
পাখী 'চিপিক' 'চিপিক' করে
উড়ে চলে গেল অনাদরে।

আশা, সান্ত্বনা, ভালবাসা,
ওগো, স্বর্গে যাদের বাসা,
তারা পাখীর মতন এসে
এই মানুষেরে ভালবেসে
বসি' জীবনের বাতায়নে
গান শোনায় গো জনে জনে ;

মোরা ডুবে থাকি শত কাজে,
তারা ঘেঁষিতে পায় না কাছে ;
মোরা ভুলে থাকি হাসিখুশি,
শুধু, ঠেলাঠেলি ঘুষোঘুষি,
তারা অনাদরে যায় ফিরে,
তখন ভাসি নয়নের নীরে।

বানর

কিপ্লিং

একটা বানর বসেছিল সরল গাছের শাখে,
আমি বসে ভাবছিলাম, 'সে খায় কি ? কোথায় থাকে ?'
অলসভাবে ভাবতে এবং চাইতে চাইতে ক্রমে,
কখন চক্ষু পড়ল ঢুলে স্বপ্ন এল জমে।
স্বপ্নে দেখি বলছে বানর, 'ওহে পোশাকধারী !
দেখছ ? আমার নেইক দর্জি, নেই কোনো দিকদারি;
মাসে মাসে নেই তাগাদা, পরিনে হ্যাটকোট,
নেইক নিত্য সান্ধ্য-সভায় নিমন্ত্রণের চোট।
বেনের ঘরে দিন দুপুরে রসদ কেড়ে খাই,
বেটা তবু বেজায় মোটা, আমি কাহিল, ভাই !
যাইনে কারো গাড়ির পিছে, ঘরের হোক কি ঠিকে,
দিইনে নজর অন্য কোনো মর্কটের স্ত্রীর দিকে।
খোশপোশাকী নইকো মোটেই ঢাকিনে গা পর্দায়,
বাংলো-বাড়ি নেইকো আমার ঘুমাই সুখে ফর্দায় ;
কিনিনে দস্তানা আংটি, চোখ ঠারিনে মনকে,
সুন্দরীদের জন্য পয়সা দিইনে হ্যামিল্টনকে।
দ্বন্দ্ব করি নিজের মধ্যেই, ভার্যা এবং ভর্তা,
বানর-গিন্নী স্পষ্ট জানেন আমিই তাঁহার কর্তা।

ম্যালেরিয়ার ভয় করিনে, নেইক দেনার দায়,
মানুষ জাতটা দেখলে আমার বড্ড হাসি পায়।'
হঠাৎ জেগে দেখি আমার মাখন-মাখা রুটি
সংগ্রহ-না-করে বানর যাচ্ছে গাছে উঠি!
মুখখানা তার রক্তবর্ণ গায়েতে লোম কত!
খেতে খেতে চুলকায় মাথা, ঠিক বানরের মত।
শিষ্ট সে নয়, সভ্য সে নয়, নেহাত হনুমান,
(তবু) সাদাসিধে বানর হতে চাইলে আমার প্রাণ!
বল্লাম তারে, 'ভদ্র বানর! করলেন অন্তর্যামী
খোশমেজাজী বানর তোমায়, আমায় করলেন আমি!
বিদায় বন্ধো! শনৈঃ শনৈঃ যাচ্চ আপন ঘরে,
ভুল না, হায়, তুমি হতে ইচ্ছা করে নরে।'

মরুযাত্রী

ফৈজী

চলেছে উটের আরোহী চলেছে সীমাহীন প্রান্তরে,
বিঘ্ন বিপদ পদে পদে তার চিত্ত সজাগ করে।
গগনের পারে প্রভাতের তারা করে তারে আহ্বান,
মরু-বালুকায় লিখে লিখে যায় ধৈর্যের অবদান!
সে যে পিপাসায় জল নাহি চায় ক্ষুধাকালে খর্জুর,
উষ্ট্র তাহার বাঁচিয়া থাকুক সুখ-দিন নহে দূর।
মরুর কষ্টে ক্লেশ গণে না সে,—সে যে কীর্তির পথ,
তপ্ত ধূলার পরপারে আছে গৌরব সুমহৎ!
রাঙা সিরাজীর গুণ গাহে সেই গাহে সিরাজের গান,
দৈব-সুরায় পরান-পাত্র ভরিয়া করে সে পান!
হাফেজের তান ধ্বনিছে আজিকে সংগীত মাঝে তার,
ফৈজী কহিছে,—কবিরে ভ্রান্ত করিতে সাধ্য কার।

অশ্বনালা

(মাদাগাস্কার)

চারিদিক দেখে যাও এঁকে-বেঁকে
হে নদ অশ্বনালা !
অকারণে রেগে দুঃসহ বেগে
যেন ঘটায়ো না জ্বালা ।
শীতে তুমি খাটো শাড়ীর মতন
না ঢাকে সকল কায় ;
লেপ-চাপা-পড়া শিশু সম হাঁফ্
লাগাও হে বরষায় !
ছুটে ছুটে ছুটে মাথা কুটে কুটে
ধূলায় মলিন বেশ,
খেটে খেটে খেটে জন্ম কেটেছে
কর্মের নাহি শেষ !
দিবস যামিনী চলেছ এমনি
ছাড়িয়া পাহাড়-চূড়া,
পাথর নড়ায়ে চলেছে গড়ায়ে
উড়ায়ে সলিল-গুঁড়া ।

ছোটোখাটো

অজ্ঞাত

ছোটখাটো স্নেহের দু'টো কথা
ছোটোখাটো সহজ উপকার,
পৃথিবীরে স্বর্গ ক'রে তোলে,
ক'রে তোলে পরকে আপনার !

সাগরের প্রতি

ঘোষ

হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার,
মোর তরে মন্দ্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার।
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি'
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব ; মাঝে মাঝে ক্রোড়-সন্ধিগুলি
অতল পাতাল-গুহা প্রায়,
তারি 'পরে অস্পষ্ট সুদূর তরী চলে স্পন্দিত পাখায়।
শুনি আমি গর্জন তোমার,—
কহ তুমি, 'তীরে বসি' বিলম্ব করিছ কেন মিছে আর ?
ফেন-ধৌত আকাশ পরশি'
নাচিছে উত্তাল ঢেউ যত, ত্রস্ত চোখে তাই দেখ বসি' ?
ক্ষুদ্র এই তরী স্বল্পপ্রাণ,—
সাহসে পশেছে সেও তরঙ্গ-সংঘাতে, আছে ভাসমান।
বিনাশ যদ্যপি ঘটে তার,—
তাহে কিবা ? নাহি কি তাহারি মত আরো হাজার হাজার
দর্পভরে হও আগুয়ান,
সহজ আরামে মাটি থেক না আঁকড়ি ভীরুর সমান ;
নেমে এস, যাও জেনে লয়ে
কি বিহ্বল পুলক বিপদে, কি আনন্দ ভাগ্যবিপর্যয়ে।'
বটে গো প্রমত্ত পারাবার,
আমি যে তোমার চেয়ে বলী, মহত্তর উচ্ছ্বাস আমার।
উঠি তব তরঙ্গ-চূড়াতে,
সে কেবল কৌশল আমার খেলিবারে আকাশের সাথে ;
আবার তলায়ে ডুবে যাই,
কোলাহল-কল্লোলের তল কোথা আছে জানিবারে তাই।
নিরাপদে তীরে সারাবেলা
খেলা, সে যে বিধাতার মহা-অভিপ্রায় ব্যর্থ করে ফেলা ;

এ খেলা যে সাজে না আত্মার,
মৃত্যুহীন পরমপুরুষ চিরজনমের লক্ষ্য যার।
সিন্ধুসম বিঘ্ন ও বিপদে
বিশ্বজনে ঘিরেছেন তাই ভগবান ; তাই পদে পদে
সৃজিয়া বেদনা ব্যর্থতায়
বিষম জটিল ফাঁদ দেছেন জড়ায়ে আমাদের পায় ;
বজ্রে ওতঃপ্রোত করি মেঘ,
বিপর্যস্ত করিছেন তাই—পাশমুক্ত করি ঝঞ্ঝাবেগ ;—
যাহে নর হয় দুঃখজয়ী,
পরাজয়ে মাতে জয়োল্লাসে যাতনার নির্যাতন সহি',
আপনার অজেয় আত্মায়
প্রতিকূল নিয়তির সমকক্ষ করি' আপ্ত ক্ষমতায়।
লও মোরে হে সিন্ধু মহান্,
হও মম আনন্দের হেতু, হও তুমি স্বর্গের সোপান।
হে সমুদ্র, দুরন্ত কেশরী,
তোমারে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশর-গুচ্ছ ধরি' ;
নহে ডুবে যাব একেবারে
লবণার্দ্র গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।
সুবিপুল ও বপুর ভার
ধরিব নিজের 'পরে, করিব নিরোধ ভাগ্যেরে আমার।
হে স্বাধীন, হে মহাসাগর !
অমেয় আত্মার বল পরখিতে আজ আমি অগ্রসর।

জিন্

ভিক্তর হুগো

নিরঞ্জন
নিদ্‌পুর,—
নিকেতন
মৃত্যুর ;

বায়ু, হায়,
মূরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুর।

আকাশ জুড়ে
একি আভাস!
নিশার পড়ে
ঘন নিশাস!
কাহারা ধায়
প্রেতের প্রায়
অনল ভায়
মানি' তরাস।

ঘোর কলরব!
তন্দ্রা মিলায়;
হুম্ব দানব
অশ্ব চালায়!
পলায় যে রড়ে
তারি 'পরে পড়ে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চড়ে
নৃত্য-লীলায়!

কাছে আসে হুংকার,
ধ্বনিছে প্রতিধ্বনি;
পুণ্যের কারাগার
মঠে কি মন্ত্র-ফণী?
কিবা ঘন-জনতায়
বজ্র ঘোষণা ধায়,

কভু মৃদু,—মরি' যায়,
কভু উঠে রণরণি।

কি সর্বনাশ! ফুকারিছে জিন্।
তাই হল্‌হলা উঠেছে, ওরে!
পালা যদি চাস্ বাঁচিতে দু'দিন
এই বেলা ওই সোপান ধ'রে।
গেল,—নিবে গেল প্রদীপ আবার,
কালিমায় ঢেকে গেল চারিধার,
গ্রাসি' ঘর দ্বার নিকষ আঁধার
বসিল চড়িয়া হর্ম্য 'পরে।

সাজ ক'রে আজ বেরিয়েছে জিন্ যত,
ঘূর্ণিবাতাসে পড়ে গেছে 'হুস্' 'হাস্'!
দাব-দহনেতে দীর্ণ তরুর মত
পর্ণ ঝরায়ে ঝাউ ফেলে নিশ্বাস!
ধায় জিন্ যত শূন্যে পাইয়া ছাড়া,
অদ্ভুত-গতি দ্রুত অতি চলে তারা;—
সীসার বরণ ভীষণ মেঘের পারা
বজ্র যখন কুক্ষিতে করে বাস।

এল কাছে আরো,—এল ঘিরে এল ক্রমে এ যে!
আগুলি দুয়ার দাঁড়াও, যুঝিব প্রাণপণে;
কি গণ্ডগোল বাহিরে আজিকে ওঠে বেজে!
দৈত্যদানার হানা-দেওয়া ঘোর গর্জনে।
বেঁকে নুয়ে পড়ে বাহাদুরী কড়িকাঠ যত,
জলজ কোমল নমনীয় লতিকার মত!
নাড়া পেয়ে কাঁপে পুরানো জানালা দ্বার কত
মরিচায় জরা কবচের ক্ষীণ বন্ধনে।

বিমরি' গুমরি' গরজিছে এ যে নরকের কলরব !
উত্তর-বায়ু চলেছে তাড়ায়ে পিশাচ প্রেতের পাল !
এবার রক্ষা কর ভগবান ! কালো পল্টন সব
পদ-ভরে ভেঙে ফেলে বুঝি ছাদ ! একি হ'ল জঞ্জাল !
প্রাচীর হেলিছে, দুলিছে, টলিছে, সারা গৃহ যেন কাঁদে ;
সূর্য বুঝি গো কক্ষ ছাড়িয়া প্রলয়-ঝঞ্ঝা-ফাঁদে
পড়ে গিয়ে আজ কেবলি গড়ায় শুষ্ক পাতার ছাঁদে ;
ঘূর্ণি হাওয়ায় টেনে নিয়ে যায়, দাঁড়ায় না ক্ষণকাল।

হজরৎ ! আজ বান্দা ঠেকেছে বড় দায়,
নিশাচর পাপ পিশাচের হাতে কর ত্রাণ ;
মুণ্ডিত শিরে বার বার নমি তব পায়,
ভয়বিহ্বলে নির্ভয় কর, রাখ প্রাণ।
এই কর প্রভু ! কুহকী প্রেতের যত ছল,
ভকতের দ্বারে এসে হয় যেন হতবল ;
পক্ষ-লগন নখে আঁচড়িয়া সাসিতল,
আক্রোশে তারা ফিরুক শিকার করি ঘ্রাণ।

গেছে, চলে গেছে !—চলে গেছে জিন্ যত ;
উড়িয়া পড়িয়া ছুটেছে গগন-পারে !
ছাদে থেমে গেছে নৃত্য সে উদ্ধত,
শত করাঘাত আর পড়িছে না দ্বারে।
শিহরে কানন পলায়ন-বেগ-ভরে,
শিকল-বেড়ীর শব্দে আকাশ ভরে,
গ্রামের প্রান্তে সীমাহীন প্রান্তরে
শালতরু যত নুয়ে পড়ে সারে সারে।

ধীরে, ধীরে, ধীরে, দূরে, দূরে, দূরে,
পাখার আওয়াজ মিলায়ে আসে !

মৃদু হতে ক্রমে মৃদুতর সুরে
কাঁপে সে আসিয়া কানের পাশে !
মনে হয়, শুনি ঝিল্লির ধ্বনি,
স্পন্দিছে সারা নিথর ধরণী,
কিবা শিলাপাতে মৃদু ঠন্‌ঠনি
পুরানো ছাদের শেহালা-রাশে।

সেই অপরূপ ধ্বনি !
শোনা যায় ! শোনা যায় !
শিঙার শব্দ গণি'
বেদুইন্ ফিরে চায় !
তটিনী-তটের তান,
উচ্ছ্বাসে অবসান !
সোনালী স্বপ্ন-খান্
শিশুর নয়ন ছায়।

জিন্ বিভীষণ,—
মৃত্যুর চর,
আঁধারে গোপন
করে কলরব ;
করে গরজন
গভীর, ভীষণ,
ঢেউয়ের মতন ;
রহি' অগোচর।

ঘুমায়ে পড়ে
মৃদুল স্বর,
ঢেউ কি নড়ে
তটের 'পর !

প্রেতের লাগি'
মুক্তি মাগি'
জপে কি যোগী
যুক্তকর !

মনে হয়,
কুস্বপন,
কানে কয়
অনুখন !
কেকোথায় !
মিশে যায় !
মূরছায়
গরজন !

দুয়ো-সুয়ো

বদ্‌লেয়ার

সুয়োরানীর দুলাল ! ওরে ! খেয়ে মেখে নে,
সদয় বিধি নানান নিধি দিয়েছে এনে

দুয়োরানীর দুখের বাছা ! ধূলাকাদাতে
বুকে হেঁটে বেড়াস যেন জন্ম-হাভাতে।

সুয়োরানীর দুলাল ! তোমার পূজায় ভারী জাঁক,
জুড়িয়ে গেল হোমের ধূমে নবগ্রহের নাক !

দুয়োরানীর দুখের বাছা ! তোমার দুঃখ ক্লেশ,—
এ জীবনে হবে কি হায়,—হবে কি তার শেষ ?

সুয়োরানীর দুলাল ! তোমার বংশ বাড়িছে,
তোমার গোধন রাজ্য জুড়ে শৃঙ্গ নাড়িছে।

দুয়োরানীর বাছারে ! তোর ক্ষুধায়, দুপুরে,
পেটের নাড়ী চিবায় যেন হস্তে কুকুরে ।

সুয়োরানীর দুলাল ওরে ঘুমাও সুখেতে,
আরাম করে বাপের ঘরে হাসি মুখেতে ।

দুয়োরানীর দুখের বাছা ! দুধের বাছা রে !
বর্ষা শীতে বেড়াও কেঁদে বনের মাঝারে ।

সুয়োরানীর দুলাল ! শেষে, ধূলায় পড়িলে !
রক্ত দিয়ে তপ্ত মাটি পুষ্ট করিলে !

দুয়োরানীর তনয় ! ওগো তোমার মাথার ঘাম
পড়ুক আরো, ব্যস্ত কাজে থাক অবিশ্রাম ।

সুয়োরানীর দুলাল ! তোমার দেমাক ছুটেছে,
শূয়োর-মারা শড়্‌কিতে আজ খড়্‌গ টুটেছে !

দুয়োরানীর দুলাল ! কর স্বর্গ অধিকার,
ফিরাও তুমি গ্রহের গতি বিধান বিধাতার !

মহাশঙ্খ

লেবিয়ে

নিতান্ত হিম, অতি নির্জীব, কপাল-অস্থি ওরে,
মোর হাতে তুমি হয়েছ পরিষ্কৃত ;
ধৌত ধবল অমল তোমায় করেছি যতন ক'রে
ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে নাম লিখেছি সংস্কৃত ।

পাঠের বেলায় সঙ্গী আমার ! ওরে বিষণ্ণ ! তোরে
কোণে ফেলে আমি রাখিতে কি পারি, বল্‌,
সময় কাটে না, কাছে আয় তুই ভুলায়ে রাখিবি মোরে,
কথা বল্‌ ওরে বাড়িছে কৌতূহল ।

বল্ মোরে আজ বল্ কতবার এই তোর মুখখানি
চুম্বন-লোভে সঁপিয়াছে আপনায় ?
বল্ মোরে বল্ মিলন-বেলায় সে কোন্ মধুর বাণী
ব্যক্ত করেছে মৃদু কল-বেদনায় ?

নিথর ! পার না উত্তর দিতে, বাছারে, ক্ষমতা নাই,
জন্মের মত বন্ধ হয়েছে মুখ ;
পথে যেতে যেতে মৃত্যু আপন অস্ত্র হেনেছ, তাই
জীবনের সাথী টুটেছে মাধুরীটুক্ ।

একি গো দারুণ বারতা জানালে, মোরা যে রেখেছি ভেবে
জীবন টিঁকিতে পারে অনন্ত দিন ;
এই সুখ, এই রূপ যৌবন, এও কি ফুরাবে, তবে,
এই ভালবাসা—এও তবে হবে ক্ষীণ !

কর্ম-কঠোর দিন শেষে পাঠে ব্যস্ত রয়েছি যবে,
একেলা নীরবে নির্জন এই ঘরে,
পরান আমার গুরু ভাবনার ভাষাহীন গৌরবে
ধীরে ধীরে ধীরে এমনি করিয়া ভরে ।

তোর পানে চেয়ে কেটে যায় বেলা নিয়তির কথা ভেবে,
বাহিরে আঁধার, নয়নে স্বপ্নঘোর ;
সহসা ও তোর ললাটের লেখা দেখে ভয়ে উঠি কেঁপে,—
'মর্ত্য মানুষ ! সময় আসিছে তোর !'

গ্রন্থাগারে

সাউদী

মৃতের সভায় মোর কাটিছে জীবন
দৃষ্টি মম পড়ে গো যেথাই,
সেথাই জাগিছে কোনো মনস্বীর মন ;
কোনোদিন মৃত্যু যার নাই ।

মৃতের বন্ধুতা কভু হয় নাকো ক্ষীণ,
আলাপ মৃতেরি সাথে করি রাত্রিদিন।

উৎসবে তাদেরি ল'য়ে করি মহোৎসব,
দুদিনে সান্ত্বনা ভিক্ষা করি,
কি পেয়েছি, কি যে মোরে দেছে তারা সব,
সে কথা যখনি আমি স্মরি,
তখনি এ অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভরে
কপোল বহিয়া মুহুঃ অশ্রুধারা ঝরে।

অতীতে মৃতের দেশে পড়ে আছে প্রাণ,
আমি বাস করি গো অতীতে,
মৃতের ভাবনা ভাবি, গাহি মৃতগান,
মৃত দুখে দুখ পাই চিতে ;
তাদের চরিত্রে যাহা আছে শিখিবার
সঞ্চিত করিয়া লই অন্তরে আমার।

তাদের আশায় আশা দিয়েছি মিলায়ে,
পাব ঠাঁই তাদেরি মাঝারে,
চলিব তাদেরি সাথে নিশান উড়ায়ে
শত শত শতাব্দীর পারে !
নাম রেখে যাব আমি জগতে নিশ্চয়,
যে নাম ধূলিতে কভু হবে নাকো লয়।

উচ্চ শিক্ষা

জোয়াকিম মিলার

পুঁথিতে যা আছে লেখা সে তো শুধু
জ্ঞানের বর্ণমালা,
পুঁথির শিক্ষা শেষ করে ধর
প্রকৃতির কথামালা ;

পুষ্পের ভাষা শিখিয়া লও গো,
গগন-গ্রন্থ পড়,
বৈশ্বমৈত্রী কর অনুভব
বাক্য করনা জড়।

'যোগ্যং যোগ্যেন'

কল্প গনর

উজ্জ্বল সেনা, রক্ত প্রবাল,
অমল মুকুতা ফল,—
কাহারো জনম খনির গর্ভে,
কাহারো সিন্ধুজল ;
তবু একদিন হয় এক ঠাঁই,
মিলি' জহুরীর ঘরে
পরস্পরের বিচিত্র শোভা
বাড়ায় পরস্পরে।
'যোগ্যের সাথে মিলিবে যোগ্য'
সনাতন এ বিধান,
কুলমর্যাদা কি করিতে পারে ?
কিবা করে ব্যবধান ?

বাঁকা

বেমন

কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা হয় নাকো
বাঁশের চুঙ্গিতে তারে যত ভ'রে রাখ ;
কুটিলের বাঁকা মন তাহারি মতন,
তার সাথে তর্ক করা বিফল যতন।

কুতার্কিক ও কাঠঠোকরা

রিকার্ড ডেক্সেল

কুতার্কিকের নাহিক প্রভেদ
কাঠঠোকরার সঙ্গে,
ঠুকরিয়া পোকা বাহির করে সে
বনস্পতির অঙ্গে ;
যোজন জুড়িয়া বিতরে যে জন
ফল ছায়া আপনার,—
নীড় বাঁধি' সুখে শত শত পাখী,
আশ্রয়ে আছে যার,—
অটল যে আছে এতকাল সহি'
কালবৈশাখী হাওয়া,—
কাঠঠোকরার মতে সে অসার ;
পোকা যে গিয়েছে পাওয়া !

অলক্ষণ

গেটে

শুক্র যদি দীপ্ত বেশে সন্ধ্যাকাশে ওঠে,
ধূমকেতুটার ধূমল পুচ্ছ পিছনে তার লোটে,
অজ্ঞাচার্য চেঁচিয়ে বলেন, 'একি ! বিষম দায় !
আমারি এই কুটীর 'পরে সবার দৃষ্টি ? হায় !
না জানি অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে আর।'
এমন সময় বলছে ডেকে প্রতিবেশী তার,
'গ্রহের ফেরে এবার আমি ডুবেছি নির্ঘাত,
বাপের হাঁপ আর সারবে কিসে মায়ের পায়ের বাত ?
জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছে খোকা, শান্তি নাইকো চিত্তে,
ভার্যা হ'ল বদমেজাজী গ্রহের কুদৃষ্টিতে !

হপ্তাখানেক বন্ধ ছিল মোদের দ্বন্দ্বরণ,
আবার বেধে যায় ;—আকাশে দেখছ অলক্ষণ ?
লোকের মুখে, কাণাঘুষায়, বুঝছি আমি বেশ,
উল্টাবে পৃথিবী এবার হবে কলির শেষ।'
অজ্ঞাচার্য বলেন, 'বন্ধু ! তোমার কথাই ঠিক,
গ্রহতারার গতিক দেখে ভুলেছি আহ্নিক !
চল দেখি ভিন্ন গাঁয়ে তল্পী আমার নিয়ে,
ও গ্রামটাতে গ্রহের দৃষ্টি কেমন ? দেখি গিয়ে।'
সেথাও দেখে শুকতারা সে তেম্‌নি চেয়ে আছে,
তেম্‌নি লুটায় ধূম্র পুচ্ছ ধূমকেতুটার পাছে !
ফিরে তখন গেল দোঁহে আপন আপন ঘর,
ধৈর্য-ধনে ধনী তারা হ'ল অতঃপর।

নব্য অলংকার

পল্ ভার্লেন্

ললিত শব্দের লীলা সকলের আগে কবিতায় ;
পয়ার সে বর্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা ;
নিশ্চয় নির্ণয় নাই, গ'লে যেন মিলিবে হাওয়ায় ;
ভারে যাহা কাটে শুধু, রবে না এমন কোনো কথা।

যথা অর্থ সংজ্ঞা খুঁজে উদ্‌ভ্রান্ত না হয় যেন চিত ;
নাই ক্ষতি নির্ভুল শব্দটি যদি নাই পাওয়া যায় ;
ব্যক্ত আর অব্যক্তের যুক্তবেণী মদির সংগীত !
তার মত প্রিয় আর নাহি কিছু নাহি এ ধরায়।

সে যেন বিমুগ্ধ আঁখি ওড়নার সূক্ষ্ম অন্তরালে,
স্পন্দহীন মধ্যাহ্নের সে যেন গো আলো ক-স্পন্দন ;
সে যেন সন্তাপহারী শরতের সন্ধ্যাকাশ-ভালে
প্রদীপ ও দীপ্তিহীন নক্ষত্রের মৌন সংক্রমণ !

আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত 'ছায়া-সুষমায়',
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হ'বে রঙীন্ তুলি নিয়ে ?
'ছায়া-সুষমা'ই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়,—
বাঁশী আর শিঙা-রবে,—স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ আর অশুচি বাচাল পরিহাস,—
পরিহার কর তুই প্রাণঘাতী ছুরির মতন ;
রন্ধন-গৃহের যোগ্য ও যে নীচ রসুনের বাস,
দেবতার (ও) পীড়াকর ; তাঁদেরো কাঁদায় অকারণ।

কবিতার কুঞ্জগৃহে বাগ্মিতা প্রবেশ যদি করে,—
বাগ্মিতার গ্রীবা ধরি' মোচড় লাগায়ো ভাল মতে ;
অনুশীলনের লাগি সাধু শ্লোক এনো ভাবান্তরে,—
সে কাজ বরঞ্চ ভাল ;—কবিতারে মাঠে মারা হতে।

বাণীর লাঞ্ছনা, হায়, বর্ণনা করিতে কেবা পারে,—
অনধিকারীর হাতে কি দুর্দশা, বিড়ম্বনা কত !
হীরা, জিরা মিলাইয়া শিকল সে গেঁথেছে পয়ারে,
নির্জীব, বৈচিত্র্যহীন ;—অর্বাচীন অনার্যের মত।

শব্দের ললিত লীলা,—সমাদর সর্বযুগে তার ;
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্তপাখা পাখীর মতন !
পাওয়া যাবে সমাচার প্রয়াণ-চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ,—ভালবাসা আরেক নূতন !

কবিতা সে হ'বে শুধু সংগীতে সংকেতে উদ্বোধন,—
আভাসের ভাষাখানি,—প্রভাতের মঞ্জিম বাতাস ;
দু'পাশে দোলায়ে যাবে গোলাপ কমল অগণন !
বাকি যাহা,—সে কেবল পণ্ডশ্রম, পাণ্ডিত্য-প্রয়াস।

স্বর্ণমৃগ

পাউণ্ড

দেখিয়াছি তারে মেঘের মাঝারে,
পাহাড়ের জঙ্গলে,
দুঃখে গলে না স্নেহে সে ভোলে না,
কেবলি নাচিয়া চলে !

তবু তার সেই চাহনিটি যেন
পূর্বরাগের চাওয়া,
দোলাইয়া যেন যায় বনে বনে
প্রভাত-শুভ্র হাওয়া !

চিরকামনার স্বর্ণমৃগ সে,
কীর্তি তাহার নাম ;
শিকারী এবং কুক্কুরদলে
দেয় না সে বিশ্রাম।

কর্তব্য ও পুরস্কার-লোভ

'কুরাল'-গ্রন্থ

পুরস্কার-লোভে হায় কর্তব্য কে করে।
মানুষ কি দেছে কবে বর্ষা-জলধরে ?

স্রোতে

লি-পো

কালিকার আলো ধরিয়া রাখিতে নারি ;
আজিকার মেঘ কেমনে বা অপসারি ?
আজিকে আবার শরৎ আসিছে মেঘের চতুর্দোলে,
শত হংসের পক্ষ-তাড়নে উড়ো-কাঁদনের রোলে !

পাত্র ভরিয়া প্রাসাদ-চূড়ায় চল,
প্রাচীন দিনের কবিদের কথা বল ;—
শ্লোকে শ্লোকে সেই পরম গরিমা, চরম সুষমা গানে,
ছত্রে ছত্রে অনলের সাথে জ্যোৎস্না পরানে আনে।

পাখীর আকুতি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি' মাথা নীচু ;
কল্প-লোকের তারায় তারায় ফিরিতে তবুও হারি,
পায়ের ধূলার মত ধরণীরে ঝেড়ে ফেলে দিতে নারি।

স্রোতের সলিলে মিছে হানি তরবারি,
মিছে এ মদিরা শোক সে ভুলিতে নারি !
নিয়তির সাথে দ্বন্দ্ব বাধায়ে মিথ্যা জয়ের আশা,
তুলে দিয়ে পাল, হাল ছেড়ে শুধু স্রোতে ও বাতাসে ভাসা !

ভাবের ব্যাপারী

উৎসব-শেষে অতিথির দল গিয়েছে চলে,
পানের পেয়ালা ফেলে গেছে হায় হর্ম্যতলে ;
আর কেহ নাই জাগায়ে রাখিতে সে কল্লোল
ওঠ্ জামি ! তবে পাত্রটা তোর ভরিয়া তোল
হোক সুরাশেষ কিবা অমৃতের ফেনা,
জুড়ে দেয়ে ফের রসের সে লেনাদেনা !

কতই গাহিলি কতই নীরবে কাঁদিলি, হা রে
মুক্তার মালা গাঁথিলি সোনার বীণার তারে।
বরষে বরষে কতই নূতন তুলিলি তান,
জীবন ফুরায় তবু হায় শেষ হ'ল না গান !
তবে সুরু কর রসের সে লেনাদেনা,
হোক সুরা কিবা সুধা-সাগরের ফেনা !

কবি

চাং চি হো

চন্দ্র আমার মনের মানুষ !
বন্ধু সে পারাবার !
গগন আমার ভবনের ছাদ !
প্রভাত আমার দ্বার !
সিন্ধু-শকুনে সঙ্গী করিয়া
চুমি গো গগন-ভালে,
নিজ দেবত্ব লুটাতে না পারি
ধরণীর ধূলিজালে।

সংগীত-মিস্ত্রীর নিবেদন

(মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর)

ওয়াটসন্

ইংলণ্ড্ ! ইংলণ্ড্ !
সিন্ধুর প্রহরী !
রাষ্ট্রের স্রষ্টা !
মানুষের ধাত্রী !
সংগীত শুনিবার
অবসর আছে কি ?—
সংগীত-মিস্ত্রীর
অপরূপ কীর্তি ?
গোলমাল দিনরাত,
কেমনে বা শুনিবে ?
নানা দলে কলহের
চীৎকার তুলিছে ;-

ভিক্ষুক ক্ষুধিত,
খনিজীবী খুশি নয়,
'শ্রম' নামে রাক্ষস
বন্ধনে অস্থির।
তবু, কবি-কর্ম-
কারেদের নেহায়ে
পড়িতেছে হাতুড়ি,—
গড়িতেছে ছন্দ ;—
তন্ময় মুখ সব,—
উজ্জ্বল, রক্তিম,
হাপরের তাপে, হায়,
ঝলসায় চক্ষু !
সত্য কি ?—শুনিছ ?
তুমি সব দেখিছ ?
তবে বুঝি নয় ইহা
পণ্ড ও নিষ্ফল
ওগো এই সংগীত-
অনুরাগ, মানবের
স্বভাবেতে, শাশ্বত
রহিয়াছে লগ্ন,—
জীবনের খাদ্যে
প্রণয়ের পানীয়ে
পুষ্ট সে, হৃষ্ট সে
মৃত্যুর অতীত
বিশ্বের সুগভীর
মর্মেতে ভিত্তি,
যমজ সে নিখিলের
সকলের সঙ্গে ;

শুধু তাই ? কিবা এই
প্রকৃতির তত্ত্ব ?
ছন্দে সে প্রকাশের
নিরবধি চেষ্টা !
তরুলতা—পুষ্পে,
তারা—উদয়াস্তে,
নদী—ভাঁটা জোয়ারে
সংগীতে বেপমান !
রাজরাজ ব্রহ্মন্
কবিদের জ্যেষ্ঠ,
তাঁরি মহাছন্দে
চরাচর চলিছে ।
তাই কহি, বিদ্রূপ
কবিতারে করো না,
মা আমার ! মা আমার !
মানবের ধাত্রী !
ধনজন, বৈভব,
সবই ক্ষণভঙ্গুর,
ছেড়ে যায় লক্ষ্মী,
ধ্রুব শুধু বাণী গো !
গান ঘিরে রাখে সব,
গান কভু মরে না,
মানুষ রচিবে গান
শুনিবে তা' মানুষে ।
সৃষ্টির একতান
সংগীত যতদিন
ঝরি' ঝরি' অবিরাম
নাহি হয় নিঃশেষ,

তত দিন আমরাও
তার সাথে গাহিব ;
যে গানের ছন্দে
নর্তিত বিশ্ব !
তবে, কবি-কর্ম-
কার দিক কবিতায়
উপহার তোরে গো !
মানবের ধাত্রী !
বয়সের চিহ্ন
মুখে তোর পড়িছে,
স্বপ্নের মত ছায়
সময়ের ছায়া গো।
গান সেই ঔষধ—
যাহে ফিরে যৌবন,
উৎস সে নবতার,
প্রভাতের নির্ঝর।
তাঁতশালে জগতের
ভাগ্য তো বুনিছ ;—
শ্রম লঘু হয় কিসে
গান নাহি গাহিলে ?
ভেবেছ কি দুনিয়ায়
সার শুধু খাটুনি ?
পূজিবার,—বুঝিবার
আছে শোভা, হর্ষ :
কবি নহে তুচ্ছ,
হীন নহে কবিতা,
মা আমার ! মা আমার !
মানবের ধাত্রী !

মেলার যাত্রী

(দাদ্দিস্থান)

চটপট ওঠ ওঠ গো মাম্মু !
ছিরি-ছাঁদ আছে মোদেরো মাম্মু
সূর্য্যির মত কপাল মাম্মু !
ঝিকমিক চোখ উজল মাম্মু !
দাঁত আমাদের মুক্তো মাম্মু !
দুটি ঠোঁট উদ্‌যুক্ত মাম্মু !
চুল চুলবুল হাওয়াতে মাম্মু !
বসে কি ভাবিস দাওয়াতে মাম্মু !
পশ্‌মী পোশাক পরে নে মাম্মু !
গাঁয়ে আমাদের মেলা যে মাম্মু !
পাগড়ী মাথায় বেঁধে নে মাম্মু !
চাদরখানাও কাঁধে নে মাম্মু !
তাজা ফুলগুলো হাতে নে মাম্মু !
ধো-ধো-দ্রিম্‌-দ্রিম্‌ !
দ্রিম্‌-দ্রিম্‌-ম্‌-ম্‌ !

পতঙ্গ ও প্রদীপ

(হিন্দী)

পতঙ্গ কহিছে, 'দীপ ! তুমি দেখ রঙ্গ,
তোমার লাগিয়া জ্ব'লে মরিছে পতঙ্গ।'
দীপ কহে, 'হায়, বন্ধু, অভিমান মিছে,
আগে হতে আমি জ্বলি, তুমি জল পিছে।'

সংকেত গীতিকা

ভোর হয়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর !
সুন্দরী ! তুমি কত ঘুম যাও ? স্বজনী !

গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর ?
টুটিল না ঘুম ? দেখ চেয়ে,—নাই রজনী।
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহে কে ! আর
কাঁদে কেবল !
নিখিল ভুবন করে করাঘাত দুয়ারে তোর,
পাখী ডেকে বলে; 'আমি সংগীত-সুষমা' ;
ঊষা বলে, 'আমি দিনের আলোক, কনক-ভোর',
হিয়া মোর বলে, 'আমি প্রেম, অয়ি সুরমা !'
প্রিয়া ! কোথায় ?
শোনো, চপল !
বঁধুয়া গায়,—
নয়নে জল।
ভালবাসি নারী ! পূজা করি, দেবী ! মূরতি তোর,
বিধি তোরে দিয়ে পূর্ণ করেছে আমারে ;
প্রেম দেছে শুধু তোরি তরে বিধি হৃদয়ে মোর,
নয়ন দিয়েছে দেখিতে কেবল তোমারে !
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল !
গাহিতে গান
কাঁদি কেবল !

কৃপা-কার্পণ্য

ফজুলী

অবগুণ্ঠন কর গো মোচন, নিশার আঁধার
গিয়েছে ক্ষয়ে,
বাহির হও গো, তোমারে দেখিতে সূর্য এসেছে
বাহির হয়ে !

মোর মরমের যতেক তন্তু যত খুশি তুমি
জটিল কর,
কুসুম-গন্ধী কুন্তল শুধু কুটিল কোরো না,
মিনতি ধর।
যেখানে-সেখানে অমন করিয়া চাহনি তোমার
যেয়ো না হানি',
সারা ধরণীতে হাহাকার ধ্বনি তুলো না, তুলো না,
তুলো না রানী!
আকাশের তারা গণিয়া গণিয়া আমি যে যামিনী
কাটাই নিতি,
জাগো জাগো মোর প্রভাতের আলো! মৌন ধরার
ফাগুনী-গীতি!
ফজুলীর দিন কাতরে কাটিছে;—কারণ তাহার
সুধালে কেহ,—
সরমের কথা কি বলিবে? হায়, একটুও তারে
দাওনি স্নেহ!

শিকারীর গান

মহুয়া গাছের তলে হরিণ চরে,
আরে, ঘাসের 'পরে;
গুড়িগুড়ি বাঁকা পথে শিকারী চলে;
আহা, কতই ছলে!
মহুয়ায় হরিণের মন হরিল,
সারা বন ভরিল;
তীর বেগে হয়ে খাড়া ধনুকধারী
তীর হানে শিকারী!

মহুয়া গাছের ছায়ে হরিণ পড়ে ;
লোহ লাগে শিকড়ে ;
আহ্লাদে ফুকারিয়া চলে শিকারী,
আজি, আমোদ ভারি !
আয়ে ! ধনুকধারী !!

নারী

অল্‌রিচি

নারী নিরমলা, নারী সুন্দরী,
নারী মনোরমা স্বর্গের পরী,
নারী সে ভেষজ ব্যথিত মনের,
নারী সে ভূষণ বীর্যবানের,
নারী সম্পদ, নারী সম্ভ্রম,
নারী-প্রেমলাভ ভাগ্য পরম।

নৃত্য-গীতিকা

(মেক্সিকো)

গোটা গোটা উঠল ফুটে জাল্‌-তু-মোতির ফুল,
পাপড়ি সে পুরন্ত হ'ল বাতাসে দুল্‌দুল্‌ ;

পাহাড় কোলে কুজ্ঝটিকা ঘুমিয়ে প'ল আজ,
শীষ দিয়ে ঐ নীল পাখীটি ডুবলো পাতার মাঝ !

কঠিন ঠোঁটে গাছের বাকল কোন্‌ পাখী কাটে,
কাঠবিড়ালীর 'চিড়িক্‌' 'চিড়িক্‌' শব্দে কান ফাটে ;

কালো বাদুড় মাকুর মতন সাঁঝের জাল বোনে,
ফলন্ত গাছ নুয়ে কথা কয় মাটির সনে !

হাওয়ার কোলে মিলিয়ে গেল একলা চিলের ডাক,
বৃষ্টি এসে পড়ল ব'লে,—আয় গো নাচা যাক্‌।

মন যারে চায়

(মুণ্ডারি)

কাকের ও কোলাহল চাইনে,
মুখর ঘটক দল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই ;
ডগমগ চৌদোল চাইনে,
জগঝম্পের রোল চাইনে,
মন যারে চায় আমি তারে শুধু চাই ।
দুয়ারে আমের শাখা চাইনে,
কপালে সিঁদুর আঁকা চাইনে,
ভালবাসা যায় যারে তারে শুধু চাই ।

বসন্তের প্রত্যাবর্তন

সুকুন্ত

কিরণে ঝলমল অগাধ নীলজল,
নীল কমল তায় ফুটেছে ;
বনের পথ ধরি' চলেছে সুন্দরী,
নীল কমল হেরি' ছুটেছে ।

ঝাপ্‌সা ঝোপে ঝাপে ব্যথিত বায়ু কাঁপে,
পিচের শাখে শাখে পাতার সূচী ;
ঝাউয়ের মৃদু ছায়া রচিতে কি যে মায়া
ছড়ায়ে বন-পথে সোনার কুচি !

নীল কমল লখি' চলে কমল-সখী,
বন বিজন, ভিজা ভেষজ ঘ্রাণ ;
আবেশে একাকার চলিতে পিছে তার
শুনি গো বারবার পুরানো তান ;—

'নিখিলে আছে মিশে কাহিনী অনাদি সে,—
যা' ছিল পুরাতন হ'ল সে নব ;
কালের বিষে জরা তরুণ হ'ল ধরা
পুরানো প্রাণে নব প্রেমোৎসব !'

প্রেমিক ও প্রেমহীন

'কুরাল'-গ্রন্থ

ভাল যারা বাসে শুধু তারা ভাল থাকে ;
প্রেমহীন সারা হয় বহি' আপনাকে।

"বৌ-দিদি"

ডিরোজিয়ো

বৌ-দিদি চাস্ ? বোন্‌টি আমার,
বৌ-দিদি তোর চাই ?
তারার হাটে খুঁজব এবার
দেখব যদি পাই।
তুই যে মোদের পুণ্যপ্রভা,—
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আনতে হবে
পুণ্য হোমের টিপ।

স্বপ্ন-দেবীর পাখা দু'খান্
ধার করে-না-নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধরব গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌ-দি' হবে তোর !

ডুবব সোজা সাগর জলে
সূর্যালোকের মতো,
প্রবাল-গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরানীর মুকুটখানি
আনব সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্য-মণি
বৌ-দি' হবে তোর !

পক্ষিরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
যাদু-জানা পাগল-পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান্ গিয়ে কল্প-লোকের
আনব সে মন্দার,
বৌ-দি' তোমার সেই তো হবে
বোনটি গো আমার।

ভালবাসার সামগ্রী

সম্রাট বাবর

ভালবাসি হাসি-ভরা বসন্ত মধুর,
আর ভালবাসি নব বরষ প্রবেশ ;
রসের পূরিয়া ভালবাসি গো আঙুর
ভালবাসি সুখালস প্রেমের আবেশ !
ধরে রাখ, দেখ দেখ, সুখ না পালায়,
পালালে সে এ জীবনে ফিরিবে না হায় !

অতুলন

(একটি মালাই পাত্তমের হুগো কৃত ফরাসী অনুবাদ হইতে)

প্রজাপতিগুলি খেলিয়া ফিরিছে পাখার ভরে,
শৈল-মেখলা সিন্ধুর কূলে গেল গো তারা !
পঞ্জরতলে মন কাঁদে মোর কাহার তরে,
জন্ম অবধি সারাটি জীবন এমনি ধারা।

শৈল-মেখলা সিন্ধুর কূলে গেল গো তারা।
গৃধ্র উড়িল—চলিল সে বাস্তামের পানে ;
জনম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা,
কিশোর মূরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে।

গৃধ্র উড়িয়া চলে ওই বাস্তামের পানে,
পত্তনপুরে পৌঁছি' গুটায় পক্ষ দুটি ;
কিশোর মূরতি বড় ভাল লাগে মোর নয়ানে,
তবু ভাল যারে বাসি তার মত নাইক দুটি।

পত্তনপুরে গৃধ্র গুটায় পক্ষ দু'টি,
যুগল কপোত চলেছে উড়িয়া দেখ গো চাহি ;
ভাল যারে বাসি তার মত আর নাইক দু'টি,
মরম-দুয়ার খুঁজে নিতে তার তুল্য নাহি।

সন্ধ্যার সুর

বদ্‌লেয়ার

ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার, স্পন্দিত-সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হাহুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন ;
সান্ত্র-ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন !
সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ ।

শিহরি' গুমরি' বাজিছে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন,
অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস ;
সুন্দর ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ,
ঘনীভূত নিজ শোনিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন !

অগাধ আঁধার নির্বাণ-মাঝে নাহি পাই আশ্বাস,
ধরার পৃষ্ঠে মুছে গেছে শেষ আলোকের লক্ষণ ;
ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন,
স্মৃতিটি তোমার জাগিছে হৃদয়ে, পড়িছে আকুল শ্বাস ।

কৌশলী

(প্রাচীন মিশর)

শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিব পড়িয়া ঘরে,
পীড়িত জানিয়া পড়শী আসিবে দেখিতে মোরে ;
আমি জানি মনে তাহাদেরি সনে আসিবে প্রিয়া,—
আমারে নীরোগ করিয়া, বৈদ্যে লজ্জা দিয়া !

নীরব প্রেম

ওয়াইল্ড্

পাপিয়ার তান না ফুরাতে, রবি সহসা যেমন ক'রে
নিষ্প্রভ করি' দেয় রশ্মিতে মন্থর শশধরে,
তেমনি করিয়া, সূর্যের মত উজ্জ্বল তব রূপ,
কণ্ঠ আমার করেছে হরণ ; গান একেবারে চুপ !

উতলা বাতাস সহসা যেমন দ্রুত পাখাভরে আসি'
জোর ফুঁয়ে ভেঙে ফেলে গো কীচক,—তার সবে-ধন বাঁশী ;
তেমনি করিয়া আবেগের ঝড় আমারে করে গো ক্ষীণ,
ভালবাসা মোর অমিত বলিয়া ভালবাসা ভাষাহীন।

নয়ন আমার সে কথা তোমারে জানায়েছে নিশ্চয় ;—
কেন যে বাঁশরী নীরব আমার বীণা সে মৌন রয় ;
সে কথাটি যদি না পার বুঝিতে বিদায়, বিদায় সাকী,
না-পাওয়া চুমার, না-গাওয়া গানের স্মৃতি লয়ে আমি থাকি।

প্রথম সম্ভাষণ

ফর্দুসী

কতবার ভেবেছি গো, ভগবান নিজ করুণায়,
নিভৃতে সৌন্দর্য তব দেখাইয়া দিবেন আমায় ;
আজিকে আপনা হতে তুমি মোরে দিল দরশন !
অনেক দিনের সাধ—হৃদয়ের—করিলে পূরণ।

চক্ষে দেখিতেছি তোমা, কণ্ঠস্বর শুনিতেছি কানে,
হে সুন্দরী ! কহ কথা, আরবার চাহ মোর পানে ;
মুগ্ধ এ শ্রবণে তুমি বল যাহা বলিবার আছে,
অন্তরের অভিলাষ অসংকোচে কহ মোর কাছে।

মুগ্ধ

কিস্‌ফালুডি

নীল আকাশের বিমল প্রভাতে
তোমারেই শুধু দেখি, কিশোরী !
গিরি নির্ঝরের রুপালী তুফানে
তুমি দেখা দাও মূরতি ধরি' !

স্পন্দনহীন প্রখর রৌদ্রে
রয়েছ দাঁড়ায়ে হে অপ্সরী !
চঞ্চল শিখা তারায় তারায়
হাসিছে আকুল জোছনা ভরি' !
যে দিকে চাই
দেখি তোমায় !
আঁখি ফিরাই,—
রয়েছ ! হায় !
কভু পিছে কভু হাসিছ সমুখে,
হায় নিষ্ঠুরা ; একি চাতুরী !

প্রেম-পত্রিকা

নেজাতি

প্রকৃতি-মধুরা, মুখে হাসি ভরা, ভিতরে বাহিরে মধু।
রূপ-দেবতার প্রতিমা তুমি গো, গঠিত অমৃতে শুধু !
সুল্‌তানা ! আমি গোলাম তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হলে

ওই অধরের সুধা পান করি আয়ু হ'ল অক্ষয়,
অমৃত-কূপের সন্ধান জেনে মরণে কি আর ভয় ?
স্বাদু ও সরস নাহি চাহি যশ, তুমি রাখ হাতে হাত,
রাজা বিনা কার এমনটা ঘটে ? আর কেবা হয় মাত ?

কপোতের মত শুভ্র আমার ক্ষুদ্র এ চিঠিখানি,
পাখ্‌না মুড়িয়া চলিল উঠিয়া তোমারি সমীপে, রানী !
এমন একটা কিছু করা চাই শীঘ্র না ভোলে লোকে,
শাবাস নেজাতি, তোম্—তানা—নানা, হাসি যে উছলে চোখে !

ভ্রাছুই গান

মেদুর নয়ন মেঘের মতন,
দারুচিনি জিনি দাঁত,
চোখের চাহনি, চাহনি সে নয়,—
লাখ টাকা হাতে হাত!
বোঁটাতে তোমার জল যদি থাকে
দাও গো না করি ছল,
আমার পক্ষে হবে ঔষধ
তোমার হাতের জল।
ওগো সুন্দরী ক্লান্ত মনের
পক্ষেতে তুমি তাঁবু,
শর্করা-খাদী বাদ্‌শাজাদী সে
ও রূপের কাছে কাবু!
তুমি যেন কোনো ফুলের গন্ধ,—
কেবল গন্ধটুকু!
গোলাম আমারে করেছে তোমার
মশালা-গন্ধী মুখ!

সাধ

(মিশর)

তোমার দুয়ারে দ্বারী হতে পেলে আমি তো তাই
কিছু না চাই,
বাঁচিয়া যাই!
ভর্ৎসনা-বাণী কম্পিত মনে শুনি গো কত,
শিশুর মত,
নয়ন নত।

আমি যদি হায় হতাম তোমার হাব্‌সী দাসী,
রূপের রাশি,
নিকটে আসি
অবাধে দু'চোখ ভরি' দেখিতাম ; সরম ভয়ে
যেতে না স'রে,
ঘোম্‌টা প'রে !
হতাম যদি ও করে অঙ্গুরী, কণ্ঠে মালা,—
হৃদয় আলা !
রূপসী বালা !
মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয় তলে,
নানান্ ছলে,
বেড়িয়া গলে ;
এক হয়ে যেত আঙ্গুলি আর অঙ্গুরীতে,—
অতি নিভৃতে,—
দুইটি চিতে ।

সংকোচ

(জাফর)

ভালবাসি তারে প্রাণপণ ভালবাসা,
তাহারি বিরহে মরিয়া যেতেছি দুখে ;
সে নাম শুনিতে কেহ যদি কর আশা,
বলিব না, হায়, আনিতে নারিব মুখে !

মিলন জনমে যদি নাই ঘটে, হায়,—
আশা যদি শুধু উঠিয়া মিলায় বুকে,—
অশরণ হিয়া ফাটিয়া টুটিয়া যায়,—
তবুও সে নাম বলিতে নারিব মুখে !

গোপন সে নাম বাহির করিতে কেহ
ছুরি ল'য়ে যদি আসে মোর সম্মুখে,—
চিরে চিরে করে চিরুনির মত দেহ,—
তবু বলিব না,—আনিব না তাহা মুখে !
যার কেশজালে হৃদয় পড়েছে ধরা,—
যেখানে সেখানে যখন তখন
সে নাম কি যায় করা !

দুঃসহ দুঃখ

ওয়াং সেং-জু

চাঁদের নৌকা ভাসিয়া চলেছে শৈল-শিখর 'পরে
প্রদীপের আলো মরে ;
অতীত অযুত বসন্ত আজি বুকে মোর হাহা করে,
আর, আঁখি জলে ভরে !
মরমের ব্যথা বুঝিলে না, বঁধু ! এ দুখ রাখিতে ঠাঁই
নাই গো কোথাও নাই ।

চাঁদের লোভ

জয়নাব

অবগুণ্ঠন ঘুচাও, রূপের
আলোকে ভুবন ভরিয়া দাও,
পুরাতন এই ধূলির ধরণী
নিমেষে স্বর্গ করিয়া দাও !
স্বর্গ-নদীর মৃদু-হিল্লোল
হাসিতে তোমার দোলায়ে দাও,
অগুরু-গন্ধে ছেয়ে ফেল দেশ,—
কুঞ্চিত কেশ এলায়ে দাও !

তব কপোলের সুকোমল লোম
ফার্সী আখরে হুকুম লিখে,
বাতাসের হাতে দিয়ে, বলে দেছে,—
'জয় ক'রে এস দিগ্বিদিকে !'
অমৃত কূপের সন্ধান, যদি
বিধাতা না দেন, পায় না কেহ,
হাজার বরষ ঘুরে মর কিবা
মাটি হয়ে যাক্ সোনার দেহ !
জয়নাব ! তুমি অ-বলার রীতি
এবারের মত ছাড়িয়া দাও,
নিষ্ঠায় মন দৃঢ় কর, সখী,
আকাশের চাঁদ পাড়িয়া নাও !

তবু

ফর্দুসী

তবু মোরে হ'ল না প্রত্যয় !
হাজারের মাঝে, ওরে ! বেছে যে নিয়েছে তোরে
আমার এ অবোধ হৃদয় ।
ছিনু একা, ছিলাম স্বাধীন ;
তোমারি লাগিয়া হায়, শিকল পরেছি পায়,
রহিব তোমারি চিরদিন ।

উপদেশ

দে জুয়ি

কথা শোন, বুলবুলি !
দিন কিনে নে রে বন্ধু !
অরুণ এ দিনগুলি
ভালবাসিবারি জন্য ।

বিজ্ঞেরা অকারণে
নিন্দে প্রণয়টিকে,
প্রেমিক জেনেছে মনে
বিজ্ঞ আমোদ ফিকে।

স্বপ্ন যদি এ প্রণয়
নিদ্রা বাড়ানো যাক্;
জাগার বয়েস এ নয়,
সে ভাবনা আজ থাক্।

যদি দেখি সুখ-স্বপন
স্বপনেরি সাথে চুঁয়ায়
শেষ করা যাবে জীবন
ভুলচুকে ধরা ধুয়ায়।

নিষ্ফলারম্ভ

(মিশর)

মৃণালের লাগি কাঁদিছে মরাল
কাতরে বিদায় কালে,
তুমি তো দিলে না ভালবাসা, শুধু
আমি জড়াইনু জালে;
হৃদি-তন্তুতে পড়েছে গ্রন্থি
কেমনে ছিঁড়িব, হায়,
কেমন করিয়া এড়াব না জানি,
ছাড়াতে জড়ায় পায়
নিত্য যে আমি সন্ধ্যাবেলায়
নিয়ে যাই পাখী ধ'রে,
পরিজনে যদি সুধায় আজিকে,
কি কহিব উত্তরে?

তোমার প্রেমেরে বন্দী করিতে
আজি পেতেছিনু জাল,
নিষ্ফলে বেলা ফুরাল আমার
বৃথা কেটে গেল কাল

গুপ্তপ্রেম

কুরেন্‌বার্গ

হিয়ার মাঝারে প্রাণ কাঁদে মোর
খেদে দু'নয়ন ঝুরে ;
বঁধুতে আমাতে হ'ল না মিলন,
চিরদিন দূরে দূরে।
মন্দ লোকের সন্দেহে ধিক্,
বিধাতা জানেন মন,
চক্ষের দেখা দেখিতে পাব না
তাই ভাবি অনুখন।

অভ্যর্থনা

রাজা অমরু

পদ্মে রচিয়া বন্দন-মালা দেয় না তোরণে দোলায়ে,
সম্বল তার আঁখি-পদ্মের দৃষ্টি ;
সুরভি অধরে মৃদু হাসি লয়ে বাতায়নে থাকে দাঁড়ায়ে,
পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি !
মঙ্গল ঘট বুকে করে থাকে, শ্রম জলে অভিষিক্ত,
মাটিতে নামায়ে রাখিতে দেখিনি কভু সে,
তরুণীর পতি অভ্যর্থনা বাহির হইতে রিক্ত,
অন্তরে মিঠা অমৃত ছিটায় তবু সে !

সন্ধ্যার পূর্বে

সুইন্‌বার্ন

ওগো ! দিনের নাবাল ভূঁয়ে,
আর রজনীর এই পারে,
কিছু ধরিয়া পাইনে ছুঁয়ে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে ;
ছায়া মোলায়েম, আলো মৃদু,
পড়ে পথে ঘাটে নুয়ে নুয়ে ;—
রবি ছড়িয়ে গেছে সে সীধু,
বাদল যে ফুল গিয়েছে থুয়ে।
এই নিভৃত নিমেষগুলি
সে কি বৃথাই বহিয়া যাবে ?
মরণ আছে যে নয়ন তুলি',—
শেষে প্রেমের অযশ গা'বে ?
তবে ফুলেরা দেখুক্, অয়ি !
এই ভরা প্রেম নিমেষের,
ওগো ভালবাসা হ'ক জয়ী
আজ মরণের 'পরে ফের

অসাধ্য-সাধন

নৈলি

দেহ-বিমুক্ত আত্মা দেখিবে ?—
এস তবে ত্বরা করি',
মৌন পূজায়,—স্খলিত-বসনা
দেখ ঐ সুন্দরী।

গান

নিগ্রো ডান্‌বার

নয়নে নয়ন রাখ গো
হাতখানি রাখ হাতে,
অধরে অধর ঢাক গো
ঘন চুম্বন পাতে !

চুম্বন সে যে মধুর মদিরা
প্রেমিকে করে সে পান,
পিয়াও, পিয়াও, কাফ্রি-কুমারী !
চুম্বন কর দান।

কমল—কমলে নেহারি'
ফোটে গো যেমন প্রাতে,
প্রণয় তেমনি দোঁহারি
বিকশিছে এক সাথে !

শ্যামল তমাল, শ্যামা লতিকায়
কোরো না গো ঠাঁই ঠাঁই,
কাফ্রির কালো কাফ্রিনি ভাল,
তুলনা তাহার নাই।

খেয়ালীর প্রেম

মেসিহি

ওগো রানী ! দাস পড়িয়াছে বাঁধা তোমার চুলের
শিকল-জালে,
সকল দাসের আগে চলা তাই দৈবে ঘটেছে
মোর কপালে !

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে ;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে !
আমার মনের গহন গুহায় পশেছে তোমার
দস্যু আঁখি ;—
হৃদয় পরান আতিপাতি করি' ধরিতে তোমারে
পারিব নাকি ?
রাঙা অধরের চুম্বন লোভে রাঙা মদিরার
পাত্র চুমি,
সুরার পাত্র দেখিবা মাত্র মনে হয়, বুঝি,
নিকটে তুমি ।
বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন খেয়ালে
রয়েছে সুখে,
বাদ্‌শার চেয়ে বড় হয়ে গেছে তোমার মুরতি
ধরি' এ বুকে ।

সুলতানের প্রেম

জুম সুলতান

ছিন্ন কলিজা পলিতা হয়েছে,
হাসির আগুন লাগায়ে দাও,
বিধাতার বরে আলো হবে ঘর
মোর দীপখানি জাগায়ে দাও
আঁখি জলে মোর হয়েছে সাগর,
এ তো দু'দিনের বন্যা নহে,
কত ঝরে গেছে কতই ঝরিছে
কেবা নির্ণয় করিয়া কহে ?

গান

নিগ্রো ডান্‌বার

নয়নে নয়ন রাখ গো
হাতখানি রাখ হাতে,
অধরে অধর ঢাক গো
ঘন চুম্বন পাতে !

চুম্বন সে যে মধুর মদিরা
প্রেমিকে করে সে পান,
পিয়াও, পিয়াও, কাফ্রি-কুমারী !
চুম্বন কর দান।

কমল—কমলে নেহারি'
ফোটে গো যেমন প্রাতে,
প্রণয় তেমনি দোঁহারি
বিকশিছে এক সাথে !

শ্যামল তমাল, শ্যামা লতিকায়
কোরো না গো ঠাঁই ঠাঁই,
কাফ্রির কালো কাফ্রিনি ভাল,
তুলনা তাহার নাই।

খেয়ালীর প্রেম

মেসিহি

ওগো রানী ! দাস পড়িয়াছে বাঁধা তোমার চুলের
শিকল-জালে,
সকল দাসের আগে চলা তাই দৈবে ঘটেছে
মোর কপালে !

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে ;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে !
আমার মনের গহন গুহায় পশেছে তোমার
দস্যু আঁখি ;—
হৃদয় পরান আতিপাতি করি' ধরিতে তোমারে
পারিব নাকি ?
রাঙা অধরের চুম্বন লোভে রাঙা মদিরার
পাত্র চুমি,
সুরার পাত্র দেখিবা মাত্র মনে হয়, বুঝি,
নিকটে তুমি ।
বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন খেয়ালে
রয়েছে সুখে,
বাদ্‌শার চেয়ে বড় হয়ে গেছে তোমার মুরতি
ধরি' এ বুকে ।

সুলতানের প্রেম

জুম সুলতান

ছিন্ন কলিজা পলিতা হয়েছে,
হাসির আগুন লাগায়ে দাও,
বিধাতার বরে আলো হবে ঘর
মোর দীপখানি জাগায়ে দাও !
আঁখি জলে মোর হয়েছে সাগর,
এ তো দু'দিনের বন্যা নহে,
কত ঝরে গেছে কতই ঝরিছে
কেবা-নির্ণয় করিয়া কহে ?

ম্লান সন্ধ্যার অরুণ শিঙার,—
সে আমারি রাঙা চোখের ছায়া,
আঁধার গগনে তাই তো লেগেছে
পদ্মরাগের রঙীন মায়া।
তুমি সুষমার কাব্য মহান্,—
গোলাপ তো তার একটি পাতা ;
তব কপোলের মৃদু-লোম-লেখা
ফার্সী আখরে লিখেছে গাথা !
আমি বলেছিনু, 'জুম্ সুলতান
তোমার চুমার একটি মাগে'
মনে পড়ে ? তুমি হেসে বলেছিলে, —
'দাবী আছে বটে বিধির আগে।'

প্রেমের অত্যুক্তি

(একটি স্পেন দেশীয় কবিতার অনুসরণে)

হাজারটা মন থাকত যদি সব কটা মন দিয়ে,
ভাল তোমায়স বাতাম আমি, প্রিয়ে !
কুবেরের ধন পাই গো যদি পায়ে তা' অর্পিয়ে
ভাবব,—কিছুই হয়নি দেওয়া, প্রিয়ে।
লক্ষ-লোচন ইন্দ্র হয়ে, তোমার পানে থাকব চেয়ে,
হাজার বাহু দিয়ে তোমায় ধর্ব আলিঙ্গিয়ে,—
কার্তবীর্য রাজার মত, প্রিয়ে !
কানুর মত শিখব বেণু বৃন্দাবনে গিয়ে,
তোমায় শুধু কর্তে খুশি, প্রিয়ে !
ফাগুন হয়ে দিব তোমায় লাবণ্যে ছাপিয়ে,
প্রণয় হয়ে সোহাগ দিব, প্রিয়ে !

কবি হ'ব মন গলাতে, রাজা হব সাধ মিটাতে,
নিত্যকালে পেতে তোমায় স্বর্গ হ'ব প্রিয়ে।
সকল সাধন,—সকল পুণ্য দিয়ে।

অদৃষ্ট ও প্রেম

ফর্দুসী

অদৃষ্ট শাসন করে নিখিল ভুবনে,
শাসনে সে রাখে নৃপগণে ;
নারীর হৃদয়, প্রাণ, প্রেম চিরদিন
হয়ে আছে তাহারি অধীন !
রক্ত হতে পারে ক্ষয়, কি ফল তাহায় ?
অদৃষ্ট প্রেমের গতি, কে রুধিবে, হায় !

মনের মানুষ

(সুইডেন)

সিন্ধু-শকুন শুভ্র পাখা হেলিয়ে চলে যায়
মত্ত তুফান ধর্তে আসে, ভয় করে না তায় !
যে দিকে যাক্ ফিরবে কপোত নীড়েই পুনরায়,
পরান আমার অহর্নিশি তোমার পানে ধায় ;—
ওগো, মনের মানুষ !
জোয়ারের জল হ'ক সে প্রবল, প্রেমের কাছে নয়,
পণ্যবহা নদীর মত অগাধ সে প্রণয়।
ঝরনা জলের মতন বিমল অয়ি নিরাময় ;
প্রেমের চোখে তন্দ্রা নাহি সদাই জেগে রয় ;—
ওগো, মনের মানুষ !
অতল-তলে নামতে পারি আনতে মুক্তায়,—
যেখানে ঢেউ গুমরে কাঁদে মৌন বেদনায়।

বরফ ফুঁড়ে যে ফুল ফোটে পর্বতের চূড়ায়,
প্রেমের লাগি আনতে পারি—আনতে পারি তায় ;—
ওগো, মনের মানুষ !

বন-গীতি

আলবার্ট গায়গার

তেতে যখন উঠছে কোঠা, যায় না ঘরে টেঁকা,
তখন উচিত বেরিয়ে পড়া 'দুই-প্রাণীতে-একা' !
চোরাই সোহাগ বেঁটে নেওয়া নয়কো নেহাত মন্দ,
বনের ভিতর ঘনায় যখন অল্-বোখারার গন্ধ।

সূয্যি মামার পাইকগুলো বাইরে বিষম খুঁজচে,
পালিয়ে-ফেরা ফেরার দুটোর দুষ্টুমিটা বুঝচে !
ঝোপের খোপে কুলফি হাওয়া দিচ্চে হেথা জুড়িয়ে,
দুষ্টু দুটো পাড়ছে গাছের নিচ্চে তলার কুড়িয়ে।

দিনটা যখন যাচ্চে ভাল যায় সে ঘোড়া ছুটিয়ে,
দীর্ঘ ঘন ঘাসের রাশে পড়ল কে ওই লুটিয়ে ?
নুইয়ে-পড়া তৃণ আবার দাঁড়ায় ঘন সার দিয়ে,
কিচ্ছু দেখা যায় না গো আর আঁধার বনের ধার দিয়ে।

মিলনানন্দ

(মিশর)

যখনি তাহারে আসিতে দেখিতে পাই,
হৃৎ পিণ্ডটা দ্রুত তালে উঠে দুলে ;
দু'বাহু বাড়ায়ে বাহুতে বাঁধিতে চাই,
অসীম পুলক উথলে হৃদয়-কূলে !

ভুজ-বন্ধনে বন্দী যদি সে করে,
তনু আরবের আতরে তিতিয়া উঠে ;
চুমে যদি হাসি-বিকচ-বিম্বাধরে,
বিনা মদিরায় সংজ্ঞা আমার টুটে !

লুব্ধা

দু-ফ্রেনি

আহা রাই আমাদের শক্ত মেয়ে,
ও সে ছাড়ে না দাঁও হাতে পেলে ;
রাই দশটা চাঁপা আদায় করে
মোটে একটি চুমা শ্যামকে দিলে !

তার পরদিনেই এক নূতন কাণ্ড,
হঠাৎ শ্যামের বরাত গেল খুলে ;
রাই দশটা চুমা দিলে সেদিন
মোটে একটি কদম্বের বদলে !

ওগো তার পরের দিন রাই আমাদের
যেন চাইতে কিছু গেল ভুলে ;
আহা শ্যামকে শুধু রাখতে খুশি
আপন অধরখানি ধরলে তুলে !

হায়, তার পরের দিন মূর্খ মেয়ে
নিজের সবই শ্যামের পায়ে থুলে ;
কারণ সন্দেহ তার চন্দ্রাকে শ্যাম
চুমা দিয়েছে গো বিনিমূলে।

মনোজ্ঞা

(মিশর)

তোমার মনের মতন হইতে কি যে ছিল প্রয়োজন,
সে কথা আমারে দিয়েছিল ব'লে গোপনে আমারি মন !
তুমি যাহা চাও, চাহিবার আগে, আমি তা' করিয়া রাখি,
যেখানে যখন খুঁজিবে বন্ধু সেখানে তখন থাকি ।
পাখী মারিবার তীর-ধনু লই পাখী ধরিবার জাল,
মৃগয়ার মাঠে ছুটে সারা হই, রোদে হয় মুখ লাল ;
আরবের পাখী মিশরে আসে গো আতর মাখিয়া পাখে,
টোপের উপর ঠোকর মারিয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে !
গায়ে আরবের ফুলের গন্ধ, পায়ে তার খস্‌খস্‌,
তোমারে বন্ধু মনে পড়ে গেল, আঁখি হ'ল সুখালস ;
শুধু কাছাকাছি পেলে তোমা' বাঁচি অধিক কামনা নাই,
তীব্র মধুর নূতন এ সুর বারেক শুনাতে চাই ।

বিদেশী

মিস্রি

স্বপনের শেষে আঁখি কচালিয়া কি দেখিনু আহা মরি !
চন্দ্রলোকের কান্তি যেন গো এসেছে মূরতি ধরি' !
ভাগ্য আমার ফলিল কি আজ ? লভিনু দৈববল ?
বৃহস্পতি কি এল একাদশে ? সখী তোরা মোরে বল্‌ ।
পরিধানে তার বিদেশীর বেশ, পরিচিত তার মুখ,
প্রেমের রূপের পূর্ণ সুষমা মন করে উৎসুক !
অনিমেষ চোখে পলক পড়িতে অমনি নিরুদ্দেশ !
দেবতার দূত ছলিয়া গেল রে মনে বুঝিলাম বেশ ।
মিস্রির আর মরণ হ'ল না ; নিশার তিমির চিরে
সিকন্দরের মত সে গিয়েছে অমৃত-কূপের তীরে ।

প্রেমতত্ত্ব

রুমি

এই ভালবাসা, এই সেই প্রেম, স্বর্গের সুখ
মর্ত্যে পাওয়া,
ঘোমটা ঘুচানো পলকে পলকে, আলোকে পুলকে
উধাও ধাওয়া !
প্রেমের পহেলা সংসার ভোলা, প্রেমের চরম
পক্ষ মেলা,
আঁখির আড়ালে ফেলিয়া জগৎ, আকাশে-বাতাসে
মত্ত খেলা !
প্রেমিকের দলে ঢুকেছ যখন, দৃষ্টি বাহিরে
দেখিতে হবে,
হৃদয়-পুরীর অলিগলি যত একে একে সব
চিনিয়া লবে।
নিঃশ্বাস নিতে কোথায় শিখিলি, ওরে মন, তুই
নিস্ তা' জেনে ;
কেন যে হৃদয় স্পন্দিত হয়—তার সমাচার
কে দেয় এনে !

প্রেম

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

গানটি ফুরাইলে যদি না মনে লয়
এমন শুনি নাই জীবনে.
সে জন গেলে চলে যদি না মনে হয়
মানুষ নাই আর ভুবনে,
'রূপসী' বলিয়া সে সোহাগ না করিলে
যদি না মানো দীন আপনায়,

যদি না জানো মনে 'জীবনে মরণেও'
বলো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।
বসিয়া জনতায় তারি সে প্রেমমুখ
ধেয়ানে যদি দিন না কাটে,—
গগন ব্যবধান,— তবুও মনো প্রাণ
না সঁপি যদি বুক না ফাটে,
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস
স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,
ভাঙিলে সে স্বপন মরিতে নার যদি
বলো না 'প্রেম' তবে কভু তায়।

বিদায় ক্ষণে

বেহায়েদ্দিন জোহির

উটের সহিস সাড়া দিয়ে গেল
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি,
এমন সময়ে দেখিনু অদূরে
দাঁড়ায়ে আমার সাকী

মন্দ লোকের নিন্দার ভয়ে
একটি কথা না বলি'
নিমেষের তরে এসে চলে গেল
আঁখি এল ছলছলি।

গোপন কথার শ্রোতা বহু জুটে,
খুঁজিতে হয় না লেশ,
এবারের মত বিদায় বারতা
চোখে চোখে হ'ল শেষ।

স্বপ্নাতীত

রবার্ট ব্রাউনিং

দুলেছিল অচিন পাখী এই ডালের এই ফেঁকড়িতে,
পরশে ফুল ধরিয়েছিল তায় গো!
তখনো তার হয়নি বাসা আগ্‌ডালের ঐ বাঁকটিতে
একেবারে নীল আকাশের গায় গো!
ফেঁকড়ি কাঙাল, স্বপ্নাতীত, হায় গো,
তারেই কিনা গান শোনানো! বেছে নেওয়া হায় গো!

থুয়েছিল রাজার মেয়ে মাথাটি তার এই বুকে,
শুভক্ষণে ক্ষণিক প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
তখনো সে তাহার যোগ্য উচ্চ প্রেমের রাজসুখে
পায়নিক, হায়, যায়নি মেতে উচ্চাশে!
কাঙাল হৃদয়—হর্ষে বুঝি টুটবে সে,
তারেও কিনা প্রেম দেওয়া গো জমিয়ে রেখে উদ্দেশে।

বাসন্তী স্বপ্ন

ৎসেন-ৎসান্

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে!
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে, 'ওরে!
উড়্‌ উড়্‌ মন উড়াব আজিকে,—
সাথে নিয়ে যাব তোরে।'
সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-জড়িত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা।

মন-রাখা ওগো মনের রাখাল !
এনু কি তোমারি দেশে ?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে ?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—
হয়ে গেল নিঃশেষ !
ব্যথিত নয়ন লুকানু যেমন
বিতথ শয্যা-মাঝে,
পরান আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে !

কোথায় চম্পাপুর !
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর !
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
সুপ্ত মু'খানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত !

বর্ষার কবিতা

কেমন হয়েছে মন,—মনে নাহি সুখ,
হারায়ে শীতের বাস শীতে কাঁপে বুক ,
কি হ'ল আমার ওগো সদা ভাবি তাই,
চন্দনের খাটে শুয়ে চোখে ঘুম নাই।
বড়ই দুখিনী আমি বড় অভাগিনী,
বিদেশে রয়েছে বঁধু আমি একাকিনী ;

দিন যায় যাতনায় হায় হায় করি,
রেশমী বালিশে শুয়ে আমি কেঁদে মরি।
তোমারে জানাই বঁধু তোমারে জানাই,
এ দশায় এ দেশে থাকিতে সাধ নাই ;
এস একবার এস সাধি পায়ে ধরি'
ফুল শেষে শুয়ে বঁধু মরি যে গুমরি'।
ঝরনা ঝরার মত আঁখিজল ঝরে,
কেঁদে নদী বয়ে যায় বঁধুয়ার তরে ;
কি হবে ফুলের শেষে, চন্দনের খাটে,
বঁধু বিনা হাহাকারে সদা বুক ফাটে !
ফিরে এস, ফিরে এস, এস বঁধু মোর,
তুমি এলে শুকাইতে পারে আঁখি-লোর।

পথিক-বন্ধু

(মিশর)

দুয়ারের পানে সতত চাহিয়া থাকি,
বঁধু যে আমার আসিবে দুয়ার দিয়া,
পথে পাহারায় রেখেছি দুইটি আঁখি,
কর্ণ সজাগ স্তব্ধ করেছি হিয়া !

স্তব্ধ হৃদয় অসাড় হইয়া আসে,
বন্ধু তোমার সাড়া যে পাইনে তবু ;
তব ভালবাসা নিধি সে আমার পাশে,
তা' বিনা পরান তৃপ্ত হবে না কভু।

প্রবাসে বসিয়া পাঠায়েছ সমাচার,
'বিলম্ব হবে'—জানায়েছ লিপিমুখে,

কেন লিখিলে না, 'ভালবাসি নাকো আর,
মনমত ধন মিলেছে,—রয়েছি সুখে।'
চঞ্চল! তুমি কেন এত নির্দয়?
এমনি করে কি বেদনা সঁপিতে হয়!

ভাবান্তর

ঝিন্দন

ভাল রীতি তব ওহে ভালবাসা
রয়েছ আমারে ভুলে!
তোমার লাগিয়া আমি পথ চাই,
তুমি তো এস না মূলে!
আপন ভাবিয়া নিকটে গেলাম
চলে গেলে পায় পায়,
কমল ভাবিয়া ধরিতে ধাইনু,
কাঁটায় বিঁধিলে হায়!
সাথী সমঝিয়া মুখ চাহিলাম
বিরক্ত হলে, বঁধু,
বেজার হইলে, বুকে চাপাইলে,
পাষাণের ভার শুধু!
আশাপথ চেয়ে তবুও রহিনু,
রহিনু জন্ম ধরে,
ছলনা যে হায় ব্যবসায় তব
বুঝিনু তা' ভাল করে!
শতবার তুমি করেছ ছলনা,—
করেছ শতেক ভাবে,
দুঃখ কেবল এ ব্যাভার তব,—
স্মরণে রহিয়া যাবে।

সুখের লাগিয়া পাহাড়-আড়ালে
লইলাম আশ্রয়,
সুখ দূরে থাক, সিংহ আসিয়া
হিয়া উপাড়িয়া লয় !

তাড়াতাড়ি করে হ'ল না শিকার
ফেলে এনু ফুল-ডালা,
তাই কি আমায় পরাইলে সখা
বিষম জ্বালার মালা ?

শিকারের মত ক্ষতবিক্ষত
করিলে আমারে বাজ !
জোর-জবরিতে পরানে মারিলে,
এই কি উচিত কাজ ?

নিমখুন করি' কাটারি রুখিলে
পূরে কি মনস্কাম ?
ভ্রূকুটি করিয়া যে ছুরি হানিলে
তাহাতেই মরিলাম।

ওগো মনোচোর ! মনের মানুষ !
কেন তুমি চঞ্চল ?
চিরদিন কি হে নিরাশ করিবে
চিরদিন নিষ্ফল ?

স্তম্ভিত হই, নিঃশ্বাস ফেলি
পূর্বের কথা স্মরি,
কহে ঝিন্দন্, তবু দেখা নাই,
বিরলে ঝুরিয়া মরি।

'তাজা-বে-তাজা'

গাও, কবি! গাও, কর বিরচন
তাজা তাজা গান, কবিতা নূতন ;
আঙুরের রসে ভিজে যাক মন,—
তাজা! তাজা! তাজা! নূতন! নূতন!

পুতলীর মত রূপসীর সাথে,
হাসিমুখে এসে ব'স গো ছায়াতে ;
আদায় করিয়া লহ চুম্বন,
তাজা! তাজা! তাজা! নূতন! নূতন!

'নহুয়া তহুয়া' সাকী একেবারে
দাঁড়ায়েছে আসি' আমারি দুয়ারে,
সে শুধু করিবে সুধা-বিতরণ
তাজা হতে তাজা! নূতন! নূতন!

পেয়ালা হেলায় ঠেলিয়া রাখিলে
জীবনে কি কভু আনন্দ মিলে?
পিয়ে দেখ হিয়া মাঝে প্রিয় ধন,
চিরদিন তাজা! নিত্য-নূতন!

মন-কাড়া দেখে বন্ধু কেড়েছি,
তারে ছাড়া আর সকলি ছেড়েছি,
মোরে তুষিবারে করে সে যতন,
ধরে নবরূপ, নিত্য নূতন!

ওগো সমীরণ! তুমি কামচারী,
যাও তুমি সখা মন্দিরে তারি,
চির অনুরাগী, বলো গো, এ জন,
তাজা এ হৃদয়। এ প্রেম নূতন!

উড়ো পাখী

ডুম্ মীরন

আপন দুখে আপনি আছি মরম ব্যথায় মর্মে মরি'
কোন্ দেশের এক উড়োপাখী মনটি নিয়ে গেছে সরি' !
মধুর, মধুর তার মাধুরী !
নিজের লোহে লাল হয়েছি নিজের সাথে যুদ্ধ করি,
জীবন—সে হয়েছে ব্যাধি, চিকিৎসা কর সুন্দরী !
চতুর ! কেন আর চাতুরী ?
নাস্‌পাতি ঢেকেছ বুকে, রেখেছ মুখ মিঠায় ভরি',
ব্যথা দিয়ে চলে গেছ ওই খেদে, হায়, কেঁদে মরি ;
নিঠুর ! দেখা দাও গো ফিরি' !
ওগো আমার সাধের স্বপন ! চিরদিনের যাদুকরী !
ভিখারী দুয়ারে তোমার আছি দিবা বিভাবরী,
হাজির আছি শুনতে হুকুম,—
মধুর ! মধুর যার মাধুরী !

একা

রিকার্ড ডেম্মেল

গোলাপ এখনো রাঙা আগুনের মত !
নৈশ বায়ে বনবীথি দুলিছে মন্থরে ;
তৃণশয্যাকালে, হায়, ছিনু নিদ্রাগত,
সহসা উঠেছি জেগে পল্লব-মর্মরে।
ওগো এস ! এস একবার !
গভীর এ নিশীথের শোনো হাহাকার !

চাঁদ লুকায়েছে লতা-কুঞ্জের আড়ালে
জোছনার কুচিগুলি পড়ে হেথাহোথা ;

বঞ্জুল-চুম্বিত কালো লহরের তালে,
জেগে ওঠে কবেকার—কোথাকার কথা !
আর্দ্র তৃণে নয়ন লুকাই,
তোমারে এমন চাওয়া কভু চাহি নাই ।

আজিকের মত ভাল বাসিনি গো কভু,
খুঁজিনি কখনো বুঝি আজিকার মত !
আঁখি-অধরের খেলা খেলেছি তো তবু,
হাসিমুখে আদর তো করিয়াছি কত ।
সুগোপন সুখের আভাস,—
তারো মাঝে, মনে হয়, পড়েছে নিঃশ্বাস ।

তুমি যদি দেখিতে,—ও জোনাকী দু'টিরে,-
দু'টি প্রাণী রাত্রি মাঝে একটি আলোক ;
চারিদিকে বনচ্ছায়া ; নিশীথ তিমিরে
সাঁতারিছে তৃপ্তি-হ্রদে তৃপ্তিহীন চোখ !
এস ! একা রহিব গো কত ;
গোলাপ এখনো রাঙা আগুনের মত !

পতিতার প্রতি

হুইট্‌ম্যান্‌

চঞ্চল হয়ে উঠিসনে তুই, ওরে,
কেন সংকোচ ? কবি আমি একজন ;
সূর্য যদি না বর্জন করে তোরে,—
আমিও তোমায় করিব না বর্জন !

নদী যতদিন উছলিবে তোরে হেরে,—
বন-পল্লব উঠিবে মর্মরিয়া,—

ততদিন মোর বাণীও ধ্বনিবে যে রে
তোর লাগি,—মোর উছলি' উঠিবে হিয়া।

দেখা হবে ফের, কথা দিয়ে গেনু নারী,
যতন করিস যোগ্য আমার হতে,
ধৈর্য ধরিস,—শক্ত সে নয় ভারী,
আসিব আবার ফিরে আমি এই পথে।

কবি আমি শুধু কল্প-ভুবন-চারী,
ব্যভিচারী নই, তবু করি অভিসার।
ভাল হয়ে থেক, মনে রেখ মোরে, নারী!
আজিকার মত বিদায়, নমস্কার!

সাকীর প্রতি

ফর্দুসী

বিষণ্ণ হয়ো না সাকী হয়ো না মলিন,
এ দিন যে আনন্দের দিন;
যুদ্ধদিনে প্রাণপণে করেছি লড়াই,
এস, আজ জীবন জুড়াই।
আনন্দের পাত্র তুলে লও হাসিমুখে,
কাঁপে চুনি আঁখির সমুখে!
ভাবনার বিষে মন ডুবায়ো না, হায়,
ধৌত তারে কর মদিরায়।

আপান-গীতি

(ফরাসী)

ব্রাণ্ডিয়ে স্বচ্ছ কাচের গেলাস!
আয় রে আমার তরল বিলাস!
অপ্সরীদের অধর সুধা! বক্ষ-লোহের দোসর তুমি!

এস মদির-নেত্রা সাকী !
এস, তোমায় সাম্‌নে রাখি,
গ্‌-গুল্‌-গুল্‌-গুল্‌, ঢুক্‌-ঢুক্‌-ঢুক্‌, জমিয়ে রাখ আসর তুমি ।
নাই জগতে এমনটি সুখ,—
গ্‌-গুল্‌-গুল্‌-গুল্‌ ! ঢুক্‌-ঢুক্‌-ঢুক্‌ !
পয়সা তিনে স্বর্গ কিনে স্বপ্ন-পরীর অধর চুমি ।

বৎসরান্তে

লরেন্স হোপ

সেও তো এমনি এক বিহ্বল শ্রাবণে
নব অনুরাগে ভরি' উঠেছিল হিয়া !
তব অলকের গন্ধ সন্ধ্যা-সমীরণে
পান আমি করেছিনু, প্রিয়া !
আজিকে মাথার কেশে রচিলে আসন,
দাঁড়ায়ে দেখিব শুধু, গলিবে না মন ।
সেও তো এমনি এক শ্রাবণ-দিবসে
মূর্তিমতী দেবী বলি' পূজেছিনু তোরে,
তুমি যা' পবিত্র করি দিতে গো পরশে
বুকে তুলে নিছি তা' আদরে ।
আজিকে টুটেছে প্রেম, মন উদাসীন,
যতনে নাহিক ফল, সে যে প্রাণহীন ।

আত্মঘাতিনী

হুড

আরেক দুর্ভাগিনী
গেছে সংসার থেকে,
জীবন যাতনা মানি'
মৃত্যু নিয়েছে ডেকে ।

ধর্ গো আস্তে ধর্
সাবধানে তোল্, বাছা ;
মুখখানি সুন্দর,
বয়েস নেহাত কাঁচা।

তবু সে পরেছে আজ
মহাযাত্রার সাজ ;
আর্দ্র বসনে, চুলে
অবিরত জল ঝরে ;
ঝটিতি নে গো নে তুলে,
ঘৃণা ভুলে, স্নেহভরে।

তুলিসনে হেলা করে,
ব্যথার ব্যথী হ', ওরে !
দাও নয়নের বারি ;
গ্লানি তার ঘুচিয়াছে,
এখন যেটুকু আছে—
সে যে পবিত্র—নারী।

তার সে মতিভ্রমে
ভাবিসনে আজ ভ্রমে,—
আর সে অত্যাচারে ;
সব কলঙ্ক শেষ,
শুভ-সুন্দর বেশ
মৃত্যু দিয়েছে তারে।

থাক তার শত ত্রুটি
তবু সে মানুষ, ওরে,

লালাস্রাবী ঠোঁট দুটি
মুছে দে যতন করে।
কবরী পড়েছে খসি'
জড়ায়ে দে চুল মাথায়,
কি নিবিড় কেশরাশি !
বিস্ময়-নীরে ভাসি'—
ঘর ছিল তার কোথায় ?

বাপ, মা—কেহ কি নাই ?
নাই কি আপন বোন ?
নাই সহোদর ভাই ?
আর কোনো প্রিয়জন ?—
প্রিয় যে সবার চেয়ে ?
হায়, অভাগিনী মেয়ে !

পর-দুখ অনুভব
হায় সে কি দুর্লভ !
সংসার সুকঠিন !
থাম-দেওয়া মোটা মোটা
এত বাড়ি, এত কোঠা,—
তবুও সে গৃহহীন !

বাপ, মা, ভায়ের স্নেহ
দিতে পারিলে না কেহ ?
কি বিষম ! কী ভীষণ।
প্রেম—গৌরব-হারা
(প্রমাণ খুঁজিছে কারা ?)
দেবতার কৃপাধারা
তাও যে অদর্শন।

কত গৃহে আলো জ্বলে—
ঝলকে নদীর জলে,
কত উৎসব হয়,
অভাগী আঁধারে থেকে
অবাক নয়নে দেখে,
নিশীথে নিরাশ্রয় !

কন্‌কনে হিম হাওয়ায়
কাঁপিয়ে দেছিল তারে,—
কাঁপাতে পারেনি যাহায়
স্রোতে কি অন্ধকারে ;
লাজ অপমান স্মরি'
মরণ নিল সে বরি',—
পরান ছুটিতে চায় রে !
যেথা হোক ! যেথা হোক !
এ—জগতের বাইরে

নদীর খরস্রোতে
গেল সে শীতল হতে,—
ঝাঁপ দিল বিহ্বলে ;
লুব্ধ পুরুষ ! কই ?
এসে দেখে যাও, ওই
কর্মের ফল ফলে !—
পার যদি স্নান কোরো,—
পান কোরো ওই জলে।
ধর্ গো আস্তে ধর্,
সাবধানে তোল্, বাছা ;
মুখখানি সুন্দর !
বয়েস নেহাত কাঁচা।

তনুখানি নমনীয়
থাকিতে থাকিতে, ওরে
যতনে শোয়ায়ে দিয়ো
শেষ শয্যার 'পরে ;
চকিত চোখের পাতা
খোলা যেন থাকে না তা',—
দিয়ো সে বন্ধ করে।

ভীষণ চাহিয়া আছে
মৃত্যু-হতাশ আঁখি,
ভবিষ্যতের পানে
যেন সে দৃষ্টি হানে
গ্লানির মাঝারে থাকি।

অমানুষ মানুষের
গভীর অবজ্ঞায়
এ দশা আজিকে এর,
তাই পাগলের প্রায়
খুঁজেছে সে বিশ্রাম ;
শোচনীয় পরিণাম।

দু'টি হাত ধীরে ধীরে
রাখ গো বুকের 'পরে,
মরণ-নদীর তীরে
যেন ঈশ্বরে স্মরে !

দোষ তার মেনে নিয়ে,
ত্রুটি—সে স্বীকার করে,
সঁপে তারে যাও দিয়ে
বিভুর চরণ 'পরে।

বন্ধন-দুঃখ

নৈলি

পিঞ্জর গড়ি' গোলাপের শাখা দিয়ে
বুল্‌বুলে আনি' যতনে রাখিনু তায়,
তবু কোন্ দুখে মরে গেল সে কাঁদিয়ে ?
কাননের পাখী বাঁধন সহে না, হায় !

জ্ঞানপাপী

বদ্‌লেয়ার

হৃদয় সে হ'ল দর্পণ আপনার,
অতল-গভীর, তরল-পরিষ্কার।
জ্ঞান-বাপী-জলে সন্ধ্যা নামিল, হায়,
একটি তারার দীপ্তি দুলিছে তায়।

অকারণে আলো করিয়া প্রেতস্থান
মশাল জ্বালিয়া হাসিতেছে শয়তান।
এ এক গর্ব ! তৃপ্তি এ অপরূপ !
জেনে শুনে ঘোলা ক'রে তোলা জ্ঞান-কূপ

মণিহারা

মেং-হৌ-জান্

রক্ত আলো মিলিয়ে গেল ইতস্ততঃ করে,
মৌন চাঁদের সুষমাতে রাত্রি ওঠে ভরে !
জানলা খুলে বাদলা হাওয়া নিই গো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে জ্যোৎস্না-তরঙ্গেতে !
নিশার বায়ু নীলপদ্মের গোপন কথা বলে,
টুপটুপিয়ে শিশির পড়ে স্তব্ধ ঝাউয়ের তলে।

ইচ্ছা করে—বাজাই বীণা ;—শুন্‌বে কে তা' আর ?
মৃতের জগৎ জাগায় এমন শক্তি আছে কার ?
এম্‌নি করে স্বপ্ন মিলায় উড়ো পাখীর সাথে !
মনের মাঝে হারামণি পাই গো গভীর রাতে !

নয়ন জলের জাজিম

হাজারটা হাত আড়ষ্ট হিম
কাজের বিষম গুঁতাতে,
জগৎ-জোড়া বুন্‌ছে জাজিম
নয়ন-জলের সুতাতে !

টানার 'পরে পড়েন পড়ে,
কাজটা ভারী খাপী গো ;
নিত্য নিশায় জাজিম বিছায়
অশ্রু জগৎ-ব্যাপী গো !

বাল-বিধবা

ডিরোজিয়ো

আমার স্বপন, সুখের স্বপন
নিমেষে ফুরাল,—এই সে ক্লেশ !
ইন্দ্রধনুর ভঙ্গুর তনু
অস্ত রবির কিরণে শেষ।
রিক্ত শাখায় রক্তিম পাতা
বাতাসে হুতাশে কাঁপিয়া মরি,
নিঠুর জগতে আছি কোনো মতে,
জানি না কখন পড়িব ঝরি' !

গঙ্গার ধারা যতদূর যায়
ওগো দয়াময়! তাহারো পারে
লয়ে যেয়ো এই সুখ-বঞ্চিত
চির-লাঞ্ছিত ভস্ম-ভারে।

লয়লার প্রতি

হাতিফি

তুমি যেথা নাই সে দেশে কেমনে থাকি?
স্বপনে যে আজো তোমারি মূরতি আঁকি?
নিরখি' স্বপনে আঁখি ভ'রে আসে জলে,
জেগে দেখি আছে একাকী এ শিলাতলে!
মরু মরীচি বিস্তারে শুধু মায়া,
ধরিবারে ধাই—সুদূরে মিলায় ছায়া!
ভাবনার জ্বালা জ্বলিছে অনুক্ষণ,
মরণ-সাগরে ডুবিলে জুড়ায় মন।
আকাশের পাখী ধরিতে করিনু সাধ,
ধরিনু যখন নিয়তি সাধিল বাদ;
চোখের উপরে কেড়ে নিয়ে গেল তারে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—নিরাশারে।
মায়াবীর রাজা খিজিরে করিনু সাথী,
অমৃতের কূপে পৌঁছিনু রাতারাতি;
তীরে গিয়ে দেখি শুকায়ে গিয়েছে জল,
সকল যতন হয়ে গেল নিষ্ফল!
লয়লা আমার কর তুমি হাহাকার,
নিঠুর নিয়তি, নিস্তার নাহি আর।
মজ্‌নু! গুমরি গুমরি কাঁদ্ রে তুই,
তোর অশ্রুতে ফুটিবে মরুতে শুভ্র সুরভি জুঁই।

অনুতাপ

ল্যাণ্ডর

আমি তারে ভালবাসি নাই, তবু,
চলে সে গিয়েছে ব'লে
ফাঁকা ফাঁকা যেন ঠেকেছি জীবন,
নয়ন ভরিছে জলে !
কত কথা সে যে আসিত বলিতে
শুনিনি তাহার আধা,
আজ কথা যদি কহে সে আবার
আর দিব না গো বাধা।
ত্রুটি খুঁজিবারে ব্যস্ত ছিলাম
ভালবাসিব না ব'লে,
জ্বালাতন তারে করেছি কেবল
মরেছি আপনি জলে।
প্রণয়ে নিরাশ হইয়া যে জন
মরণ নিয়েছে ডেকে,
তারি তরে মালা রচিব এখন
জীবন-যামিনী জেগে।

তান্‌কা

'তান্‌কা' জাপানী সনেট। ইহা পাঁচ পুঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে পাঁচটি করিয়া এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে সাতটি করিয়া অক্ষর থাকে। তান্‌কা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর হয়।]

(১)

কিনো

ফাগুন এ ঠিক,
গগনে আলো না ধরে ;
প্রসন্ন দিক্,
তবু কেন ফুল ঝরে ?
ভাবি আর আঁখি ভরে।

(২)

গোকু

ঝিঁ ঝি ডাকা শীত !
একা জাগি বিছানায় ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায় ।

(৩)

শ্রীমতী উকন্

দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি' ?

(৪)

আসায়াসু

মুগ্ধ প্রভাত,
শিশির ঝলকে ঘাসে ;
শরতের বাত
উদ্দাম ওই আসে,
সোনার স্বপন নাশে ।

(৫)

শ্রীমতী দৈনী-নো-সাম্মি

চপল সে ঠিক
দম্‌কা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভাল হ'ত ;—
ব্যর্থ যতন যত ।

(৬)

শ্রীমতী কোমাচী

কুসুমের শোভা
টুটে সে বৃষ্টি-জলে,
রূপ মনোলোভা
তাও তো যেতেছে চলে ;
আসা-যাওয়া নিষ্ফলে।

(৭)

শাক্যো-নো-তায়ু-আকিসুকে

প্রবল হাওয়ায়
মেঘ ভেঙেচুরে যায় ;
জ্যোৎস্না চুঁয়ায়,
চাঁদ ফিরে হেসে চায়,
আঁধার লুকায় কায়।

(৮)

মিচি-নোবু ফুজিবারা

যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি।

(৯)

সাদায়োরি

জেলেদের জাল
দেখা নাহি যায় জলে,
এমনি কুয়াশা ;—

দৃষ্টি নাহিক চলে,
'বেলা হ'ল' তবু বলে !

(১০)

শ্রীমতী সাগামি

রাগ কোরো না গো
জল দেখি নয়নেতে ;—
বঁধু গেছে মোর,
সুনাম বসেছে যেতে ;
মন বাঁধি কোন্ মতে !

(১১)

শ্রীমতী হোরিকারা

তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে,—আর চিন্তায়।

নৃত্য-নিমন্ত্রণ

(মুণ্ডারি)

আয় গো ক'নে সবাই মোরা নাচতে যাই,
পাথর তো নই থাকব পড়ে একটি ঠাঁই।
আয় গো ক'নে নিমন্ত্রণে যাই সবাই,
গাছের মত শিকড় গেড়ে থাকতে নাই ;
জীবন গেলে কর্বে দেহ পুড়িয়ে ছাই,
বাঁচার মত বাঁচতে চাই,—নাচতে যাই।

সুপ্রভাত

দে মুসে

স্বজনী! আমার কাননের ফুল!
তেমনিটি তুমি আছ কি আজো?
ধূলা পায়ে তোরে দেখিতে এসেছি,
এস বাহিরিয়া যেমন আছো।
ভুবন ভ্রমিয়া আজিকে এসেছি,
শোলোক রচেছি, ভালও বেসেছি;—
তবে, সে কাহিনী তোর কাছে কিছু নয়!
(তবু) দুয়ারে যখন এসেছি হঠাৎ,—
দুয়ার খুলিতে হয়;
স্বজনী! সুপ্রভাত!

পদ্মের দিনে দেখেছিনু তোরে,—
হৃদয়-পদ্ম খুলেছি সবে,—
তুমি বলেছিলে, 'আর কারো প্রেম
চাহি না, চাহি না, চাহি না ভবে!'
ত্বরিতে গিয়ে যে এল দেরি করে,—
আঁখি আড়ে তার কি করিলি? ওরে!
সে কথায়, হায়, কাজ কি আমার আর?
(তবু) এই পথে আজ এসেছি,—হঠাৎ,
খোলো জাল জালানার!
স্বজনী! সুপ্রভাত!

বিবাহ-মঙ্গল

(পার্শীজাতি)

'আজ আমাদের বিয়ে বাড়ি!'—কেমন করে জানলি ভাই?
'গয়লা আসে, ময়রা আসে, স্যাকরা আসে, জানছি তাই!'

'আজ আমাদের বিয়ে বাড়ি !'—কেমন ক'রে জান্‌লি ভাই ?
'ঘরে দ্বারে উঠান্ 'পরে লোক ধরে না,—জানছি তাই !'
'আজ আমাদের আমোদের দিন !'—কেমন ক'রে জানলি ভাই ?
'বাজ্‌ছে বাঁশী, বাজ্‌ছে ন'বৎ, শুন্‌ছি কানে, জানছি তাই !'
'মোদের বাড়ি বরের বাড়ি !'—কেমন ক'রে জানলি ভাই ?
'ঘোড়ার সারি দাঁড়িয়ে দ্বারে দেখছি চোখে জানছি তাই !'
'বরের বাড়ি আমোদ ভারী !'—কেমন ক'রে জানলি ভাই ?
'বন্ধু-কুটুম ! তাক্-দুমাদুম্ ! আঙিনায় আর নাইক ঠাঁই !—
জানছি তাই !'

সাঁওতালী গান

সোনার সাজনি দিছি কিনিয়ে,
রূপার সাজনি দিছি তায় ;
'আসিব' বলিয়ে গেছে চলিয়ে,
তবে সে এল না কেন, হায় !

বিবাহান্তে বিদায়

(মুণ্ডারি)

ভাই বোনেতে ছিলাম রে এক মায়ের জঠরে,
মায়ের যা দুধ সব খেয়েছি আমরা ভাগ করে ;
তোমার ভাগ্যে ভাই রে তুমি পেলে বাপের ঘর,
আমার ভাগ্যে ভাই রে আমি হলাম দেশান্তর।

মাসেক দু'মাস কাঁদবে বাপে, সারাজীবন মায়,
দিনেক দু'দিন হয় তো রে ভাই কাঁদবে তুমি, হায় ;
ভায়ের বধূ কাঁদবে শুধু বিদায়ের কালে,
পোষা পাখী মুছবে আঁখি আঁখির আড়ালে।

স্ত্রী ও পুরুষ

(মাদাগাস্কার)

স্ত্রী। নিত্যই তুমি বল, 'ভালবাসি'
আজিকে সুধাই তাই,—
কিসের মতন ভালবাস মোরে ?—
আমি তা' শুনিতে চাই।

পুরুষ। অন্নের মত ভালবাসি তোমা',—
অন্নগত এ প্রাণ,—
যা' নহিলে চোখ দেখিতে না পায়,
শুনিতে না পায় কান।

স্ত্রী। ক্ষুধার তাড়না না থাকে যখন
অন্ন তখন কিবা ?
এই ভালবাসা ? ইহারি গর্ব
কর তুমি নিশি-দিবা !

পুরুষ। স্নিগ্ধ বিমল নির্ঝর জল
সম তোমা' ভালবাসি,
কর্মক্লান্ত, সমুদ্‌ভ্রান্ত,—
তাই কাছে ছুটে আসি।

স্ত্রী। গুম্ফে ও চুলে ধূলা যবে ঝুলে
লোকে হেসে বলে 'চাষা'
তখনি কেবল প্রয়োজন জল ;
এই তব ভালবাসা ?

পুরুষ। শীতে সম্বল 'লম্বে'র মত
তুমি গো আমার পক্ষে,
তাই সাথে নিয়ে ফিরি চিরকাল,
বাঁধিবারে চাই বক্ষে।

স্ত্রী। হলে পুরাতন ফুয়ায় যতন
দূরে পড়ে থাকে 'লম্ব',

এই পুরুষের ভালবাসা বুঝি ?
এই নিয়ে এত দম্ভ !

পুরুষ। মধুচক্রের মতন তোমায়
ভালবাসি প্রাণ ভ'রে,—
হরষে যে ধন লুটিয়া এনেছি
যতনে রেখেছি ঘরে

স্ত্রী। মধুচক্রের সব নহে মধু,
সব (ই) নহে পরিপাটি ;
অনেক তাহাতে আছে জঞ্জাল,
ঢের আছে মলামাটি।

পুরুষ। রাজার মতন ভালবাসি তোরে,—
ভালবাসি গরিমায়, —
যাহার আদেশে ওঠে-বসে লোক,—
যার গুণ সবে গায়।

স্ত্রী। রাজার সঙ্গে প্রেমের তুলনা
কোরো তুমি চিরদিন,
যার কটাক্ষে নত হয়ে আসে
নয়ন লজ্জাহীন ;—

পুরুষ। যার কটাক্ষে কলঙ্কী হিয়া
সমরে মরিয়া যায়,
যার ইঙ্গিতে সব সংকোচ
নিঃশেষ লয় পায়।

রণচণ্ডীর গান
(আইস্‌ল্যাণ্ড)

পড়ল টানা যমের তাঁতে
পড়বে কে রে পড়বে কে !
রক্তে রাঙা শক্ত মাকু
মরবে কে আজ মরবে রে !

ঘন বুনন চলছে বেড়ে
নাইক ছাড়ান-ছিড়েন যে,
নাড়ীর মত নীল টানা, আর
রক্ত-রাঙা 'পড়েন' সে !

সকল টানার মাথায় মাথায়
চাপিয়ে নরমুণ্ড ভার,
ঠেলছি মাকু রক্তমাখা
কাটার, টাঙি, খড়্গ আর !
শক্তিগুলো চরকি আমার
কামাই নেই একদণ্ড তার,
আগাগোড়া লোহায় গড়া
তাঁতখানা খুব চমৎকার !

ভদ্রা নেছে গুটিয়ে লাটাই,
রিক্তা নলী এলায় রে !
বর্ম চিবায়, চর্ম চিবায়,
জীবন নিবায় হেলায় সে !
মরণ ঝড়ের মধ্যিখানে
বাঁচবে কে আর বাঁচবে কে ?
প্রাণের আশা নেই কাহারো,
রিক্তা এখন নাচবে যে

নন্দা, জয়া, দিগ্বিজয়ীর
কর্ণে জপে জয়ের গান ;
রিক্তা এসে কঠোর হেসে
হরণ করে বীরের প্রাণ।
নগ্ন ভীষণ খড়্গ হাতে
ঘোড়ায় তবু চড়বি কে ?
অগম দেশে চলবি ধেয়ে
ফিরবি নে আর মরবি রে !

দুঃখ ও সুখ

অজ্ঞাত

হৃদয়ের মাঝে পাশাপাশি আছে।
গুপ্ত দু'খানি ঘর,
দুঃখ ও সুখ বাস করে তাহে,—
যমজ দু' সহোদর।
সুখ জেগে উঠে আপনার মনে
খেলে গো আপন ঘরে,
দুরন্ত ছেলে দুঃখ এখনো
ঘুমাইছে অকাতরে।
ওরে সুখ! তুই চুপি চুপি খেল্,
করিস্‌নে কলরব;
এখনি দুঃখ উঠিবে জাগিয়া
করিবে উপদ্রব।

বসন্তে অশ্রু

ওয়াং-চাং-লিং

নব বসন্ত ডাক দিয়ে গেছে
দুয়ারে দুয়ারে, হায়,
নববধূ তাই এসে দাঁড়ায়েছে
আধ খোলা জানালায়।
জরিতে জড়িত নীল রেশমের
বসনে ঢেকেছে কায়া,
ললাটে এখনো চিহ্ন পড়েনি
নয়নে পড়েনি ছায়া;
সহসা বাতাস বয়ে নিয়ে এল
উতলা ফুলের বাস,

সহসা তাহার মন উথলিয়া
পড়িল গো নিঃশ্বাস।
রণচণ্ডীরে যে ধন সঁপেছে,—
যা' দিয়েছে কীর্তিরে—
তাহারি লাগিয়া বিহ্বল হিয়া,—
নয়ন ভরিছে নীরে।

সৈনিকের গান

(গ্রাস)

শড়কির মুখে কর্ষণ করি
আমরা এমন চাষা!
কাতার নাহিক, কর্তন করি
খড়্গে ফসল খাসা!
নিরস্ত্র করি শত্রু সকলে
নিরস্ত হই তবে,
পদতলে পড়ি 'হুজুর' 'জনাব'
বলি তারা কাঁদে সবে।
আপনার 'পরে আপনি কর্তা
কর্তা আপন ঘরে,
সাধ্য কি কেউ আমাদের আগে
সমরে অস্ত্র ধরে।

বীরের ধর্ম

কার্মেন্স্

বীরের ধর্মে যা বলে করিয়ো,—যে কথা যে কাজ
পুরুষে সাজে;
প্রশংসা যদি হয় প্রয়োজন খুঁজিয়ো আপন
মনের মাঝে।

ধন্য জীবন তাহারি,—যে জন নিজে বিচারিয়া
নিজের তরে
নীতি ও নিয়ম করি' প্রণয়ন, আমরণ তাহা
পালন করে ;
নহিলে কেবল বেঁচে মরে থাকা,—পুতুলের মত
আসা ও যাওয়া,—
একখানি ছায়া,—এক জোড়া চোখ, একটা শব্দ,—
একটু হাওয়া !

যোদ্ধৃ জননী

বেইলি

এস বাছা, এস বাপা ! দুলাল রে আমার
বিদায় দিয়ে তোরে,
ভাবছি এখন শূন্য ঘরে শূন্য হৃদয় নিয়ে
থাকব কেমন ক'রে।
ডাক এল আর চ'লে গেলি দুরন্ত যুদ্ধেতে,
বাপের মৃত্যু ভুলে,
অভাগী এই বিধবাকেই আবার দিতে হ'ল
বুকের পাঁজর খুলে,—
দিতে হ'ল প্রাণের চেয়ে যে জিনিসটি প্রিয়,-
পরের হাতে তুলে।
বাছা আমার ভাবে কেবল গৌরবেরই কথা,
জয়ের স্বপন দেখে ;
আমার হিয়া অমঙ্গলের মিথ্যা ভয়ে কেঁপে
উঠছে থেকে থেকে।
হয়তো বাছা হ'বি জয়ী, জয়ের মালা সবাই
দেবে তোমার গলে,

আমি সে আর দেখবনাকো, দুঃখে ও আহ্লাদে
ভেসে নয়ন জলে ;
আমি তাহার আগেই যাব,—আগেই মিশে যাব
বসুমাতার কোলে।
অল্পদিনেই যায় রে ভুলে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা
অল্পবয়সীরা,
বুড়া হাড়ে দুর্ভাবনা ঘুণের মত ধরে,
কেবলি দেয় পীড়া !
আর যারা তোর পথ চাহে আজ, বয়স তাদের কম,
হয়তো, তারা তোরে
দেখতে পাবে, খুশি হব ; ভালয় ভালয় যদি
ফিরে আসিস, ওরে !
দেখতে শুধু পাবেনাকো দুঃখিনী তোর মা,
সে অভাগী আগেই যাবে মরে।

দুর্গম-চারী

হার্ট লেবেন

ফিরে যাও, বল গিয়ে নাবিকের দলে
যে রাজ্যে করেছি পদার্পণ, সে আমার
হবে পদানত। যদি কভু দেখা হয়,
আমারে দেখিবে রাজবেশে, নহে দেখা
হবে না জনমে। এখনো বিলম্ব কেন ?
ইচ্ছা নাই যেতে ? যাও,—যাও, কথা শোনো ;
অদ্যাবধি বন্ধু ঘোড়া, ভৃত্য তলোয়ার !
বিদেশী দাসের দলে সেনা করি ল'ব,
আমার আদেশ তারা পালিবে যতনে,—
বর্বরের দল। চঞ্চল সমুদ্র সাথে
সম্পর্ক করিয়া দিনু শেষ। ফিরে যাও।

নয়ন ! এখন হতে কর অন্বেষণ
কোথা আছে কাপুরুষ, দুর্গ বিরচিয়া !

*　　*　　*

ঘোড়ার চারিটা ক্ষুর বাজিছে আজিকে
মানবের কঙ্কালে কপালে,—পদে, পদে !
অদৃষ্ট কি বিভীষিকা দেখায় আমারে ?—
আমারি পরীক্ষা হেতু ?—রাজ্যের তোরণে ?
দর্পে চল কাল ঘোড়া বর্বরে দলিয়া,
আমি যা' ওর তা' নয়—তাই ভূলুণ্ঠিত।

বন্দী

উইলিয়ম মরিস

বিকল ভাবে　　বিরস ভাবে
সারা দিনমান
কারাগৃহের　　প্রাচীর 'পরে
উড়িছে নিশান ;
বাতাসে তার　　শব্দ উঠে
বিচিত্র সুরে,
ক্লান্ত হিয়া　　আমারে, হায়,
অতিষ্ঠ করে !
ছাদের কোলে　　তীব্র আলো
গবাক্ষে জাগে,
চেয়ে চেয়ে　　শূন্য নয়ন
নির্বাণে মাগে ;
হাতে শিকল,　　পায়ে বেড়ি,
পরান সে অধীর,
কারাবাসীর　　দুঃখে কালো
পাষাণের প্রাচীর।

পাষাণ-প্রাচীর আর্তনাদের
আখরে চৌচির,
নির্যাতনের নিশান ওড়ে
নির্দোষী বন্দীর

বন্দী সারস

আরানী

বন্দী সারস দাঁড়ায়ে আছে,
পিঞ্জরতলে আঙিনা মাঝে,
উড়ে যেতে তার মন চায় ;
সাগর পার যাবে আবার,—
সে আশা এখন মিছে হায়।

এক পায়ে ভর করিয়া রহে,
বোজা চোখ দিয়ে সলিল বহে,
আর পায়ে ফিরে করে ভর ,
বদল্ করে, ভাবিয়া মরে,
হায় অসহ্য অবসর !

কভু মাথা গোঁজে পাখার নীচে,
সদূরের পানে তাকায়,—মিছে,—
প্রাচীরে ঘিরেছে চারিদিক ,
নাহিক ফাঁক, শিলার থাক,
মিছে চেয়ে থাকা অনিমিখ।

আকাশের পানে আঁখি ফিরায়,
দেখে চেয়ে চেয়ে,—উড়িয়া যায়
স্বাধীন সারস দলে দল
দেখিতে দেশ ; সে শুধু ক্লেশ
সহিছে, দহিছে অবিরল !

আজো ভুলে আছে মিছে আশায়,
ভাবে,—ফিরে পাখা গজাবে, হায়,
উড়িতে আবার হবে বল ;
বন অগাধ ভ্রমিতে সাধ,
মন হয়ে উঠে চঞ্চল।

শ্যাম লাবণ্যে শরৎ হাসে,
সারসের দল আর না আসে,
পিঞ্জরে একা আছে সেই ;
বন্দী পাখী অন্ধ আঁখি,
রন্ধ্র নেই একেবারেই।

আকাশের পথে কারা ও যায় !
পাখার শব্দ ধ্বনিছে, হায়,
কে যায় পাখায় করি' ভর !
পাতিয়া কান শোনে সে তান
উড়ে চলে কোন্ নভচর।

মনের আবেগে উড়িতে চায়,
অক্ষম পাখা,—পড়িয়া যায়,
উঠিতে শকতি নাহি তার,
পাখায় আর সহে না ভার,
বেড়ে ওঠে শুধু হাহাকার।

হায় পাখী ! মিছে ভরসা রাখা,
আর কি তোমার হবে গো পাখা ?
হলেও সে,—লাভ নাহি তায় ;
যতই হোক,—নিঠুর লোক—
বারে বারে কেটে দিবে, হায়।

রণমৃত্যু

বীরের মত ম'র্তে পেলে চাইনে কিছু আর,
সব কলঙ্ক ফেলবে ধুয়ে বুকের রক্তধার !
তপ্ত গোলা—বক্ষ 'পরে ধর্ব লুফে তায়,
মুক্ত মাঠে খোলা হাওয়ায় জীবন যেন যায়।
শত্রু যদি হয় সাহসী—হয় সে বীর্যবান—
বীরের মৃত্যু আমায় তবে দেয় সে যেন দান।
স্বদেশ কিবা বিদেশ 'পরে ম'র্তে ক্ষতি নাই,
চাইনে নাম ; বীরের মত ম'র্তে যদি পাই।
মৃত্যুতে মোর যে বংশটির দীপ হবে নির্বাণ,
মৃত্যু স্বীকার,—মর্যাদা তার কর্বনাক ম্লান।
মৃত্যুতে মোর জয়ের ধ্বজা নাই তুলিল শির,
শত্রু মিত্র বলবে তবু 'পতন হ'ল বীর'।

নিশানের মর্যাদা

(নান্‌সান্ যুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত)

প্রভু ! নিশি অবসানে শিশিরের সনে
হয়ত জীবন ফুরাবে প্রাতে,
তবু নিশানের মান রক্ষা করিব,—
দিব না সে ধন শত্রু হাতে ;
কভু ছাড়িব না তাহা ; অন্তিমে তারে
পাগড়ী করিয়া বাঁধিব মাথে।

ক্লান্ত সিপাহী

অজ্ঞাত

চির সহিষ্ণু সাহসী সিপাহী
ক্লান্ত চরণ আজ,

বিশ্রাম তরে আশ্রয় নেছে
নিভৃত সমাধি-মাঝ।
মিথ্যা আজিকে তূর্য-নিনাদ
আর সে দিবে না কান ;
ছাউনি ফেলেছে মরণের ছায়ে,
যাত্রার অবসান !
বালক বয়সে ছেড়ে এসেছিল
গরীব বাপের ঘর,
ভাগ্য ফিরাতে সৈনিক হয়ে
যুঝেছে নিরন্তর ;
দুর্গম দেশে সে দুঃসাহসী
ফিরেছে সর্বদাই,
সম্পদ কিবা না ছিল সহায়
না ছিল বন্ধু ভাই।
দুঃখ বিপদে গ্রাহ্য করেনি
চলেছে গাহিয়া গান,
আজি বিশ্রাম পেয়েছে আরাম
ঘূর্ণার অবসান।
ফাল্গুনী মিঠা পুষ্প ছিটায়ে
আবরিয়া শবাধার,
দুঃখ সুখের দোসরেরা তার,
মুছে আঁখি শতবার ;
কাঁদিয়া বেচারী সেপাহীর নারী
চলিয়াছে ম্রিয়মাণ.
তার সিপাহীর হয়ে গেছে রণ
যাত্রার অবসান !

ক্ষুদ্রগাথা

"ও রাজপুত্র ! ও বন্ধু ! দেখ চেয়ে !"
"ডাকিছ কি সখা শরের আঘাত পেয়ে ?"
"দেখি, দেখি,—বুকে কিসের ও রাঙা দাগ ?"
"ওকি দেখিতেছ ? ছড় গেছে বুঝি ? যাক।"
"ওকি রাজপুত্র ! ফের, ফের এই বেলা,
খাড়া এ পাহাড়, উপরে শত্রু মেলা !"
"পাথরেতে ঠেকে উচোট লেগেছে বুঝি ;
ও সিপাহী লোক ! বন্দুক ধর ! যুঝি !"

হুন সৈন্যেরা চলেছে দর্পভরে ;
রাজার পুত্র,—সহসা আহত শরে,—
কহিল ফুকারি, "হোঠোনা সিপাহী লোক !"
আর কথা নাই,—নিবেছে জীবনালোক

মল্লদেব

(একটি ফরাসী গাথার অনুকরণে)

যুদ্ধে গেছেন মল্লদেব !
ঝনন্-ঝন্ ! ঝনন্-ঝন্ ! ঝন্-ঝনন্ !
কবে ফিরিবেন জানি নে গো,
কবে হবে তাঁর শুভাগমন !

ফিরে আসিবেন ফাল্গুনে,
রণন্-রন্ ! রণন্-রন্ ! রন্-রণন্
সাধের ফাগুয়া-উৎসবে,—
যবে আনন্দে দেশ মগন।

ফাল্গুন এল, ফুরাল গো,
রণ্-রণন্! রণ্-রণন্! রণ্-রণন্!
ফিরে না এলেন মল্লদেব,
না জানি কোথায় হায় সে জন!

রানী উঠিলেন দুর্গেতে;
রণ্-রণন্। রণ্-রণন্! রণ্-রণন্!
দুর্গম সেই দুর্গ-চূড়া,—
পুষ্প-পেলব তাঁর চরণ।

দূরে দেখিলেন সৈনিক!
ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্!
মলিন তাহার মূর্তি গো!
অশ্ব তাহার ধীর গমন।

'ওরে বাছা! ওরে ঘোড়-সওয়ার!
ঝন্-রণন্। ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্!
কোন, সমাচার আনলি তুই?
বল আমায়,—বল এখন।'

'এমনি খবর আমার গো,
ঝন্-ঝনন্! ঝন্-ঝনন্! ঝন্-ঝনন্।
ভরবে জলে ভাসবে গো
প্রফুল্ল ওই দুই নয়ন।

'রঙীন বসন ছাড়বে গো!
ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্! ঝন্-রণন্!
হাতের কাঁকন কাড়বে গো!
ছাড়বে গো সব ভূষণ।

'স্বর্গে গেছেন মল্লদেব ;
ঝনন্-রন্ ! ঝনন্-রন্ ! ঝন্-রণন্
করে এলাম ভস্মশেষ,
চিহ্নমাত্র নাই এখন !—নাই এখন !'

জাতীয় সংগীত

জাপান

অযুত যুগ ধরি' বিরাজো মহারাজ !
রাজ্য হ'ক তব অক্ষয় ;
উপল যতদিন না হয় মহীধর ;—
প্রভূত শৈবালে শোভাময় ।

নবাব ও গোয়ালিনী

গুজরাটি গাথা

শহর ছেড়ে সেপাই নিয়ে গুজরাটের এক গাঁয়,
ছাউনি ফেলে, নবাব সাহেব বেরুলেন সন্ধ্যায় ;
অলিগলির ভিতর দিয়ে চলতে অকস্মাৎ
দেখতে পেয়ে গোপের মেয়ে ধর্তে গেলেন হাত ।
হাত ছিনিয়ে গোপের মেয়ে কটমটিয়ে চায়,—
ঈষৎ হেসে নবাব সাহেব ডেকে বলেন তায়,—
"নবাব আমি, আমার সাথে নগরে তুই চল,
চাষার হাটে রূপের রাশি করিস্ নে নিষ্ফল ।"
"চাষার গ্রামই ভাল আমার, নগরে দিই খাক !"
"নবাবকে তুই জবাব করিস ! বড্ড যে দেমাক ।"
নবাব বলে, "হিঁদুর মেয়ে, শোনরে আমার বোল,
সোনায় দেব অঙ্গ মুড়ে ধুকুড়ি কাঁথা খোল ।"
"লজ্জা ঢেকে ধর্ম রেখে সোনায় মারি লাথি !"

"নবাবকে তুই জবাব করিস ! আঃ রে হারামজাদি !"
"একলা পেয়ে মন্দ বল, স্পর্ধা তোমার বড়,
ন' লাখ আমার গুজরাটি ভাই কর্ব ডেকে জড় ;
মারি চাপড়,—পাগড়ি উড়াই,—লাল করে দিই মুখ ;
নারীর সাথে রঙ্গ করার দেখবে কেমন সুখ ?
হাঁক দিলে মোর ন' লাখ ভায়ে ভাঙবে তোমার জাঁক,
লাঠির গুঁতোয় পথের পাঁকে গুঁজতে হবে নাক ;
নিলাম করে বেচিয়ে দেব নবাবী তাঞ্জাম,
সান্ত্রী সেপাই, ঢাল তলোয়ার, সকল সরঞ্জাম !
টাকা টাকা বেচব টাট্টু,—দামড়িতে দশ উট"—
গতিক দেখে ঘোড়ায় উঠে নবাব দিলেন ছুট !

জন্মভূমি

ভোরোজ্‌মাটি

শ্রদ্ধা রাখিয়ো সারাটি জীবন স্বদেশের গৌরবে,
হেথা যে তোমার হিন্দোলা ছিল, হেথাই সমাধি হবে ;
আকাশের তলে তোরে কোল দিতে আছে আর কোন্ দেশ ?
দুঃখ কি সুখ যা' ঘটুক তোর হেথা আদি হেথা শেষ।

তোদের পূর্ব পুরুষের স্মৃতি লেখা আছে এরি বুকে,
কত বরেণ্য এদেশে ধন্য করিয়াছে যুগে যুগে ;
অর্পাদ্-বীর অর্পণ তোরে করে গেছে এই ভিটা,
'হুনিয়া' ইহার নামটি ক'রেছে দুনিয়ার মাঝে মিঠা।

ম্যাগিয়ার ! নিজ জন্মভূমিতে ভক্তি রাখিয়ো তবে,
আজন্ম সে যে করেছে লালন অন্তে সে কোলে লবে ;
বিপুল জগতে তোরে কোল দিতে আর কোনো দেশ নাই,
মরণ-বাঁচন এইখানে তোর দুখ-সুখ এই ঠাঁই।

ফৌজদার

ওয়ারেন হেস্টিংস

বিরক্ত বিব্রত ফৌজদার
আরামের আরাধনা করে,
দুরন্ত গরম যবে, আর,
কাছারিতে লোক নাহি ধরে .
শুনিতে শুনিতে মকদ্দমা
পদে পদে সন্দেহ কেবলি,
রাশি রাশি মিথ্যা হয়ে জমা
আসামীরে ফেলে শেষে দলি' !
আরামের লাগি ফেলে শ্বাস,
'আলো দাও' বলি চাঁদে ডাকে,—
'ডাকাতে না শান্তি করে নাশ,
চোর যেন কানাচে না থাকে।'
এত খাটে, এত ভেবে মরে,
তবু তার না পূরে আশয়,
চোরেরা তবুও চুরি করে,
নালিশের শেষ নাহি হয় !
কত মতলব হয় মাটি
কত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়,
'দশের হিতের তরে খাটি'
এই ভেবে সব স'য়ে যায়।
বিরক্ত বিব্রত কেন তবে ?
অক্ষত শান্তির কেন আশা ?
শান্তি লাগি যুদ্ধ হেথা হবে,
পৃথিবী যে মানুষের বাসা !

তৈমুর-স্মরণ

(তাতার ও তিব্বতবাসী মোগলদিগের মধ্যে প্রচলিত)

শিবিরে মোদের দৈব-পুরুষ
তৈমুর ছিল যবে,
মোগল জাতির বীর্য তখন
বিখ্যাত ছিল ভবে ;
ধরণী সে হ'ত নিজে অবনত
মোগলের পদভরে,
শুধু কটাক্ষে লক্ষটা জাতি
কাঁপিয়া মরিত ডরে !
তৈমুর ! অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায় ?
এস, ফিরে এস দৈব-পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায় ।
মোগল আজিকে শান্ত হয়েছে,—
নিরীহ গড্ডলিকা,
নিরালয় মাঠ আলয় যাদের
হৃদয়ে বহ্নিশিখা !
কই গো তেমন শিরদার কই ?
কোথা সেই সর্দার ?
মোগলে যেজন রণপণ্ডিত
করিবে পুনর্বার !
তৈমুর ! অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায় ?
এস, ফিরে এস দৈব-পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায় ।
মোগলের ছেলে বন্য ঘোড়ায়
বাহুবলে বশে আনে,

দৃষ্টি তাহার মরু-বালুকায়
লিখন পড়িতে জানে !
তবু সে দৃষ্টি ব্যর্থ এখন
মিছা কাজে আছে ভুলি' ;
বৃথা বাহুবল,—বাঁকাতে পারে না
পৈতৃক ধনুগুলি ।
তৈমুর ! অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায় ?
এস, ফিরে এস দৈব-পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায় ।

দৈব-পুরুষ তৈমুর পদে
আমরা নোয়াই শির ;
সবুজ চায়ের পাতা দিই তাঁরে
পালিত মেষের ক্ষীর ।
হৃদয়ে মোদের তৈমুর-কথা
যুগে যুগে জাগরূক,
উৎসাহ ভরে উদ্যত বাহু
মোগল সমুৎসুক ।
লামা আমাদের মন্ত্র পড়ুন,
করুন আশীর্বাদ,
সড়কি ও শর হবে খরতর,
পূর্ণ হইবে সাধ ।
তৈমুর অবিলম্বে তুমি কি
লবে না নূতন কায় ?
এস, ফিরে এস দৈব-পুরুষ
রয়েছি প্রতীক্ষায় ।

স্বদেশ

লাওয়েল

সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ কোথা ? কোথায় গো তার দেশ ?
যেখানে তার জন্ম ঘটে ?—সীমার মাঝে শেষ ?
চিহ্ন-করা গণ্ডী-ঘেরা ক্ষুদ্র সীমার মাঝে
কখনো বসতে পারে ?—পরান কভু বাঁচে ?
তাই তো ! তবে ?···সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হবে ঠিক
নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দিক !

যে দেশেতে অব্যাহত স্বাধীনতার তান ?
মানুষ যেথায় মানুষ এবং মান্য ভগবান ?
সাঁচ্চা লোকের সেই কি স্বদেশ ? প্রবাসী আত্মার
আরো বিশাল ক্ষেত্র কি গো হয় নাকো দরকার ?
তাই তো ! তবে ?···সাঁচ্চা লোকের স্বদেশ হবে ঠিক
নীল আকাশের মতন বিশাল, মুক্ত চতুর্দিক !
যেথায় যেথায় পরছে ওগো মানুষ বারংবার,
দুঃখ শোকের শিকল বেড়ী, সুখের পুষ্পহার ;—
আত্মা হেথায় তপশ্চরণ করে নিরন্তর
সত্য ও সুন্দরের দিকে হচ্ছে অগ্রসর,—
সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেইখানেতেই ঠিক,
জগৎ-জোড়া স্বদেশ তাহার মুক্ত চতুর্দিক।
একটিও হায়, মানুষ যেথায় কাঁদছে সকাতরে,
মোদের স্বদেশ সেই যেন হয় ভগবানের বরে ;
যেখানটিতে একখানি হাত মুছায় দুটি চোখ
জগৎ মাঝে সেইটুকু ঠাঁই তোমার আমার হোক ;
সাঁচ্চা লোকের জন্মভূমি সেখানটিতেই ঠিক,
বিশ্বজোড়া বিশাল স্বদেশ মুক্ত চতুর্দিক।

বিপদের দিনে

রুমি

বিপদের দিন হ'স্ নে রে মন হ'স্ নেকো ম্রিয়মাণ,
হাসিমুখে থাক তোর সে ভাবনা ভাবিছেন ভগবান ;
গোলাপে ছিঁড়িয়া কেহ কি পেরেছে হাসি তার কেড়ে নিতে ?
ধূলায় প'ড়েও হাসি ফোটে তার পাপড়িতে পাপড়িতে !

পিতৃপীঠ

ক্রিষ্টিনা রসেটি

ওগো কোথা সেই দেশ, কেমন সে দেশ
কে মোরে বলিবে তাহা ?
মোর পরানের চেয়ে প্রিয় সে, তবুও
চক্ষে দেখিনি, আহা !
তবু সে আমার দেশ, আমারি স্বদেশ,
না জানি দেখিব কবে !
কবে মন্দার-হরিচন্দন-বীথি
নয়নে উদয় হবে !
হেথা যত অনশন-ক্লিষ্ট বামন
মিলিয়াছে একঠাঁই,
হায় ক্ষুদ্রতা আর ক্ষুধা তৃষ্ণার
অবসান হেথা নাই !
হেথা মৃত্যু ফিরিছে দুয়ারে দুয়ারে,—
রাজা প্রজা কাঁপে ত্রাসে ;
ওগো নৃত্য-শালায় নূপুরের ধ্বনি
বারে বারে থেমে আসে !
হেথা রানী কেবা ? হায় ! দাসী কে হেথায়
মরণ-অধীন সব !

হায় ধূলি-শয্যায় এক হয়ে যায়
হাসি-রোদনের রব !
হায় অতুলন রূপ হয় অগোচর,
কুরূপের (ও) মুখ ঢাকে,
ওগো জলের লেখার মতন লুকায়
চিহ্ন কিছু না থাকে !
হায় আলোক হইতে পুলক হইতে
মলিন ধূলির তলে,
এই উষ্ণ শোণিত হিম হয়ে যায়
ধমনীতে নাহি চলে !
হায় এমনি করিয়া লুকায় যেন সে
ছিল না মর্ত্য-লোকে ;
ওগো সবারি দৃষ্টি এড়ায় মানুষ,—
ভগবান ব্যতিরেকে ।
সেই শ্রীপদে যে চির-জীবন-নির্ঝর,
এ তো শুধু ফুৎকার,—
শুধু ক্ষণিকের মায়া,—মরণের ছায়া,—
স্বপনের সঞ্চার ।
ওগো, নিখিল শরণ, শঙ্কা হরণ
সেই শ্রীচরণ চুমি'
আছে ছায়ার মায়ার মরণের পারে
আমার জন্মভূমি ।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

টেনিসন

ভবিষ্যতের তিমির-গর্ভে দেখিলাম ডুব দিয়ে
চর্ম-চোখেতে বিশ্বলোকের স্বপ্ন দেখিনু কি এ

দেখিনু আকাশ ভরিয়া উঠিল বণিকের ব্যোমযানে,
রাঙা গোধূলির নাবিকেরা মণি বোঝাই করিয়া আনে।
ঘোর হুংকার শুনিনু গগনে, বীভৎস হিম পড়ে,
ব্যোম-পথে ব্যোম-বাহিনী লইয়া লক্ষ জাতিতে লড়ে।

সহসা বহিল দখিনা বাতাস ঝঞ্ঝার মাঝখানে,
'সাধারণী ধ্বজা তুলিয়াছে শির' কহিল কে কানে কানে!
'স্পন্দরহিত রণদুন্দুভি হবে ওগো এইবারে,
বিশ্বমানব মিলিবে আসিয়া জগৎ-সন্তাগারে;
দশের সহজ বুদ্ধি মিলিয়া শাসিবে পালিবে ধরা,
সার্বজনীন বিধানে ধরণী প্রশান্ত হবে ত্বরা।'

বিচিত্রকর্মা

রুমি

কাঁটা গুল্মে যে গুলাব ফুটাতে পারে,
শীতের বাতাসে ছুটায় যে দক্ষিণে,
তার অসাধ্য কিছু নাই সংসারে,
হরষের হাসি ফুটাবে সে দুর্দিনে।

শুক্ল নিশীথে

রুমি

শুক্লা যামিনী প্রসন্ন হ'ল
লভিয়া তোমার জ্যোতি,
দেহ-নিরুদ্ধ আত্মারে তাই
দিল সে অব্যাহতি;
ছিঁড়িল শিকল হ'ল সে উজল
স্ফটিক মালার মত!

প্রভু ভৃত্যের ভেদ ঘুচে গেল,
ভুবন স্বপ্নহত
বন্দী ভুলিল বন্ধন, রাজা
রাজ্য ভুলিল ঘুমে
পুণ্য যামিনী সাম্য আনিল
বিষম মর্ত্য ভূমে !

অলক্ষ্যে

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ

অলক্ষ্যে অচেনা লোক আসে প্রতি ঘরে,
অচেনার মাঝখানে কত খেলা করে !
অলক্ষ্যে চলিয়া যায় শেষে একদিন,
শূন্য নীড় পড়ে থাকে দেহ প্রাণহীন।

পল্লব

আর্ণৎ

'বোঁটার বাঁধন টুটে
কোথা চলেছিস ছুটে ?
ওরে ও শুষ্ক পাতা ?'
হায় আমি জানি না তা' !
ছিনু যে বটের শাখে
ঝড় লেগেছিল তাকে,
সে অবধি মোরে, হায়,
বাতাস ফিরায় পায় ;—
দখিনে ও উত্তরে,
বনে ও বনান্তরে ;
মাঠে, পাহাড়ের কোলে,—
অস্থির করে তোলে !

আমি চলি সেইখানে
বাতাস যে দিকে টানে ;
শঙ্কায় নাহি মরি,
অনুযোগ নাহি করি।
আমি চলি সেই দেশে,
যেখানে সকলি মেশে,—
রাঙা গোলাপের দল,—
'লরেল' সুশ্যামল !

স্মৃতি

মাদাম দুদেতোৎ

যৌবন আমি ভালবাসিতাম
সুখাবেশে সুমধুর,
হউক ক্ষুদ্র তবু সে পাত্র
প্রেমে শুধু পরিপূর !
হ'লাম সেয়ানা হ'ল বিবেচনা,
গেল নাবালক নাম,
আমার বুদ্ধি কহিল আমারে,—
'ভালবেসো অবিরাম।'
তারপর চলি' গেল যৌবন,
উড়িয়া পলাল সুখ ;
তবু ভাল আজো আছে যে জাগিয়া
মনে আনন্দটুক ;
সে শুধু এখনো ভালবাসি ব'লে,—
খুশি আছি ভালবেসে ;
প্রেমের অভাব পুরাইতে কিছু
নাই মানুষের দেশে।

দুর্বোধ

এখনো দুর্বোধ !
জীবন কেটেছে এক সাথে,
দুঃখে সুখে, বসন্তে বর্ষাতে,
একই ঘরে গেছে দিনরাত,
বিবাহে মিলেছে হাতে হাত,
কত লীলা, কত খেলা, কত সে প্রমোদ ;
তবু হায়, তবুও দুর্বোধ !

এখনো দুর্বোধ !
শৈশবের স্মৃতি মমতার,
প্রশংসা, সস্নেহ তিরস্কার,
ভুল করা, উপদেশ পাওয়া,
দেশে দেশে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ;
বিমুখ, বিরূপ শেষে—হয়তো বিরোধ
পরস্পর, এমনি দুর্বোধ !

তবুও দুর্বোধ !
একই কাজে এক যোগে থেকে,
পরস্পরে 'মিতা' বলে ডেকে,
দ্বন্দ্ব করে, বুকে টেনে নিয়ে,
অকুণ্ঠিতে প্রাণ খুলে দিয়ে,
আঁখি আড়ে ছাড়াছাড়ি শেষে জন্মশোধ ;
দেখা হলে তখন দুর্বোধ !

তবুও হয় না পরিচয় !
মানুষ কি একান্ত একাকী,—
ভাবি আর স্তব্ধ হয়ে থাকি !

জনে জনে গণ্ডী দিয়ে দিয়ে,
প্রকৃতি গো রেখেছ ঘিরিয়ে ;
গণ্ডী শুধু গণ্ডী ছোঁয়, মিলন না হয় ,
হয় না যথার্থ পরিচয়।

নস্য

লাতাঞ্জা

আমার ডিবায় নস্য আছে ভারী চমৎকার !
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।
যা' আছে তা' আমার আছে দিচ্ছি নে তা' অন্যে,
এমন নস্য হয়নি তোদের বোঁচা নাকের জন্যে ।
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমার ;
তুমি বাপু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।

মরুব্বিদের মুখে শোনা অনেক দিনের গান,
আধখানা তার শুনেছিলাম শিখেওছি আধখান ;
সে যা' হোক্, ঐ গানটা শুনে হ'ল কেমন জেদ,
নস্য আমার নিতেই হবে, রাখবনাকো খেদ ।
নস্যদানে নস্য আছে ভারী চমৎকার,
তুমি কিন্তু পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার

এক যে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র—অনেক টাকার মালিক,
বাড়ির দ্বারে সিংহ তাঁহার গাড়ির দ্বারে শালিক !
তিনি আপন কনিষ্ঠকে বলেন ডেকে, "ভায়া !
কমণ্ডলু নাও গে, দেখ সংসার শুধুই মায়া ;
নস্যদানে নস্য আছে কিন্তু সে আমার,
তুমি ভায়া পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার ।"

এক মহাজন,—লোকটি পাকা, অর্থাৎ ঝুনো বেজায়,
ঋণ দিলেন এক নায়গ্রস্তে অহৈতুকী কৃপায় !

সুদের সুদটি শুষে নিয়ে বেচে ভিটেমাটি,
ঋণীজনকে শুনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাঁটী,—
"ডিবার মধ্যে নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি বাপু পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

আছেন কত গৃধ্র, উকিল, শকুন ব্যারিস্টার,
বুদ্ধি যোগান নির্বোধেদের দয়ার অবতার ;—
ফন্দী করে খসিয়ে টাকা শূন্য করে থলি
মক্কেল বিদায় করেন তাঁরা এই কথাটি বলি,
"ডিবার মধ্যে নস্য আছে ভারী চমৎকার,
তুমি এখন পাচ্ছ না আর একটি কণাও তার।"

হীরার কণ্ঠি গলায় দিয়ে নাচঘরে যান ক্ষেত্রী,
কণ্ঠিতে তাঁর নেত্র দিলেন একটি অভিনেত্রী ;
ক্ষেত্রী কৃপণ মুখ বাঁকিয়ে বল্লে, "সোহাগ থাক্,
না হয় তোমার পদ্মচক্ষু, বাঁশীর মতন নাক,
দেখছ, ডিবায় নস্য আছে, কিন্তু সে আমার,
তুমি ডিয়ার! পাচ্ছ নাকো একটি কণাও তার

অভেদ

কপিলর

আমরা সবাই ভাই,
ধরণীর কোলে জন্ম নিয়েছি স্তন্য তাহারি খাই ;
কিবা সে শূদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ,
সবারি সমান জন্ম মরণ,
এক মনোপ্রাণ, এক ভগবান, কোনোখানে ভেদ নাই।
কর্মের ফলে কেউ বা ভিখারী,
কেউ ধনবান, কেউ বা মাঝারি
বড় যারে দেখ সে শুধু মঞ্চে দাঁড়ায়েছে উঠে তাই।

বৃষ্টি বাতাস—নিতি এই দুয়ে
ব্রাহ্মণে ছোঁয় চণ্ডালে ছুঁয়ে !
সকলেরি সাথে কোলাকুলি করে জোছনা সর্বদাই।

আমরা সবাই ভাই !
কেউ কালো, কেউ গোউর বরণ,
লম্বা ও খাটো—সব খাঁটি মন,
দুধ সেই শাদা—কালো হোক্ চাই ধলোই হউক্ গাই ;
আমরা সবাই ভাই !

জীবন

নিগ্রো ডান্‌বার

খাবার জন্যে একমুঠো ভাত, শোবার জন্যে একটি কোণ,
কাঁদতে পুরো একটা বেলা, হাসতে মোটে একটু ক্ষণ ;
আনন্দ সে দু'এক পোয়া, দুঃখ কষ্ট দু'এক মণ,
ফুর্তি যত দ্বিগুণ তাহার মৌন বিষাদ-বিলপন ;
এই জীবন !

একটি কোণ আর একমুঠো ভাত—প্রেম থাকে তো রাজ্যধন,
কান্না তখন স্বস্তি আনে, একটু হাসিই জুড়ায় মন ;
ফুর্তি তখন দ্বিগুণ মিঠে ; দুর্ভাবনা কতক্ষণ ?
হাসির কাচে আর্শী রচে পারার মতন উদ্বেজন ;
এই জীবন।

করুণার দান

নিগ্রো ডান্‌বার

বড় ভাল বেসেছিনু, ওরে !
বেসেছিনু দীর্ঘ দিন ধ'রে,—
করুণায় তাই ভগবান
কণ্ঠে মোর দিয়েছেন গান।

বিফলে বেসেছি ভাল ব'লে—
কণ্ঠে সুর টুটে পলে পলে,—
করুণায় তাই ভগবান
মৃত্যু মোরে করিছেন দান।

'কা বার্তা'

বদ্‌লেয়ার

জগৎ ঘুরিয়া দেখিনু সকল ঠাঁই,
বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে বিশ্ব, পাপের অন্ত নাই!
অতি নির্বোধ, অতি গর্বিত নারী সে গর্ভদাসী,
ভালবেসে তার শ্রান্তি না হয় পূজিতে না আসে হাসি!
লালসা-লোলুপ পুরুষ পেটুক, কঠোর, স্বার্থপর,
বাঁদীর বান্দা, নরকের ধারা, পঙ্কে তাহার ঘর।
উচ্ছ্বসি' কাঁদে বলি পশুগুলা, কসায়ের বাড়ে খেলা,
শোণিত-গন্ধী হয় উৎসব যত পড়ে আসে বেলা।
নিষ্ঠা আচারে পাগলামি-পূজা করিছে কতই ভেড়া,
ছুটিতে গেলেই নিয়তি নীরবে উঁচু করে দেন বেড়া;
শেষে ঢেকে দেন অগাধ আফিমে, সংজ্ঞা থাকে না আর,
এই তো মোদের সারা জগতের সনাতন সমাচার!

হে প্রিয় মরণ! প্রাচীন নাবিক! নৌকা আন হে তীরে;
দুর্বহ মোর হয়েছে জীবন, লও তুলে লও ধীরে।
অজানা অতলে ঝাঁপ দিব আমি, প্রাণ যে নূতন চায়,
স্বর্গ সে হোক্ অথবা নরক, তাহে কিবা আসে যায়?

খোয়ানো ও খোঁজা

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ

আপন মায়ের খোঁজে গেছে মা আমার,
তার আগে তার মার (ও) অমনি ব্যাপার !
জগৎ সমান ভাবে চলিয়াছে সোজা,
চলেছে সমান ভাবে খোয়ানো ও খোঁজা !

প্রহরায়

হাইন

প্রহরায় দোঁহে জেগে বসে আছি,-
আমি আর সংশয়,
ঝড়ের রাত্রে হয়ে কাছাকাছি—
আমি আর সংশয়।
মগ্ন-গিরির শঙ্কা করিয়া
তাকাই অন্ধকারে,
ঢেউ চলে যায় তরী লঙ্ঘিয়া
ভরে বুক হাহাকারে।

নৌকায় দোঁহে পায়চারি করি
আমি আর প্রত্যয়,
ঘনঘটা মাঝে মোরা দোঁহে হেরি
অকূলে অরুণোদয় !
পুবের ঝরোখা খুলি' যেথা উষা
উঁকি দেয় শেষ রাতে,—
সংশয় আর প্রত্যয় যেথা
অভেদ আমার সাথে !

তিনটি কথা

শিলার

মানুষের মনে আমি সযতনে
লিখে যাব তিন-বাণী,
অগ্নি আখরে পরানের 'পরে
অমর এ লিপিখানি ;—
আশা রেখো মনে, দুর্দিনে কভু
নিরাশ হয়ো না, ভাই,
কোনোদিন যাহা পোহাবে না, হায়,
তেমন রাত্রি নাই।
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে,
হয়ো না গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক, তিনিই
চালান চন্দ্র তারা।
রেখো ভালবাসা সবারি লাগিয়া,
ভাই জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মতো প্রভা দান কোরো
জনে, জনে, ঘরে, ঘরে।
মনে রেখ এই ছোট ক'টি কথা,—
'আশা', 'প্রেম', 'বিশ্বাস'
আঁধারে জ্যোতির দরশন পাবে,
পাবে বল, যাবে ত্রাস।

বিদায়

ভলটেয়ার

বিদায় যে দেশে গেলে ফেরে নাকো আর
এবার আমারে যেতে হবে সেই দেশে ;
জন্মের মতো বন্ধুরা আমার,—
যদিও তাহাতে কারো যাবেনাকো এসে।

তোমরা হাসিবে বটে শত্রুরা আমার,
এ চির প্রয়াণ-বার্তা,—অতি সাধারণ ;
সবারে জানিতে তবু হবে এর স্বাদ
একদিন ; ওগো মিত্র ওগো শত্রুগণ !

একদিন অন্ধ-করা অন্ধকার তীরে
দাঁড়ায়ে আপন কর্ম স্মরিবে যখন,
কখনো দহিবে ক্ষোভে, কভু অসন্তোষে,
পরম কৌতুকে হেসে উঠিবে কখন।

সংসারের রঙ্গগৃহে যখনি যে জন
অভিনয় সাঙ্গ করি' চ'লে যেতে চায়,—
উল্লাস-অবজ্ঞা-ভরা বিপুল গর্জন
একবার ফিরাইয়া আনিবেই তায়।

মানুষ দেখেছি ঢের এ দীর্ঘ জীবনে,
দেখেছি অনেকে আমি অন্তিম শয্যায় ;—
বৃদ্ধ বিপ্র, বৃদ্ধ বেশ্যা, বৃদ্ধ বিচারক,—
সবারি সমান দশা মৃত্যু যাতনায়।

মিথ্যা প্রায়শ্চিত্ত আর মিথ্যা চান্দ্রায়ণ,
মিথ্যা গঙ্গাযাত্রা, মিছে মৃদঙ্গের রোল,
সফরে চলেছে ওই আত্মারাম বুড়া,—
তার লাগি মিছে অশ্রু, মিছে 'হরিবোল'।

হাসে শয়তানী হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভুল ধরি' পরিহাস করে ;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন,—
তাও লোকে ভুলে যায় দিন দুই পরে !

হায়! ক্ষুদ্র পতঙ্গিকা! ক্ষণিকের জীব!
অদৃশ্য সূতায় বাঁধা রঙীন পুতুল!
নির্বাণের করতলে ঘাড়-নাড়া বুড়া!
কি তোরা? কোথায় যাস্?—চেয়ে জুলজুল!

আজ আমি দাঁড়াইয়া যেই সন্ধিস্থলে,
কে পারে দাঁড়াতে হেথা অব্যাকুল মনে?
যে জানে ভয়ের কিছু নাহি পৃথ্বীতলে,
জীবনে যে খ্যাতিহীন, অজ্ঞাত মরণে।

বেদনার আশ্বাস

রুমি

বেদনার মাঝে ওগো আছে
সীমাহীন আশ্বাস,
কঠিন তালের আঁঠিতে লুকানো
রয়েছে কোমল শাঁস!

মরণ

(মিশর)

মরণ,—জ্বরের দাহ অবসানে
মুক্ত বাতাসে যাওয়া;
নিখিল ব্যাধির ঔষধ সে যে
দৈবে শিয়রে পাওয়া!
মরণ,—সুরভি পূজা ভবনের
ধূপের অন্ধকার,
বাত্যা-তাড়িত তরীতে নিদ্রা,—
লেশ নাই সংজ্ঞার।
সে যে কমলের গূঢ় পরিমল,—
সীমার প্রাপ্তি ভূমা!

মহা নির্ঝরের বর্ত্ম মরণ,—
অনাদি কালের চুমা !
যুদ্ধের শেষে নৌ-সেনানীর
ফিরে যাওয়া নিজ দেশে,
আকাশ নীলের বিমল বিকাশ
ঘোর ঝঞ্ঝার শেষে ;
বন্দী জনের কামনার নিধি
মরণেরে মনে হয়,
বহু বরষের কারা-ক্লেশে যার
জীবন দুঃখময় ।
সেই তো দেবতা দেহ-অবসানে
যে গেছে মৃত্যু-লোকে,
মোচন করিয়া দূরে ফেলে দেছে
শোচনার নির্মোকে ;
সূর্যের কাছে সুখে বসে আছে
সূর্যেরি নৌকায়,
তর্পণ কালে দেবতার সাথে
বলি-উপহার পায় ;
মৃত্যুরে পেয়ে পায় গো না চেয়ে
জ্ঞানীর অধিক জ্ঞান,
জীবিতে যা' রবি না দেন কখনো
মৃতজনে তাহা দেন ।

মায়া

রুমি

প্রেমিক মরেছে, মরে গেছে প্রিয়া তার
তাদের প্রেমের চিহ্নটি নাই আর !

ওগো ভগবান্ ! একি অপরূপ মেলা !
ছায়ায় ছায়ায় ভালবাসাবাসি খেলা !
মন যাহা নহে তাই হ'ল উন্মনা,
এ লীলা বুঝিবে বুঝাইবে কোন্ জনা !

নশ্বর

(প্রাচীন মিশর)

আপনি আপন সমাধি-ভবন নিরমিল যারা
রাখিতে দেহ,
আজি তাহাদের সে দেহ কোথায় ? চিহ্ন খুঁজিয়া
পায় না কেহ !
কোথা তাহাদের কীর্তি-কাহিনী ? আজি কোন্ জন
জানে বা তাহা ?
কত শ্লোক আজ মুখে মুখে ফিরে, কার সে রচনা
জানি নে, আহা !
ভেঙেছে প্রাচীর রাজ-সমাধির, হায় এস্তেফ !
হায় গো প্রভু !
ভিত্তি তাহার খুঁজে পাওয়া ভার, যেন সে ছিল না,—
হয়নি কভু ।

ত্রিশ্লোকী

সুইন্‌বার্ন

অসীম ব্যোমেরে সূর্য কি কথা বলে ?
সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে ?
কোন্ কথা চাঁদ বলে চুপে রাত্রিরে ?
কোন্ জন তাহা জানে ?

ভ্রমর কি ভাবে হেরিয়া কুসুমদলে ?
কি ভাবে গো পাখী নিরখি' নীড়ের পানে ?
রৌদ্র কি ভাবে মেঘ দলে চিত্রি' রে—
কোন্ জন তাহা জানে ?

গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
কোন্ সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
অতল কি গান শোনায় হিমাদ্রিরে ?
কে জানে এ তিন গানে ?

ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন, শেষে,
তাহার জন্মদিনে ;

উষার পুলক দিনের প্রকাশ হেরে,
দিনের পুলক বিকশি' মধ্যদিনে,
গানের পুলক ফেটে গিয়ে নিঃশ্বাসে
বেসুর করিয়া বীণে ;

কে জানে ? কে বুঝে মরণ রহস্যেরে ?
কে জানে চাঁদের ক্ষয়, উপচয়, ঋণে ?
মানুষের মাঝে নাই কারো হিসাবে সে ;
মৃত্যু জানাবে তিনে !

প্রবল ঢেউয়ের কিনারার প্রতি টান,
কিনারার টান ভগ্ন ঢেউয়ের দিকে !
আকাশ-বিদারী জ্বালাময় ভালবাসা,—
জাগে যে বজ্রশিখে,—

যাবে না সে বোঝা, যতদিন আছে প্রাণ !
ধ্রুবতারা করি' মরণের দু' আঁখিকে
যে অবধি জয়ি' না যায় প্রাণের বাসা,—
চেয়ে চেয়ে অনিমিখে ;

একটি নিমেষে সমস্যা সমাধান
যতদিন নাহি হয় গো, দিগ্বিদিকে
উষার মতন হাসিতে ফুটায়ে আশা
অথবা দ্বিগুণ ম্লান করি' গোধূলিকে।

অভিমান

জাফর

ভাল হ'ত যদি প্রভু কিঙ্কর কিছু না হতাম আমি,
ভাল হ'ত যদি জগতের মাঝে জন্ম না হ'ত, স্বামী।
ধূলাই যখন হলাম হে প্রভু ! না হয়ে রূপা কি সোনা,—
ভাল হ'ত হলে মরুর বালুকা যেথা নাই আনাগোনা।
ফুটে উঠিলাম তবু ও যখন না হলাম শতদল,—
ভাল হ'ত হলে গিরি-শৈবাল অখ্যাত নিষ্ফল।
জীবের মধ্যে গণ্য হলাম,—না হলাম বুলবুল !
ভাল হ'ত যদি জন্ম নিতাম যে দেশে ফোটে না ফুল।
মানুষ হইয়া হ'ল না যখন মানুষের মতো মন,
ভাল হ'ত যদি হয়ে জড়মতি রহিতাম আমরণ।
তা'হলে যাতনা সহিতে হ'ত না কামনা দিত না ফাঁসি,
বড় ভাল হ'ত অজানা রহিত এই ভালবাসাবাসি।
মরণ এখন শরণ আমার, জীবনের পথে কাঁটা,
জাফর কহিছে, বড় ভাল হয়—হয়ে গেলে নাম-কাটা।

চির বিচিত্র

জামি

জগতের এই নহবৎ-ঘরে বাদ্যকরের দলে,
জনম-নাকাড়া বাজাতে বারেক একে একে সবে চলে
নিত্য প্রভাতে নূতন সত্য জেগে ওঠে অভিরাম,
গৌরব-ঘটা ঘিরি' লয়ে চলে নূতন নূতন নাম !
সংসার যদি সমানে চলিত একটানা এক ঘেয়ে,
কত না তত্ত্ব গুমরি মরিত প্রকাশের পথ চেয়ে ;
তপনের ছটা যদি না ফুরাত ফুরালে দিনের নাট,
তা' হলে কি কভু ফুটিত প্রদোষে ফুল্ল তারার হাট ?
শিশিরের যদি অন্ত না হ'ত, তবে বনে উপবনে
গোলাপের কাল আঁখি কি মেলিত ফাগুনের চুম্বনে !

জিজ্ঞাসা

(বাস্থটোল্যাণ্ড)

কে ছুঁয়েছে দু'টি হাতে আকাশের তারা ?
শূন্যে চাঁদ কে রেখেছে ধ'রে ?
কেন ছুটে নদী নদ অবিরল ধারা ?—
শ্রান্ত হলে জুড়াইতে যায় কার ঘরে ?
ভেসে ভেসে আসে মেঘ, ভেসে চলে যায়,
তার দেশ কোথায় ? কে জানে !
কে বরিষে বৃষ্টি ধারা ? সেকি ওঝা ? হায়,
তারে কভু দেখিনি তো উঠিতে বিমানে !

বিগ্রহ

আর্নো হোল্‌জ

নিশীথে আমার এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
ধাতুময় সপ্ত ধেনু জাগে,
বিচিত্র পাষাণ-দীপ জ্বলে সারারাত
মিট মিট মিট লাখে লাখে !

আমি লীলা-ভরে,
গভীর মন্দির গর্ভে বসি গুপ্ত ঘরে,
রত্ন-বেদী 'পরে।

চন্দনের কড়িকাঠ সারি, সারি, সারি,
সারারাত চেয়ে চেয়ে দেখি ;
বসে থাকে তারাগুলি ঘুলঘুলি জুড়ে,
মিট মিট মিট করে আঁখি।

আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠি একবার !—
গুঁড়া হয়ে পড়ে যাবে ছাদ ;
ভিম্বাকার হীরকের তৃতীয় নয়ন
ঠেকে ভেঙে ফেটে যাবে চাঁদ।

উঠিব না,—থাক্ !
স্থূলোদর পূজারীরা ডাকাইয়া নাক
নিশ্চিন্তে ঘুমাক্ !

যোগাসনে তার চেয়ে বসে এক মনে
নিজের নাভিটি ধ্যান করি ;
পদ্মরাগ-বিমণ্ডিত নাভিপদ্ম আহা !
কিবা শোভা ! কিবা কারিগরি !

মহাদেব

আল্‌ফ্রেডলায়াল্‌

আমি জলন্ত, আমি জীবন্ত, আমি দেখা দিই
অগ্নিরূপে,
পঞ্চভূতেরে নিত্য নূতন মুখোস পরাই
আমিই চুপে !

আমি মহাকাল, আমিই মরণ, আমি কামনার
বহ্নিজ্বালা,
সৃষ্টি-লয়ের ঘূর্ণিবাতাসে ছিঁড়ি গাঁথি গ্রহ-
তারার মালা।
আমি জগতের জনমের হেতু, আমি বিচিত্র
অস্থিলতা,
বাহির দেউলে কামের মেখলা ভিতরে শান্ত
আমি দেবতা!
আমি ভৈরব, আমি আনন্দ, আমিই বিঘ্ন,
আমিই শিব,
হৃৎপিণ্ডের শোণিত-প্রবাহ নিয়মিত করি'
বাঁচাই জীব।
পরশে চেতনা এনে দিই জড়ে, পুনঃ কটাক্ষে
ধ্বংস করি,
নিঃশ্বাসে আর প্রশ্বাসে মম জীবন-মরণ
পড়িছে ঝরি'!
জন্ম-তোরণে মৃত্যু-মূরতি আমি প্রবৃত্তি
সকল কাজে,
এ মহা দ্বন্দ্ব, ইহা আনন্দ, আমারি ডমরু
ইহাতে বাজে।

ধর্ম্ম

ডান্‌বার

শাস্ত্রের প্রদীপ নহি, নহি আমি ধর্ম্মের নিশান,
সিদ্ধ মহাপুরুষের সিদ্ধির অপূর্ব অবদান
তুচ্ছ মানি,—সাধারণ দুঃখ কাহিনীর তুলনায়;
মানুষের অশ্রুজলে, মানুষের মৌন শোচনায়

আমারে আকুল করে,—মানুষের প্রার্থনায় চেয়ে।
পুণ্যাত্মা! নালিশ রাখ, নীলাকাশ ফেলিয়ো না ছেয়ে
নাকী সুরে। এই কিহে ভক্ত তুমি? ঈশ্বর নির্ভর
এরি নাম? এরি অহংকার কর ধার্মিক প্রবর?
মন্দির-কন্দর ছাড়ি' এস বন্ধু! এস বাহিরিয়া,
স্বর্গের কামনা ভোলো! প্রব্যথিত মানবের হিয়া
তোমারে খুঁজিছে, ওগো! এস, এস মানুষের মাঝে,
নরলোকে আছে কাজ; স্বর্গে তুমি লাগিবে কি কাজে?
মমতার চক্ষে চাও, দুর্বলেরে তোলো হাত ধ'রে,
স্বর্গ পাবে মর্ত্যে বসি',—পুণ্যফলে, দেবতার বরে।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত

লী হাণ্ট

মিঞা আবু বিন্ আদম,—(তাঁহার বংশ বিশাল হোক,)
নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন ঘরে উছলে চন্দ্রালোক!
রূপে উদ্ভাসি' জোছনার রাশি পদ্মফুলের মত,—
দেবদূত এক,—সোনালী পুঁথিতে লিখিতে আছেন রত;
চিত্তে মিঞার ছিল না বিকার, তাই সাহসের ভরে
সুধালেন তিনি, "কি লিখ আপনি পুঁথির পাতার 'পরে?"
আঁখি তুলি' ধীরে স্বপন-মূরতি কানে কহিলেন তার,
"বিশ্বরাজারে যারা ভালবাসে নাম লিখি তা' সবার!"
"আমার নাম কি লিখেছেন?" আবু সুধালেন মৃদুভাষে,
"লিখি নাই", শুধু কহি সংক্ষেপে দেবতার দূত হাসে!
বিনয় বচনে কহিলেন আবু, "লিখো তবে অন্তত;—
আবু ভালবাসে সর্বভূতেরে ঠিক আপনারি মত।"
কি লিখি পুঁথিতে অলখিতে হায় দেবতা গেলেন চলি',
পর দিন রাতে এলেন বিভাতে ভুবন সমুজ্জ্বলি',
সোনালী পুঁথিটি খুলি ধরিলেন আবুর আঁখির আগে,
নিখিল ভকত জনের শীর্ষে আবুর নামটি জাগে।

আদর্শ যাত্রী

সেন

বিশ্বাস তোমার দণ্ড হে যাত্রী নির্ভীক !
নির্দ্বন্দ্ব সে কমণ্ডলু ! চলিয়াছ ঠিক
বীরের মতন ! ভ্রূকুটির নাহি ভয় ;
অবজ্ঞা বিদ্রূপ কিছু গ্রাহ্য নাহি হয়।
আত্মার অপূর্ব জ্যোতি অমল উজ্জ্বল
স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিছে ও নেত্র যুগল !
তোমার নাহিক কাজ মোহান্তের বেশে,
তোমারে যে প্রেমচ্ছদ দিয়েছেন হেসে
সর্বসাক্ষী ; জগতের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ;
জয় ! জয় ! তুমি পেলে পরম সম্পদ !
যাও হে, বিলাও নাম মানুষের হাটে,
নামের মশাল জ্বালি',—অন্ধকার কাটে
যাহে সব ; খ্যাতি তুমি কর না তো আশ,
নক্ষত্র না চাহে দীপ,—সে যে স্বপ্রকাশ।

আনন্দ-বাণী

মাণিক্কবাচকর

হৃদয়ের সরোবরে নীরবে নিয়ত ভরে
তব প্রেম, হে প্রেম নিলয় !
অমৃতের উৎস তুমি আর্দ্র কর মরুভূমি,
স্বরূপ দেখাও কৃপাময় !
তোমার প্রেমের স্রোত করিয়াছে ওতঃপ্রোত
প্রিয় তব ভকতের প্রাণ,
ছিনু আমি অকিঞ্চন তুমি দেছ সর্বধন,
আমি কিবা দিব প্রতিদান।

সকল ভক্তের পিছে আছি আমি সব নীচে
হে দেবতা ! সত্য সনাতন !
পরম পরশ দিয়া তনু মন গলাইয়া
গ্লানি তাপ কর বিমোচন।
চিন্তার অতীত যাহা চিন্তা কর তুমি তাহা
চিন্তামণি ! অমিয়-সাগর !
সর্বকালে-স্বপ্রকাশ ! মিনতি করিছে দাস
যোগ্য স্তুতি শিখাও শঙ্কর !
অনন্ত আনন্দ-সুধা ! নাহি ক্ষোভ, নাহি ক্ষুধা
নাহি ক্ষয়, নাহি নাহি ক্ষতি,
প্রলয় অনল মাঝে মহিমায় স্থাণু রাজে,
শূন্যমাঝে পূর্ণ পরিণতি।
বাঁধ যত অবহেলে ভেঙে ফেলে তুমি এলে
হিয়াতলে বন্যার মতন,
আমাতে করিলে বাস ! এর বেশী কোন্ আশ
করিব তোমারে নিবেদন ?
ক্ষিতি-জল-অগ্নি-বায়- ব্যোমে বিস্তারিয়া কায়
ভূতের অতীত ভূতনাথ !
তোমারে দেখেছি আজ আমি সর্ব-ভূত-মাঝ
সুপ্রভাত ! আজি সুপ্রভাত !
তুমি ধারা চেতনার জীবনের পারাবার,
কে জানে হে তব বিবরণ !
আমার তিমির নাশ করিলে হে স্বপ্রকাশ !
সূর্য সম বিতরি' কিরণ
রশ্মিময়, পিঙ্গ জট, তুমি হে অনাদি বট,
সূর্য, তারা, পৃথ্বী তব ফল ;
বারিগর্ভ হুতাশন ! কেবা পর ? কে আপন ?
বল মোরে, নিখিল-সম্বল !

আমারে গ্রহণ করি নিজেরে সঁপিলে, মরি ;
কে জিতিল ? তোমারে সুধাই,
আমারি অন্তরে ঘর বাঁধিলে, হে মহেশ্বর ;
কুলাল না ত্রিভুবনে ঠাঁই !

সাধু

তুকারাম

অন্তর নিরমল, বচন রসাল,
থাক আর নাই থাক তুলসীর মাল ;
সংযম-নিয়মিত বিমল চরিত চিত,
থাক আর নাই থাক শিরে জটাজাল ;
কামনা কামের ফাঁস যে জন করেছে নাশ,
ছাই মাখা হ'ক কিবা না হ'ক কপাল ;
অন্ধ যে পরধনে, বধির যে কুবচনে,
তুকা জানে সেই সাধু বাকী জঞ্জাল ।

ঋণী ঠাকুর

তুকারাম

নারায়ণ দেউলিয়া এইবার !
লক্ষ লোকের কাছে ঋণী প্রভুটি আমার ।
প্রভাত হলে দেউল ঘিরে জগৎ ফুকারে,—
'আমার নিধি দাও হে ঠাকুর ফিরিয়ে আমারে' ;
তখন মায়ায় হন্ অমনি পাষাণ অবতার ।
মরমপাতে খত লিখেছ,—আছে নাম সহি,
চরণ বাঁধা রেখে গেছ,—মাথায় তাই বহি ;
এখন ফাঁকি দিবে কি তাই কও না কথা আর ?
তুকা বেনে মহাজন আজ ঠাকুর দেনাদার ।

প্রার্থনা

(মেক্সিকো)

মনসা কাঁটার শুভ সুমনস্!
আমারে কর গো বুড়া,
কুহকের জাল ছিন্ন কর গো
মায়াবীর মায়া গুঁড়া;
তেমন বয়স পাই যেন, যাহে
লাঠি হয় সম্বল,
আমার আরতি গ্রহণ কর গো
নিশীথের শতদল!

প্রার্থনা

(সিউস্ জাতি)

হে দেবী পৃথিবী, ওগো পিতামহী
দেহ আয়ু, দেহ বল;
বুনো ঘোড়া যেন ধরিতে পারি গো
মারিতে শত্রুদল।
শান্তির দিনে অন্তরে যেন
কখনো না পশে রোষ,
নিজ গোত্রের 'পরে যেন কভু
হয় নাকো আক্রোশ।

প্রার্থনা

(নাভাহো)

অনন্ত-যৌবন, প্রভু, আকাশের রাজা!
পূজা লও, রাখ মোর দেহ মন তাজা;
চিরদিন রেখ' মোরে সবল সুন্দর,
সৌন্দর্যে পূর্ণতা যেন পায় চরাচর।

প্রার্থনা

(মেক্সিকোর আস্তেক জাতি)

তুমি মাঝে মাঝে দণ্ড যা' দাও
দয়াময় প্রভু মোর,
তাহে নিঃশেষে হয় যেন নাশ
মম ভ্রান্তির ঘোর।

প্রার্থনা

(দ্রাবিড়)

কিসে শুভ কিসে অশুভ আমার কিছুই বুঝিনে প্রভু!
প্রার্থনা করি তবু!
তুমি সব জানো, এইটুকু জেনে আছি আমি আশা ধরি,
তাই প্রার্থনা করি;
যাহা দিতে চাও তাই শুধু দাও,—তাতেই আমার শুভ,
এ কথা জেনেছি ধ্রুব,
তোমার অর্থে সার্থক কর মোর প্রার্থনাচয়,
প্রভু! মঙ্গলময়!

প্রার্থনা

নিগ্রো ডানবার

হে প্রভু! আমার চরণ ক্লান্ত
এই পথখানি এসে;
ব্যথিত পান্থ কর হে শান্ত,
পরান জুড়াও হেসে।
কম্পিত পদে ফিরেছি যে পথে
সেথাই কাঁটার বন;
তীর্থ সুদূর যাত্রী বিধুর,
ব্যবধান ত্রিভুবন।

সন্তাপহর ! তোমার অজর
প্রেমের নির্ঝর পানে
নিয়ে যাও প্রভু ! বড় ব্যথা বুকে,
পরশ বুলাও প্রাণে

রহস্যময়

রুমি

তোমার আলোকে সৃষ্টি দেখেছি,
তোমারেই শুধু দেখিনি কভু,
অন্তরযামী গোপনে কোথায়
লুকায়ে রয়েছ, হে মোর প্রভু !
দ্যুলোক দুলিছে আলোকে তোমার,
দুলিছে দুলিছে তপন শশী,
রসের ফোয়ারা হয়ে মাতোয়ারা
নির্ঝর ধারা পড়িছে খসি' !
পবনের মত তুমি ভগবন্।
আমরা পবন-ধূনিত ধূলি,
পবনেরে কেহ চক্ষে দেখে না,
দেখে চঞ্চল কণিকাগুলি।
তুমি ঋতুরাজ বিরাজিছ তাই
আমরা এসেছি পুষ্পপাতা,
ঋতুরাজে কেহ চক্ষে দেখে না,
দান দেখে লোক, দেখে না দাতা
নিগূঢ় গোপন আত্মা তুমি হে,
হস্ত চরণ আমরা সবে,
তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা
তুমি বলাইলে বলি সে তবে !

আমরা রসনা, পশ্চাতে তার
তুমি সে প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা,
তোমারি বিভায় আকাশ আকুল
তোমারি প্রভায় ভুবন ভরা।
তুমি সমুদ্র আমরা তুফান,
তুমি আনন্দ আমরা হাসি ;
স্বরূপ গোপন করেছ, হে প্রভু !
লুকাতে পার নি করুণারাশি।
সৃষ্টির কাজে দেখিয়া ফেলেছি,
করুণার মাঝে পেয়েছি দেখা,
কর্মে বচনে অনন্তদেব !
নিশিদিন তুমি জাগিছ একা।

সাযুজ্য-সাধনা

মামুদ শবিস্তারী

মনোমন্দির প্রাণেশের লাগি'
কর সম্মার্জন,
তাঁহার বাসের যোগ্য করিতে
কর ওগো প্রাণপণ ;
আপনার কাছে বিদায় লও গো
দেরি করিয়ো না আর,
তুমি-হীন ওই তোমারি ভিতরে
ফুটিবে মহিমা তাঁর।

কামনা

জামি

কাছে কাছে সদা রহিব তোমার এই শুধু মোর সাধ,
তোমার নিকটে বসিতে পাইব,—এই মহা আহ্লাদ !

সারাদিনমান নয়ন ভরিয়া রহিবে মুরতি তব,
নিশার আঁধারে চরণ দু'খানি মাথায় তুলিয়া লব।
গহন ছায়ায় শয়ন বিছায়ে, ও রাঙা অধর হতে
মুহুমুহু মধু পান করিব হে ভাসিব সুধার স্রোতে!
বিক্ষত হিয়া যাবে জুড়াইয়া স্নিগ্ধ প্রলেপে ভিজে,
এর বেশী সুখ চাহি না গো আমি ভাবিতে পারি না নিজে।
উষর এ মোর মন-মরুভূমি, তৃষায় চেতনা-হারা,
নব প্রাণ দানি' কবে উছলিবে তোমার স্নেহের ধারা?

প্রিয়তমের প্রতি

রুমি

ভাবনার ভারে ওগো প্রিয়তম হয়েছি কুঁজা,
তব প্রেমময় পরশে আমায় কর হে সোজা।
ওই হাতখানি রাখিলে মাথায় জুড়ায় মাথা,
নিখিল-ভরণ করুণ ও কর, জেনেছি ধাতা!
ছায়া দান করি হে প্রভু সে ছায়া নিয়ো না হরি'
ব্যথিত,—ব্যথিত,—ব্যথিত আমি হে কাঁদিয়া মরি
নয়নে ছলিয়া নয়নের ঘুম গিয়েছে চলি',
তোমার শপথ তব আশাপথ চাহি কেবলি।

বিরহী

তুকারাম

কেমন উপায় করি ভেটিতে তোমায়,
ভাবিতে ভাবিতে মোর তনু জরি' যায়।
ত্যজিয়া আপন জন যাই পরদেশ,
তোমায় দেখিতে যদি পাই পরমেশ!
সহিতে না পারি নাথ! সহিতে না পারি,
পুড়ায়ে করিব ছাই এ তনু আমারি;

অলপ আয়ুর কাল,—নিতি ক্ষয় পায়,
বল, আর কবে দেখা দিবে হে আমায় ?
বিচারি' আপনি কর যে হয় বিহিত,
হুকুম শুনিতে তুকা সদা অবহিত।

বিচারপ্রার্থী

তুকারাম

দয়াহীনে দণ্ড দিতে তুমি আছ, হরি !
নালিশ তোমার নামে কার কাছে করি !
কাতরে মিনতি করি নাহি তোলো কানে,
নীরবে বসিয়া থাক,—ব্যথা পাই প্রাণে ;
আকুল নয়নে চাই ধরিয়া চরণ,
প্রাণের বেদনা সদা করি নিবেদন ;
মনের মোহের ফাঁস কর প্রভু ক্ষয়,
তুকা কয়, আর নয়,—এস দয়াময় !

শুভযাত্রা

তুকারাম

প্রভুরে তোর স্মরণ করে
যাত্রা করিস মন !
প্রভুর নামে রিক্তাতিথি
মিলায় কাম্য ধন ;
মাহেন্দ্র যোগ ঐ যে তোমার,
ক্ষতি-ক্ষয়ের ভয় কোথা আর
তুকা কয় প্রভুর সেবায়
সদাই শুভক্ষণ।

বিরহী

জামি

সংসার হতে এবার আমার গাঁটরি গুটায়ে
তুলিব কাঁধে,
তোমার মুখের মাধুরী নিরখি মরে যেতে মোর
পরান কাঁদে ;
সেই উল্লাসে আপনা হারাব, হারাব আমার
যা' কিছু আছে,
মিছে ভাবনার কাটনা ভাঙিয়া লুটাব তোমার
পায়ের কাছে।
মোরে আর তুমি খুঁজিয়া পাবে না, পরান তখন
দেহে না রবে,
মোর পরানের ঠাঁইটুকু জুড়ে তুমি সে আমার
পরান হবে!
নিজের ভাবনা দূর হয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে যাবে
হৃদয় মম ;
আমারে ভরিয়া তুমি শুধু রবে—তুমি শুধু রবে
হে প্রিয়তম!
ধরণীর মণি! স্বরগের সার! আমারে ফেলিয়া
রেখ না একা,
আপনারে আমি ভুলিব, হে সখা, তুমি যদি দাও
বারেক দেখা।

প্রেম নির্মাল্য

রুমি

মধুর মদির মত্ততা এস, এস তুমি ভালবাসা,
এস হৃদয়ের গ্লানি-বিমোচন, সকল দর্প-নাশা!
ধন্বন্তরী তুমি আমাদের, তুমিই পাতঞ্জল,
যোগের সূত্র শিখাও, কর গো নিরাময় নির্মল।

প্রেমের আবেশে পাহাড় টলেছে সাগর উঠেছে দুলে,
প্রেমের মহিমা মর্ত্য-মানুষে নিয়েছে স্বর্গে তুলে !
যদি প্রেমময় ধন্য করেন মোরে চুম্বন দানে,
উচ্ছ্বসি' হিয়া কাঁদিবে ফাটিয়া মুরলী-ললিত-তানে ।

দর্বেশের ঘূর্ণি নৃত্য

সৈয়দ নিমতুল্লা

দাও ঘুরপাক জ্ঞান ঘুচে যাক,
ঘুরুক মাথা !
চোখে মুখে নাকে ছুটুক আগুন
উঠুক গাথা !
কোথায় পাজামা পাগড়ি কোথায়
যাব তা' ভুলে,
ঘুরপাক দিয়ে করিব নৃত্য
দু'বাহু তুলে ।
রাঙা সুরা আর রাঙা পেয়ালার
ঘুচিবে ভেদ,
হৃদয়ে প্রণয়ে হবে একাকার
রবে না খেদ ।
কি করেছি আর কি যে বাকী আছে
জানিব না তা',
সব জানি তবু কিছুই জানিনে
টলিছে মাথা !
শাস্ত্র শুনিবে ? পণ্ডিত আছে,—
জানিনে অত,
ভাবে বুঁদ হয়ে চরণে দলেছি
শাস্ত্র যত !

ঘুরপাক দাও আগুন জ্বালাও,
টুটুক বাধা,
ভয়ে সংশয়ে ফুকারি' মরুক
যতেক গাধা।
কাফের কে আর কে মুসলমান ?—
প্রেমের দাস !
প্রেমে সব এক, ওরে দেখ দেখ !
কি উল্লাস !
সুখে আছি বুকে আকাশ আঁকড়ি'
বিভোল প্রাণে,
পায়ের তলায় কে কি বলে, হায়,
পশে না কানে !
ঘুরুক ভাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড
ঘুরুক সাথে,
আমরা প্রেমিক, পরশ মানিক
পেয়েছি হাতে !

আমি

যূনাস

আমি ইসলাম, আমিই কাফের,
আমিই ঘোরাই চন্দ্রতারা !
গগন-ললাটে মেঘের অলক
আমিই বরষা বৃষ্টি-ধারা !
আমিই তড়িত-তন্তু-বিথার,
আমিই বিকট বজ্র-শিখা,
কালকূটে ভরা আমি ভুজঙ্গ,—
রঙ্গে পরাই মৃত্যু-টিকা।

অস্থি-চর্মে গ'ড়ে উঠি আমি
রক্তে-মাংসে রহি গো জীয়ে,
অনাদি জ্ঞানের হিন্দোলে দুলি
অনাদি প্রেমের পীযূষ পিয়ে !
ঋতু বসন্তে মর্ত্যে যে আনে,—
হৃদি-মন্দিরে নিবসে যেই,
সম্মত হয় সন্তান হতে—
কিংকর হতে—আমিই সেই !
মেঘ হয়ে যাহা ঊর্ধ্বে উঠিছে
জল হয়ে যাহা নামিছে নীচে
—আমি সেই—যাহা অন্ধজনের
নাচিছে চোখের সমুখে পিছে !
বিনা ইন্ধনে যে আগুন জ্বলে,—
চকমকি উঠে চকমকিতে,—
আমি সেই !—আমি অনেকের প্রভু,—
সেবা করি তবু পুলক চিতে।
কে আছ ব্যথিত চিন্তা মথিত
এস, আমি দিব জুড়াতে ঠাঁই,
নয়ন-নগরে পরানের ঘরে
বাহিরের গোল কিছুই নাই !
এত কথা যুনা জানে না জানে না,
অনাদি রসনা বলায় তারে ;
আদি ও অন্ত একাধারে আমি,
মূঢ় সে যেজন বুঝিতে নারে।

প্রেমের ঠাকুর

মীরাবাই

নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জলজন্তু তো আছে,
ফলমূল খেলে হরি যদি মেলে,—
বানর রয়েছে গাছে।
তৃণ দাঁতে ধরি যদি মিলে হরি
তবে হরি হরিণের,
কামিনী ত্যজিলে হরি যদি মিলে
খোজা তো রয়েছে ঢের।
শুধু দুধ খেলে হরি যদি মেলে,—
কত আছে কচি ছেলে,
কহে মীরাবাই বিনা প্রেম, ভাই,
সে ধন কভু না মেলে।

ভোলামনের প্রতি

তুকারাম

কি রে মন তুই কৃপাময় নাথে রয়েছিস্ নাকি ভুলে,-
বিশাল বিশ্বে তুলে
শূন্যে যে ধ'রে আছে ;—
পীযুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি শিশুরে করাতে পান,
মাতা আর সন্তান,
যাঁর করুণায় বাঁচে !
বিষম রৌদ্রে ক্ষুদ্র তৃণের অঙ্কুরে যে বাঁচায়
করুণার ধারা ধায়
জুড়ায় তাপিত প্রাণ ;

অনাদি অশেষ অনাথ-শরণ রক্ষা করেন তোরে—
স্মরণে রাখিস্, ওরে !
সকলি যে তাঁরি দান।
তিনি যে নিখিল-বিশ্বভর চির-আনন্দ-ধাম,
ভাব তাঁরে, তুকারাম !
কর তাঁরি নাম গান।

পূজার পুষ্প

রানী কোমিয়ু

হাত দিয়া তুলিব না, পরশে দূষিত হবে ফুল,
থাক তারা আলো করি তৃণ লতা বনতরুকুল ;
সহজ শুচিতা সহ আমি দিনু সর্ব পুষ্পদলে,
অতীত ও অনাগত বুদ্ধদের চরণকমলে।

দুঃখলোগী মিলন

রাবেয়া

প্রভু ! আমি কেমনে বুঝাব
আমার সে প্রাণের বেদন ?
নয়ন, তোমার আবির্ভাবে,
হয় যে গো উৎসবে মগন !
প্রভাতে উদিলে দিননাথ
মলিন কি রহে শতদল ?
পাই যবে তোমার সাক্ষাৎ
আপনি লুকায় আঁখিজল !

পূর্ণ-মিলন

জামি

চেয়ে থাক, চেয়ে থাক ; চেয়ে, চেয়ে, চেয়ে,—
যার পানে চেয়ে আছ—তারি রূপে ছেয়ে

যাক্ তনু মন প্রাণ ; হও তন্‌ময়,—
'তোমার' 'আমার' ভেদ হয়ে যাক্ ক্ষয় ;—
'চাওয়া' হয়ে যাক 'হওয়া'। নিস্পন্দ, নির্বাক,
ক্ষীরে নীরে মিলি মিশে এক হয়ে যাক।
যে অবধি 'দুই' আছে, হায় ততক্ষণ
রয়েছে বিচ্ছেদ ভয়, রয়েছে ক্রন্দন।
পরম প্রেমের পুরে যেই পশিয়াছে,—
সে জানে একের ঠাঁই সেথা শুধু আছে ;
দুই মিলে এক হলে তবে সে মিলন
সম্পূর্ণ সুন্দর হয় ;—সার্থক জীবন।

আমার দেবতা

পট্টনত্তু পিল্লাই

মৃত্তিকা ছানি' আমার দেবতা গড়েনি কুম্ভকার,
ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার ;
অষ্ট ধাতুর নহে সে ঠাকুর সে নহেক পিত্তল,
অম্ল তেঁতুলে দেবতা আমার হয় না গো নির্মল।
এ জীবনে আর করিতে নারিব অন্যের আরাধন,
মরমে পেয়েছি পরশ-মানিক ! সোনা হয়ে গেছে মন !
মন জানে আর প্রাণ জানে মোর সে আছে সকল ঘটে,
বচন-অতীত—তবু তারি কথা অচেত-চেতনে রটে !
শাস্ত্রের শ্লোকে আঁধারে আলোকে আছে সে আকাশ ভরি'
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে ভকতের ধ্যানে আছে দিবা বিভাবরী।
তপন প্রকাশ থাকিতে প্রদীপ জ্বালিতে করি না আশ,
গ্রাহ্য করি না অজ্ঞজনের নিন্দা ও পরিহাস।
বুদ্ধি বিচার কিছু নাই যার চীৎকার শুধু করে,—
অকূল সাগরে ডুবায় সে পরে আপনি ডুবিয়া মরে।
ছিল দিন যবে কাঠের ঘোড়ারে আমিও দিয়েছি জল,
অম্ল তেঁতুলে করিতে গিয়েছি দেবতারে নির্মল।

সে

সুকুন্ত

বনে, প্রান্তরে, শৈল-শিখরে সে আছে সীমার পারে,
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে ;
লুপ্ত-আলাপ বিশ্ব রাগিণী লিপ্ত করিছে তারে,
পান্থ-পাখীর সাথী হয়ে সে বিহরে।
নির্ভাজ নিবিড় পর্দা দোলায়ে বাতাস যেমন করে
যায় গো জানায়ে আপন আবির্ভাব,—
বাঁশের বাঁশীতে পশিয়া যেমন নিশ্বাস ধরা পড়ে,
ফুকারি' প্রকাশে গোপন গভীর ভাব,—
তেমনি করিয়া মাঝে মাঝে সে যে ধরা দিতে কাছে আসে,
ধরিতে গেলেই পলায়ে পলায়ে ফিরে,
নিতি নব বেশ, বিন্যাস নব, নিতি নব হাসি হাসে,
বিহরে লীলায় অকূলের তীরে তীরে !

মনোদেবতা

জাগিলে যে দূরে, ঘুমালে নিকটে, স্বপনে ফুটায় চোখ,
অনাদি জ্যোতির দূরগামী রেখা সে আমার শুভ হোক।
যাহারে ছাড়িয়া কোনো ক্রিয়া নাই, অন্তরে যে আলোক,
পরম জ্ঞানের অমৃত যে আনে সে আমার শুভ হোক।
হয়েছে, হতেছে, হবে যার গুণে অচেত-চেতন-লোক,
অমৃতের মাঝে ধরেছে যে সব সে আমার শুভ হোক।
যুগে যুগে যেই মনীষী-জনের যজ্ঞের নিয়ামক,
সপ্ত হোতায় মন্ত্র পড়ায়—সে আমার শুভ হোক।
চক্র-নাভিতে অরার মতন ধরে যে নিখিল শ্লোক,
ঋক্, সাম, যজু ধারণ যে করে, সে আমার শুভ হোক।
নিপুণ, প্রবীণ সারথীর মত চালায় যে,—সব লোক,
হৃৎ-প্রতিষ্ঠা সেই বেগবান ইষ্ট আমার হোক।

প্রাণ-দেবতা

অথর্ববেদ

নিখিল ভুবন বশে যার সেই প্রাণেরে নমস্কার,
প্রভু যে সবার আধার যে ওগো সবারি প্রতিষ্ঠার।
শব্দিত প্রাণে নমি আমি আর নমি কম্পিত প্রাণে,
প্রাণ বিদ্যুতে প্রণাম করি গো প্রণমি বর্ষমানে।

*　　*　　*

চন্দ্র তপন প্রাণেরি সে নাম, প্রাণ সেই প্রজাপতি,
প্রাণ সে বিরাট প্রাণ সে দ্রষ্টা প্রাণ সে পরম জ্যোতি।
প্রমোদিত করে সকল প্রাণীরে ধারারূপে প্রাণ নেমে,
মহীরে সুরভি করে সে আসিয়া ওষধি লতার প্রেমে।

*　　*　　*

সত্য-সেবকে উত্তম লোকে প্রাণ শুধু নিয়ে যায়,
মৃত্যু-অভেদ প্রাণের ভজন দেবতা মানবে গায়।
সকল সৃষ্টি, সকল চেষ্টা, সকল নিধির সার,
ব্রহ্মেতে ধীর, তন্দ্রাবিহীন প্রাণেরে নমস্কার।

বহুরূপ

কঠোপনিষৎ

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানারূপ ধরে আধার ভেদে,
নিখিলের প্রাণ তেমনি করিয়া
একা নানা ছাঁদ বেড়ান ছেঁদে!

বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি'
নানা সুরে গাহে যন্ত্র ভেদে,
নিখিলের প্রাণ এক ভগবান
তেমনি বেড়ান হেসে ও কেঁদে!

তপন যেমন নিখিলের আঁখি,—
কলুষে দূষিত হয় না তবু,
নিখিলের প্রাণ তেমনি গো, তাঁরে
বাহিরের গ্লানি ছোঁয় না কভু।

সর্বভূতের অন্তরতম,
বহুরূপ তিনি গোপনচারী,
আপনার মাঝে তাঁরে যে দেখেছে
অক্ষয় সুখ তারি গো তারি।

তুমি

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তুমি নর, তুমি নারী,—
যুবক, বালক, বালা;
তুমিই আবার লাঠি হাতে ধরি
বুড়া হয়ে হও আলা!

তুমি আছ চারিদিকে,
চারিদিকে তব মুখ,
তুমিই আবার জন্ম লইয়া
না জানি কি পাও সুখ!

নীল পতঙ্গ তুমি,
রাঙা-আঁখি তুমি শুক,
বিদ্যুৎভরা মেঘ তুমি, প্রভু!
সাগর সমুৎসুক!

অনাদি তোমার নাম,
অন্ত তোমার নাই;
তুমি আছ বলে বিশ্বভুবন
বর্তিয়া আছে তাই।

ব্রহ্মপ্রবেশ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

নিজ তনু হতে তন্তু সৃজিয়া
উর্ণনাভের মত,
আপনার জালে আপনি আবৃত
হয়েছেন যিনি স্বতঃ,
সাক্ষী, চেতন, পরমপুরুষ
সেই নিখিলের প্রাণ,—
আমাদের সবে ব্রহ্ম-প্রবেশ
সূত্র করুন দান।

মৌন

রুমি

বচন হারায়ে বসে আছি আমি
বন্ধ করেছি গান,
তুমি কথা কও, কথা কও, ওগো
প্রাণের প্রাণের প্রাণ!
অতুলন যার মধুর মুখের
মদিরায় মাতোয়ারা
গান গেয়ে ওঠে অণু পরমাণু
গুঞ্জরে গ্রহতারা।

শির্ণি

কবি মনীষীর বন্দনা-গীতি,
সাধু সন্তের ভাষা,
মিলে মিশে গিয়ে একটি পাত্রে
শির্ণি হয়েছে খাসা!

সকল সলিল সাগরে এসেছে,
আঁখি মেলে তোরা দেখ।
যার বন্দনা গেয়েছে সবাই
সে যে এক! সে যে এক!
পাপড়ি—প্রচুর প্রকাশ পেয়েছে
বেড়িয়া বৃন্তখানি,
একের পরম জ্যোতিরে ঘিরেছে
বিশ্বজনের বাণী।

ফুলের ফসল

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি',
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী !

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা ।

—মহম্মদ

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয়!
মৌমাছিরে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয়!
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লুতার সুতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেলবি আয়!
বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,
জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
মুখখানি তার চুমায় ছায়!
ফুলের তূরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আয় কিসের দেরি,
ভ'রে দে এই মিহিন হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায়!
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক-পোকার চুমকি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,
স্বপ্ন-শাসন মেলবি আয়!
অঞ্চলে আয় অঞ্জলিতে,
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্ রে যত পরান চায়;

আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
গন্ধ রাখিস স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নিছনি তার
রাখিস নিথর চাঁদের ভায় !
ক্লান্ত নয়ন পড়লে ঢুলে
ঘুমাস কোমল শিরীষ ফুলে,
শুকতারাটি ডুবলে, না হয়,
ফিরবি ভোরের আবছায়ায় !

এস

বন-পল্লবে ঘন করি' দিয়ে এস বসন্ত বায় !
পুলকাঞ্চিত করি' ধরণীরে এস লঘু দ্রুত পায় ।
এস চঞ্চল ! এস প্রসন্ন !
পূর্ণ কর গো যা' আছে শূন্য,
সৌরভে, রসে, সুপ্ত হরষে ভরি' দেহ চেতনায় ।
কোকিল কণ্ঠে এস হে রঙ্গে,
এস তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে,
হরিতে, স্বর্ণে, তরুণ বর্ণে, সুখ-ভরা সুষমায় ।
এস অন্তরে, এস হে হাসিতে,
সন্ধ্যা-উষার পুষ্পরাশিতে,
অঞ্চলখানি দীপে দীপে হানি' সঞ্চর জোছনায় ।
এস যৌবনে হে চির-কিশোর !
এস মম চিতে ওগো চিত-চোর !
নব রবি-তাপে এস গো তাপিত নব-কিশলয়-ছায় ।
এস পরিচিত পরশের মত,
সুখ-স্বপনের হরষের মত,
আঁখি-পল্লবে চুম্বন দিয়ে যেয়ো যেথা মন চায় ।

ফুলের দিনে

ফুলের বনে ফুলের দিনে
আমরা রাজা আমরা রানী।
মন কেড়ে নিই নানান্ ছলে
আইন কানুন নাহি মানি।
আপন হাতে শাসন করি,
বসি ফুলের আসন 'পরি
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া-তলে
আমরা সবায় মিলাই আনি!
পাখীর গানে গেয়ে উঠি,
ফুলের সনে আমরা ফুটি,
তটিনীর ওই তরল-গাথায়
সরল হৃদয় লই গো টানি!
ফাগুন রাতে হাওয়ার সনে
হেসে বেড়াই বনে বনে,
লুকিয়ে শুনি কৌতূহলে
পাতায় পাতায় কানাকানি!
মোদের হাসি মোদের গীতি
জাগায় নিতি নূতন প্রীতি,
ফুলের ফসল ফলায় আসল
মোদের মুখের মঞ্জুবাণী।

ফাল্গুনী হাওয়া

কখন এলে গো ফাগুন বাতাস
ওগো চির-সুমধুর!
কখন রিক্ত লতারে পরায়ে
দিলে এ রতনচুর!

পথে প্রান্তরে ঝলমল করে
ফুলকাটা কিংখাব,
আমের মুকুলে অশোকে বকুলে
তোমারি আবির্ভাব !

পান্না চুনীর কণ্ঠী পরেছে
টিয়া আর চন্দনা,
পুলকিত হিয়া কোকিল পাপিয়া
গাহে তব বন্দনা !

ঘন ভুরু জিনি' যব শীষ যত
শিহরি উঠিছে সুখে,
মউল ফুলের বারতা এসেছে
মউচুষ্‌কির মুখে !

চুমকি হাজার বসেছে আবার
আকাশের মখ্‌মলে,
হিম যামিনীর কালো পেশোয়াজ
ফিরে আজ ঝলমলে ।

কখন আসিলে অতিথির বেশে
বহু জনমের বঁধু,
শিশির-নিশির অশ্রু হরিলে,
অধরে ধরিলে মধু !

মৌন বিকাশ

ওগো আজকে তোমারি আঙিনার কোলে
মুকুল মেলিল আঁখি !
ধূলির কোলে সে কোথা হতে এল
স্বর্গ-সুষমা মাখি !

এনেছে সে শোভা এনেছে গো হাসি,
অঙ্গ ভরিয়া সৌরভরাশি ;
তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া
কুহরি' উঠিছে পাখী !
ওগো সে এসেছে যে,
তারে আরতি করিয়ে নে ;
বনের দুলাল দুয়ারে তোমার
তাহারে লহ গো ডাকি ।
চোখে কত কথা করে ফুটি-ফুটি
মু'খানিতে কত হাসি লুটোপুটি,
কত ফাগুনের কাহিনী এনেছে,
ওগো, সে শুনিবি নাকি ?
কিরণ দোলায় সে
মৃদু বায়ুভরে দুলিছে
ঘন পল্লব-সিন্ধু-লহরে
মুকুতার ছবি আঁকি !
কত কথা যেন চাহে সে সুধাতে,
কি বারতা যেন এসেছে শুনাতে,
ধূলি-পিঞ্জর খুলি' কৌতুকে
এসেছে মৌন পাখী ।

কুঁড়ি

জড়সড় কুঁড়িটি আজ কে গো ফোটালে !
কোন্ চাঁদে আজ চুমা তোমার দিলে কোন্ গালে !
কোন্ পরীতে ও মুখ চেয়ে
উড়ে গেল কি গান গেয়ে !
কোন্ সরিতে উঠলে নেয়ে ! কি রূপ লোটালে !

পুষ্পময়ী

স্বজনি ! তোর অঙ্গে ফুলের বাস !
ফুলের মতই হাসিস !—ও তুই
ফুলের মতই চাস !
কোন্ দেবতার কুঞ্জবনে
ছিলি গো তুই কোন্ ভুবনে,
কোন রজনীগন্ধা তুমি
ফেলিছ নিশ্বাস !

প্রেমাভিনয়

আয় সখী, তোরে শিখাই আদরে
ভালবাসাবাসি খেলা ।
কাছাকাছি এসে অকারণে হেসে
শেষে ভালবেসে ফেলা !
না চাহিতে-পাওয়া ধন সে, স্বজনী,
ভালবাসা তার নাম,
যে তারে জেনেছে হৃদয়ে টেনেছে
নাহি তার বিশ্রাম !
আকাশের বুকে ফাঁদ পেতে সুখে
চাঁদ নিয়ে হেলাফেলা,
হাসিতে হাসিতে ঘুমায়ে নিশীথে
আঁখিজলে আঁখি মেলা !

মহুয়া ফুল

যায় যে ব'য়ে ফাগুন-রাতি, কই গো রাজবালা !
আমায় নিয়ে গাঁথবে না আর স্বয়ংবরের মালা ?
রসে ভরা ফলের মতন নিটোল সোনা ফুল,—
ধূলায় শেষে ঝরব ? হব' ধূলার সমতুল ?

ফলের পরিপূর্ণ ছাঁদে শোভন আমার কায়,
সফল করি সোনার স্বপন, ভুলছ কি তা' ? হায় !
কাঁচা সোনার কৌটা আমি রসেতে ভরপুর,
তোমার মত হে সুন্দরী মদির-সুমধুর।
মনে যারে ধরবে তোমার চাইবে যারে মন,
তোমার হয়ে তারেই আমি করব আলিঙ্গন,
সরম তোমার রইবে অটুট পূরবে আকিঞ্চন,
আমায় দিয়ে হবে তোমার আত্ম-নিবেদন।
কন্যা ! আমি সকল দিকে তোমার সমতুল,
বাহিরখানি ফলের মতন, মরমখানি ফুল !
ফাগুন রাতি যায় পোহায়ে কই গো তুমি কই ?
স্বয়ংবরের মালার মোতি—ধূলায় শয়ন লই !

জ্যোৎস্নায়

আমার পরান উথলিছে আজি
না জানি কিসের হরষে !
সারা তনুখানি উঠিছে শিহরি'
অজানা এ কার পরশে !
কলঙ্কী চাঁদ হাসিয়া, আমায়
ঘরের বাহির করিবারে চায়,
দেবতার প্রিয় সুধা সে আমারি
অঙ্গ প্লাবিয়া বরষে !

গান

মুকুলের মুখ আলগা হ'ল
হালকা হাওয়াতে !
সাগরের বুক উঠল দুলে
চাঁদের চাওয়াতে !

আপন-ভোলা স্বপন এলে
সকল পণই গেল ভেসে,
ভেসে গেল নন্দনেরি
বনচ্ছায়াতে !

লতার প্রতি

ওগো নবীনা লতা !
কেন দোলায়ে পাতা
বাতাসে জানাও
কচি কুঁড়ির কথা !
এই তো সকল
শাখা উঠিছে পূরি',
এই তো নকল
রাখী বাঁধিছে ঝুরি !
নহে বিহ্বল
আজো বহুল পাতা ;
এখনি কেন গো
এত চঞ্চলতা ?
এখনি জাগিল
কিও পুলক-ব্যথা,—
তরুণ পরানে
কোন্ নব বারতা !

গান

আজি এই সাঁঝের হাওয়ায়
দুলে ওঠে ফুলের ভুবন !
দুলে ওঠে ফুলের সাথে
ফুলের মত মঞ্জুল মন !

এত ফুল কোথায় ছিল ?
কোথায় ছিল এত হাসি ?
উধাও-করা ফাগুন-হাওয়া,
সোহাগ-ভরা জ্যোৎস্নারাশি !
প্রাণে আজি লাগছে মোহ,
কে যেন কী রাখছে গোপন !
স্বপন আজি ফলবে বুঝি
মিলবে বুঝি দুর্লভ ধন।

অশোক

মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে !
ভ্রমর পাঁতি দিবস রাতি গুঞ্জে !
মুঞ্জরিয়া উঠিনু মোরা হর্ষে
অরুণ-রাগে তরুণ আলো স্পর্শে !
এসেছে পিক অরুণ তার নেত্র !
অশোক ফুলে অরুণময় ক্ষেত্র !
শীতের সাথে শোকের স্মৃতি নষ্ট,
তরুণ আজি,—ছিল যা' কীটদষ্ট ;
রসের লীলা চলেছে দিবারাত্রি !
পাটল পথে মিলেছে প্রেম-যাত্রী !
হরিতে শোক অশোক ফুটে পুঞ্জে !
মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে !

গান

কেন নয়ন হয় গো মগন
মঞ্জুল মুখে !
কেন হৃদয় ভিখারী হয়
রূপের সমুখে ?

মর্ত্ত্য মানুষ চাঁদের লোভে
কেন মরে মনের ক্ষোভে
বুকে ধরে বিদ্যুতেরে
হায় সে কোন্ সুখে !

ধারা

ওগো এমনি ধারাই হয় !
ফুলের যখন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয় !
তৃষ্ণা-করুণ বাজলে কেকা,
শূন্যে ফোটে স্নেহের লেখা,
চুম্বনেরি চমক লাগে
আকুল ভুবনময় !

জ্যোৎস্না-মেঘ

জোছনা-ঝরানো ভুবন-ভরানো
ওগো চাঁদ ! ওগো জ্যোৎস্না-মেঘ !
আলোক প্লাবনে গগনে, পবনে,—
ভুবনে ধরে না পুলকাবেগ !
জোছনা-বরষা নামিল গো,
তিতিল সকল দেশ !
ভরিল নিখিল ভাসিল গো,
ধরিল নূতন বেশ !
ঘুম-ঘোরে কত স্বপন-মুকুল
পুলকে মেলিল আঁখি আধেক !

গান

চাঁদেরি মত চিরসুন্দর সে
চাঁদেরি মত চিরদিন সুদূরে !
সুধা বরষে শুধু হাসে হরষে
সুন্দর সে—হেসে চায় মধুরে !
চিরদিন সুদূরে !
তারে ধরিতে নিতি পাপিয়া এসে
রেশমী সোপান গাঁথে সুরের রেশে !
ফাগুনী বায়ে সে যে ফিরায় পাশে,
—গুনগুনিয়া শুধু রুনরুনিয়া—
দিন তুনিয়া কাঁদে তার নূপুরে !

অনুরোধ

মোহন মুহুমুহু কেন সখী চায় ?—
মানা করে আয় !
(আমি) পরান ভরি নারি দেখিতে যে তায়,—
লাজে মরি, হায় !
গুপ্ত আরতি মম গোপনে সে রাখি রে,
সে এসে চাহিলে মুখে বসনে সে ঢাকি রে !
নয়ন-মন মম তবু তারি পায় !

কুণ্ঠিতা

আমি আপনি সরমে মরমে মরিয়া যাই যে,
নিতি আপনার ছবি নিরখি' মুকুর মাঝারে ;
আমি কেমন করিয়া বাহিরিব ভাবি তাই যে,
হায় দেখা দিব আমি কেমনে আমার রাজারে !
মোর কিছু নাই রূপ কিছু নাই কিছু নাই গো,
শুধু আছে ভিখারীর স্বপ্ন-শরণ তুরাশা ;

তবে ফিরে যাই দূরে সরে যাই মরে যাই গো,
হায় মরু-মাঝে নিয়ে যাই এ আমার পিপাসা
জানি সুদুঃসহ সে সূর্য সমান, হায় গো,
তবু তাহারি আশায় জেগে আছি আমি রাত্রি
যাব মাটিতে মিশায়ে সরমে, সে যদি চায় গো,
হায় মরণ-পথের যাত্রী—কৃপার পাত্রী !

যদি

যদি কুসুম-শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে যে ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা।
সে যে দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে,
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা।

স্বপ্নময়ী

স্বপনের মত এসে চলে যাও,
রেখে যাও মনে আবেশখানি
নয়নের কোণে হেসে চলে যাও,—
মূল্য তাহার আমিই জানি।
জোছনা সমুখে থমকি' দাঁড়ায়,
বনের কুসুম মু'খানি বাড়ায়,
তরু-পল্লবে পলক পড়ে না,
পাখীর কণ্ঠে মিলায় বাণী ;
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে চলে যাও
পরানে পিয়াও অমিয়া ছানি'।

চোখে চোখে

চোখে চোখে মিলন হলে
মুখে ফোটে হিরণ হাসি !
শিউলি ফুল আর ভোরের তারায়
মতন ভালোবাসাবাসি !
যদি সে কথা না কয়,
না যদি হয় পরিচয়
তবুও নিতান্ত আপন
গোপন প্রাণের কিরণ-রাশি ।

গান

যদি তোমার চোখের আলোয়
কোথাও ফোটে সুখের হাসি,
ধন্য তবে জীবন তোমার
তোমার পথে ফুলের রাশি ।
তোমার স্মৃতি তোমার গীতি
কোথাও যদি জাগায় প্রীতি
তবে দুখের ফণায় বসি'
সুখের সুরে বাজাও বাঁশী ।

মনের চেনা

মন যারে চেনে নয়ন চিনায়
সেই সে আমার পরান-বঁধু ;
পাত্রে পাত্রে নাই সুধা, হায় !
পুষ্পে পুষ্পে নাহিক মধু ।

নয়ন নয়নে নাহি উল্লাস
সকল তারায় নাহিক শোভা ;
অধরে অধরে নাহিক তিয়াষ,
তরুণ জনের পরান-লোভা !
মন চেনে শুধু সে দু'টি নয়ন
যে নয়নে হাসে প্রাণের আলো,
হিয়ার মিলন হোক সে ক্ষণিক
ভালোর আলোর কণাও ভালো ;
সেই অমরতা সেই বাঞ্ছিত
নন্দন-বন-কুসুম-মধু ;—
অমৃত-সিন্ধু-সলিল-বিন্দু
মরমে বরষে অমর বধূ !

গান

আমার পরান ঘিরি' ফুটল কুসুম
তোমার হাসিতে,—
তোমার চোখের স্নিগ্ধ-সরস
জ্যোৎস্না-রাশিতে !
নন্দনেরি মন্দার-হার
লুটায় যেন অঙ্গে আমার,
অজানা আনন্দে হৃদয়
রহে ভাসিতে !

নীরবতার নিবিড়তা

ভালোবাসে কিনা কেন সুধাইবি, আঁখি-জলে, ওরে
সুধাস্ নে ;
ক্ষীণ আলোখানি ঘরের বাহির করিস্ নে, ঝড়ে
নিভাস্ নে।

নত মুখে যায় আঁখি-কোণে চায় প্রাণে নেবে এঁকে
মূরতি যেন,
তরুণ অধরে হাসিটি মিলায় বরিষার মেঘে
রশ্মি হেন !
(তবু) চাস্‌নে চোখের কোণে তার পানে, আপনারে তুই
বিকাস্ নে !
কঠোর হয় রে করুণ দৃষ্টি, হাসি ঢাকে শেষে
গরল-রাশি,
তবু কি পাগল বলিবি ফুটিয়া, 'ভালোবাসি, ওগো
ভালো যে বাসি !'
(তোরে) মানা করি, ওরে যাস্‌নে, প্রাণের মধুর স্বপন
ঘুচাস্ নে !
নয়নে নয়ন,—হয়েছে মিলন ; অঙ্কিত থাক
হৃদয়ে ছবি,
সে হোক প্রাণের পূর্ণিমা রাতি,—মধু সমীরণ,
বিভাত রবি ;
(তবু) ক'সনে গো কথা, দিসনে বারতা, ভালোবাসা তুই
জানাস্ নে ।

গান

হায় ! বারণ করে !
বারণ শুনি—কি গো—তটিনী ফেরে ?
তবু, বারণ করে
চরণ ধ্বনি—তার—যখনি শুনি
বুকে সে বাজে—লাজে—কথা না সরে !
আপনা ভুলি'—হায়—দু'আঁখি তুলি'
উছলি' চলি—খোলা—ঝরোখা 'পরে ।

হায়! বারণ করে!
বাদর ঝরে—বল্—তাহে কে ডরে?
সাগরে ভাসি'—কেবা—শিশিরে মরে?
কঠোর স্বরে—তবু—বারণ করে,
ভুবনে ফিরি—আমি—স্বপন ভরে!

আপন হওয়া

তোরা জানিস্ কি নিতান্ত পরের
আপন হওয়ার সুখ?
তোদের উদাস আঁখি কারেও দেখি,
হয়নি কি উৎসুক?
নূতন প্রেমের নূতন সুখে
হাসি দেখা দেয়নি মুখে?
পূর্ণ চাঁদের আলোয় তোদের
পুরেনি কি বুক?

বাঁশী

আমি জানি না বাঁশীতে কি যে আছে, সখা
পথের পথিক বঁধু!
কোন্ গোপন মনের দুখ-সুখ-মাখা
হৃদি-সঞ্চিত মধু!
সে যে অধর-পরশে চকিতে জাগিয়া
ফুকারি উঠিছে ডাকি;
ওগো বাঁশীর মাঝারে ধ'রে কি রেখেছ
ভুবন-ভুলানো পাখী?
সে যে সোহাগ-পাগল দুলালের মত
অভিমানে ফুলে ফুলে
হায় আমারি পরান-পিঞ্জর 'পরে
বার বার পড়ে ঢুলে।

তার তানে যে এখনো উঠিছে উল'স'
কাননের কলহাসি,
তার সুরে মুহুমুহু মহুয়া ফুলের
নেশা উঠিতেছে ভাসি,
ওগো লুকায়ে তাহারে রেখো না নিভৃতে,
আমরা নেব না ধরি ;
তারে মুক্ত সমীরে ছেড়ে দাও ফিরে
নহিলে যাবে সে মরি।
সে যে চঞ্চু হানিয়া পরান-পুষ্পে
লাজে সরে গেল ধীরে,
সে যে না জেনে দু'আঁখি করেছে সজল,
আহা সে আসুক ফিরে।
ওগো শুধু একবার জাগাও তোমার
বাঁশী-বাসী পাখীটিরে,
ওগো স্বর্গসুখের সুষমা আবার
লাগুক হৃদয়-তীরে।
ফিরে নয়নে লাগুক স্বপনের নেশা
তপ্ত ললাটে হাওয়া,
আমি [illegible] পেয়ে পাব গো পরানে পরানে
চেয়ে যা' যায় না পাওয়া।
মোর মনের কামনা প্রাণের বাসনা
মূরতি ধরিছে আজি,
মোর যত ভোলা গান পেয়ে নব প্রাণ
আকাশে উঠিছে বাজি'।
বঁধু একি করিলে গো বাঁশীরে জাগায়ে
পথের পথিক, সখা !
মোর পিঞ্জরাহত পরান-পাখীর
চঞ্চল হ'ল পাখা।

হায় সুদূর অতীতে এমনি একদা
বাঁশরী বাজায়ে-পথে,
মোরে উন্মাদ করে কে যেন গিয়েছে ;
সে অবধি কোনো মতে
আমি পারি না বাঁধিতে হৃদয় আমার
মন ছুটে বাতায়নে,
শুনি উঠিতে বসিতে বাঁশী চারি ভিতে
ঘুম নাহি দু'নয়নে।
সে যে কাননে বাজিছে মর্মর রবে
কল্লোল নদীজলে,
সে যে গগনের তলে গানে কোলাহলে
ধ্বনিছে শতেক ছলে ;—
তাই উন্মনা আমি তৃষিত নয়নে
দুয়ারে ছুটিয়া আসি ;—
ওগো গগনে, পবনে, পরানে আমার
নিয়ত বাজিছে বাঁশী।
ওগো পথের পথিক ! ওগো সখা মোর !
কি বাঁশী আনিলে, বঁধু।
মোর নয়ন ভরিয়া উঠিল সলিলে,
একি প্রিয় ! একি মধু !

গান

গান গেয়ে হায় কে যায় পথে
কান দিয়ো না তায় !
কেঁদেই যদি মরে বাঁশী,
কার কি আসে যায় ?

মন যদি হায় কেমন করে
সায় দিতে চায় বাঁশীর স্বরে
ভুলেও তবু এস না, হায়,
মুক্ত জানালায়।
লাজুক বাঁশী বাজুক বনে,—
কাঁদুক একা আপন মনে,
তুমি থাক খাঁচার পাখী!
সোনার পিঁজরায়!

চির সুদূর

এত কাছে থেকে হায় তবু এত দূর!
নয়নে নয়ন রেখে পরান বিধুর!
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরান-বঁধুর!

হাস্নুহানা

গন্ধভরা হাস্নুহানা
তুলেছিলাম গুচ্ছ ক'রে;
তখন কেবল সন্ধ্যা নামে
পরান ভরে নানান সুরে।
কপোলতলে ওষ্ঠাধরে
তপ্ত দুটি নয়ন 'পরে
নিয়েছিলাম স্নিগ্ধ-সজল
কোমল পরশ সোহাগ ভরে।
সান্ধ্য ফুলের গন্ধ মদির
পরান আমার করলে অধীর,
তপ্ত হয়ে পড়ল নিশাস
কে জানে হায় কিসের তরে!

সন্ধ্যা ফুরায় একা একা,
এখনো হায় নাইক দেখা,
নেভিয়ে প'ল হাস্নুহানা
পরান সাথে ক্লান্তি ঝ'রে !
সায় দিলে সে মনের সনে,
অশ্রু সনে পড়ল ঝ'রে।

স্বর্ণমৃগ

সোনার হরিণ চলে গেল হায়
মনোলোভা রূপ ধরে,
বিস্মিত হিয়া রহিনু চাহিয়া
তাহারি পথের 'পরে !
আঁখি পালটিতে ফিরে দেখা দিল,—
গেল ফিরে লীলা ভরে ;
আকুল নিশাস পড়িল আমার
পাঁজর শূন্য ক'রে।

উন্মনা

একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না,
দেখতে পেলেই ফিরে ফিরে চাইত ;
আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা,
আজকে সে আর নাই তো কোথাও নাই তো !

দেখিনি তায় সকাল বেলায় মন্দিরে,
বৈকালে সে ঝর্ণা-তলায় যায়নি !
খুঁজেছি সব শৈল-পথের সন্ধি রে
তবুও তার দেখা কোথাও পাইনি।

আজকে দেশে ফিরতে হবে আমায় গো
কোথায় তুমি চারু-চোখের-দৃষ্টি !
এস বারেক আমায় দিতে বিদায় গো,
দৃষ্টি করুক প্রসাদী ফুল বৃষ্টি।

প্রাণের এ ডাক শুনতে কি গো পেলেই না ?
প্রাণের এ ডাক পৌছাল না মর্মে ?
চারু চোখে চাইলে না আর এলেই না ?
না জানি ডাক পৌছাবে কোন্ জন্মে !

বিরহী

গাঙে যখন জোয়ার আসে
থেকো তুমি সাগরে ;
ওই পরশে সরস বারি
মাখ্‌ব অঙ্গে আদরে।
হারা আমার হিয়ার টানে
চেয়ো বারেক তারার পানে,
পড়ব দোঁহে দোঁহার লিপি
আকাশ-ভরা আখরে !

স্বপন

স্বপন যদি সত্যি সফল হয় !
(তবে) তোমায় আমায় এই যে প্রণয়
আবার হবে মধুময় !
জগৎ যদি ফিরায় আঁখি
তবু আমি ভরসা রাখি
হব সুখী, ফিরবে সুদিন,—
হৃদয় আমায় কয় !

ঘূর্ণি

আজ ফুলের বনে দখিন হাওয়া
কী ব'লে গেছে !
অকূল পাথার থির জোছনায়
ঘূর্ণি লেগেছে !
মূর্ছনাতে পড়ছে টলে
মূর্ছা রাগিণী !
পদ্ম 'পরে নৃত্য করে
মত্ত নাগিনী !
ও তার বিষের নিশাস কুসুম-কলির
বুকে বেজেছে।
ঘূর্ণি লেগেছে !

হায় আপন জনে বুকে টেনে
পাইনে খুঁজিয়ে !
তপ্ত ধারা মোচন করি
চক্ষু বুজিয়ে !
সেই অশ্রু নিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদ
অঙ্গে মেখেছে !
ঘূর্ণি লেগেছে !

আজ চোখের আগে কেবল জাগে
মৌন দু'আঁখি !
পাতার রাশে পাতার বরন
বলছে কী পাখী
ওগো অকূল সাগর মথন করে
কি ধন জেগেছে !
ঘূর্ণি লেগেছে !

চৈত্র হাওয়ায়

এই চৈত্র হাওয়ায় চেতন পাওয়া
মন্দ নয়,—
যখন চাঁদের আলোর অঙ্গ ব্যেপে
চন্দনেরি গন্ধ কয়!
স্বর্ণ চাঁপার সুপ্ত মুখে
চুমার অঙ্ক আঁকতে সুখে
যখন আনন্দেরি অশ্রুজলে
আঁখি খানিক অন্ধ হয়।

কেন

আজি গোলাপ কেন রাঙা হয়ে
উঠল প্রভাতে!
হাজার ফুলের মধ্যিখানে
নূতন শোভাতে!
পক্ষ্মঘেরা আঁখির পাতে
স্বপন লেগেছিল রাতে,
চাঁদ বুঝি তায় চুমেছিল
নিশির সভাতে!
তাই সে অধর কাঁপছে, বুঝি
স্বপ্নে পাওয়া পরশ খুঁজি!
অরুণ হয়ে উঠছে সে কার
পরান লোভাতে!

তাই

আমি তাইতো বলি গোলাপ কলি
আজ কেন উৎসুক।
তার বুকের নীড়ে এল ফিরে
হারানো কোন্ সুখ!

আজ কোকিল ডেকে বল্‌লে তারে,—
আর ঘোমটা দিতে হবে না রে
ওই দেখা যায় বসন্তেরি
প্রসন্ন সেই মুখ !
শীতের শাসন টুটেছে আজ
মৌনী হিয়ার ছুটেছে লাজ,
গুঞ্জরিছে গোপন পুলক
মুঞ্জরে কৌতুক !

গোলাপ

আমি ছিনু শোভাহীন নিঃস্ব মরুদেশে,
আমি ছিনু বাব্‌লার সাথী,
প্রেমিক পথিক এসে মোরে ভালোবেসে
আমারে ফুটালে রাতারাতি !

রাঙা সে করেছে মোরে অনুরাগ দিয়ে
অশ্রু দিয়ে করেছে সুরভি,
করেছে সুষমাময় সোহাগে ঘিরিয়ে
পাগল সে পথভোলা কবি !

তাই আজি বুল্‌বুল্‌ গাহিছে নিয়ত
মধু-মদ-গন্ধে মাতোয়ারা,
ঘন পাপড়ির মাঝে মাতালের মত
মৌমাছি ফিরিছে দিশাহারা

তাই আজি দ্বন্দ্ব করি সমীরের সাথে
কুঞ্জে অলি করে গতায়তি,
সুরে সুরে মশগুল পাপিয়া সে গাঁথে
মোতিয়ার কুঁড়ি সনে মোতি !

দীর্ঘ জীবনের দিন গণিয়া গণিয়া,—
কাঁটার না দেখি অবসান,—
ভেবেছিনু সুখহীন সুখের দুনিয়া,
ছিনু তাই চির-ম্রিয়মাণ।

মানুষের প্রেমে আজি সফল জীবন
দুঃখ আর নাহি এক রতি,
গরবী গোলাপ আমি ভুবন-লোভন,—
কণ্টকের আমি পরিণতি!

গান

পিয়াও মোরে রূপের সুধা
রূপের সুরা পিয়াও তাই!
এক নিমেষের একটু হাসি
তাহার বেশী নাহি চাই।
এসেছি সব ভিন্ন পথে
ভিন্ন পথেই থাকব যেতে,
শুভক্ষণের সুখ-স্মৃতি,—
তাই যেন গো পাই।
আঁখির সুধা বৃষ্টি কর,—
দিনে স্বপন সৃষ্টি কর,
হাসিতে ফুল ফুটাও গো,—যার
হয় না কোনো তুলনাই!
স্বর্গসুধার,—হে অপ্সরী!
একটি কণা যাও বিতরি';
তোমার পারিজাতের মালার
একটি শুধু পাপড়ি চাই!

জ্যোৎস্না-অভিষেক

ওগো রানী! তোমার আজি জ্যোৎস্না-অভিষেক
সজ্জা রাখ, লজ্জা রাখ,—চন্দ্রমা নির্মেঘ!
অলকগুলি বাতাস ভরে
দুলুক তোমার ললাট 'পরে,
উথলি লাবণ্য-বারি অন্ধ করি দিক ক্ষণেক!
মর্ত্যলোকের দৈন্যরাশি
ঘুচাক,—চাঁদের দিব্য হাসি,
তোমার হাসি করুক প্রাণে চন্দন-নিষেক!

করবী

দূর হতে আমি গোলাপেরি মত ঠিক!
তবু আমোদিত করিতে পারি নে দিক!

গোলাপেরি মত অতুলন মম হাসি,
তবু হায় অলি ফিরে যায় কাছে আসি'!

পথের প্রান্তে ফুটে আছি অহরহ,
গোলাপের মত রচিতে পারি নে মোহ!

ভালোবাসা মোর রাখিনি কাঁটায় ঘিরে,
সুলভ প্রেমের দুর্দশা তাই কিরে!

গোলাপের মত কণ্টকী নই শুধু,
তাই কি এ বুকে জমে না গোলাপী মধু!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ,
আমি মাতালের রক্তচক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত।

আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো,
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো !
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিঁকে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায় !
গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞজনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল !
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভরি দরে !
গোলাপ কিসের গৌরব করে ?
আমার কাছে সে ফিঁকে ;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিকে !

গান

কাঁটা বনে কেন আসিস্ জোনাকী—
অন্ধকারে ?
বুঝি এ নিশায় প্রাণ দিতে, হায়,
হয় তোমারে !

ফুল তো হেথায় হাসে না,
ভুলেও ভ্রমর আসে না,
শুধু কাঁটা এ যে আগাগোড়া ভিজে
অশ্রুধারে !

স্রোতের ফুল

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল !
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল।
যুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল !

অভিমানের আয়ু

যখনি বেদনা পাই ভাবি দূরে চলে যাই
উঁচু করি মানের নিশান,—
মমতা চোখের জলে ধুয়ে মুছে যাক চ'লে
একেবারে হ'ক অবসান।

বেলা না পড়িতে হায় রাগ তবু পড়ে যায়
ব্যাকুল হইয়া ওঠে প্রাণ,
ব্যথা-সচকিত মনে সে বুঝি নিমেষ গণে,
এখনো কি রাখা যায় মান !

বাসি ও তাজা

হায়, নিশি শেষের মলিন ফুলহার !
ধূলায় ফেলে গেল চলে
কণ্ঠে ছিলে যার !

ছিন্ন ডোরে ফুলের রাশি
সবাই কিছু হয়নি বাসি,
সবাই তবু সমান হ'ল
ধূলায় একাকার !
সবাই তবু ক্ষুণ্ণ মনে
রইল চেয়ে অকারণে,
কেউ নিলে না, ঠাঁই দিলে না
বক্ষে আপনার !
গন্ধ কাঁদে পুষ্পপুটে,
শুভ্র হাসি ধূলায় লুটে,
মরমী কেউ নাই রে ধরায়,
বিফল হাহাকার।

গান

বঁধু আমার শুধু তুমি
নয়ন তুলে চাও ;
তোমার মধুর দৃষ্টি, আমার
দৃষ্টিতে মিলাও !
সোহাগ, হাসি, মধুর বাণী,
ভাগ্যে আমার নাই সে, জানি ;
আঁখির সাথে আঁখির মিলন
ঘটবে নাকি তাও !

জলের আলপনা

জলে এঁকেছিলাম ছবি—
লুকাল সে এক নিমিষে ;
নয়ন-জলে এঁকেছি যায়
সে ছবি হায় লুকায় কিসে !

গান

কারো আঁখি তুলে চাইবারো, আর,
নাইক অবসর !
কারো চক্ষে পলক পড়ে না, হায়,
দৃষ্টি—সে কাতর !
কেউ চিনতে নাহি চায়,
কেউ ভুলতে নারে, হায়,
কেউ নূতন পাড়ি জমায়, কারো
নাই কোনো নির্ভর

ভগ্নহৃদয়

একজনে ভুলেছে যখন
আরেক জনেও ভুলবে গো !
চিতার কালি ডুবিয়ে দিয়ে
সবুজ তৃণ দুলবে গো !
নগ্ন-বনে শীতের শেষে
ফাগুন ফিরে আসবে হেসে,
সবুজ শাখে অবুঝ পাখী
নূতন ধ্বনি তুলবে গো !
কালিন্দী আর গঙ্গাধারা
দীর্ঘ পথের সঙ্গী তারা,—
ভুলবে তারাও পরস্পরে
যুক্তবেণী খুলবে গো !

পুরানো প্রেম

ভুলব ভেবে ভুল করেছি,
ভোলা অত সহজ নয় ;
অনেক দিনের অনেক দুখের
ভালোবাসায় অনেক সয় !
পরশখানি বুকের কাছে
এখনো হায় জড়িয়ে আছে,
ছড়িয়ে আছে সবার মাঝে,
জড়িয়ে আছে জগৎময় !
হাসি খেলায় চোখের জলে
জড়িয়ে আছে নানান ছলে,
শুনলে পরে মধুর স্বরে
হঠাৎ মনে তারেই হয় !
জড়িয়ে আছে ফুল তোলাতে,—
শ্রাবণ নিশির হিন্দোলাতে,
তন্দ্রাময়ী জ্যোৎস্না সাথে
স্বপ্নে এসে কথা কয় !

গান

আহা কারে দেখে আঁখিতে আর
পলক পড়ে না ?
সে তো চলে গেল চেয়েই,—যেন
নাহিক চেনা !
বাধা পেয়ে মনের কথা
রয়ে গেল মনেই গাঁথা,
অভিমানে অন্ধ হিয়া,
অশ্রু ঝরে না !

মধু ও মদিরা

বাঞ্ছিত ধন পেলে না ? তবু তো
সঙ্গী পেয়েছ, হায় !
মধু মিলিল না ? পাত্র তোমার
ভরি' লহ মদিরায় !
ব্যথার চিহ্ন দিয়ো না লাগিতে,
অশ্রু নিবারো উতরোল গীতে,
অধরের হাসি নয়নের আলো
নিবিয়া যেন না যায় ।
থাক তুমি থাক চিরদিন সুখে,
থাক কৌতুক-বিকশিত মুখে,
গরল ভখিয়া পাগল কে হ'ল
কি ফল ভাবিয়া তায় ।

প্রেম-ভাগ্য

ভালোবেসে কাছে গিয়ে ফিরেছিস ব্যথা নিয়ে
অশ্রুভারে কেঁপেছে নয়ন,
শুকায়ে উঠেছে হাসি শুকায়েছে পুষ্পরাশি
বাসি হয়ে গিয়েছিস, মন !
অকালে দিয়েছে দেখা ভালে দুর্ভাবনা-লেখা,
মন তুই হয়েছিস বুড়া,
আর পাগলের প্রায় ফিরিস্ নে পায় পায়,
নিরালায় জুড়া তুই জুড়া ।
ভালো যারা বাসিবার বাসুক্ বাসুক্, আর
ভালোবাসা-পেয়ে খুশি হোক্,
ভাঙা তরী বেয়ে বেয়ে তাদের পিছনে ধেয়ে
তুই মিছে রাঙাস নে চোখ ।

ব্যথা পেয়ে অভিমানে ব্যথা তুই কারো প্রাণে
দিস্‌নে রে ফেলিস্‌ নে শ্বাস,
কিবা উন্মাদের মত ওরে চির প্রেম-ব্রত !
করিস্‌নে প্রেমে পরিহাস।
চলে আয় চলে আয় পায়ে কাঁটা দলে আয়
কোলাহল ছেড়ে একা বোস্‌,
ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া যায়া ফেরে এ দুনিয়া
তুই রে তাদের কেউ নোস্‌।
যে ফিরেছে দেশে দেশে আজীবন ভেসে ভেসে
অতলের কোলে তার ঘর,
ছল ছল আঁখি যার পরান সরস তার
তার কাছে মরণ সুন্দর

প্রেমের প্রতিষ্ঠা

তবে রচনা কর
ওই গগন 'পর
হায় প্রেমের লাগি'
পাত আসন, ও !
যদি ধরণী 'পরে
প্রেমে ম্লানিমা ধরে
যদি বিরূপ আঁখি
করে শাসন, ও !
যদি সাধের মালা
ফেলে চলিয়া যায়,
প্রেম ভুলিয়া যায়,—
যদি বাহুর পাশ
মানে রাহুর গ্রাস
কঠিন ফাঁস,

যদি আঁখির দিঠি
আঁখি সলিলে ছায়,—
তবে ফিরাও আঁখি
হায় ব্যথিত পাখী
তুমি ফির একাকী,
ওই নীল পাথারে
দাও নিবেদিয়া, রে!
ওই ব্যাকুল হিয়া
কল- ভাষণ, ও!

গান

হায় ভালোবাসার আলয় সে যে
চির স্বপনে!
আমি বাঁধিতে তায় চেয়েছিলাম
জীবন-পণে।
সে সুখের বুকে কেঁদে উঠে
দুখের পায়ে পড়ল লুটে,
জ্যোৎস্না-রাতে এসে, মিশে
গেল তপনে!

তোড়া

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া,
বৃন্তগুলি জরির সুতায় মোড়া!
পরশ কারো লাগলে পরে পাপড়ি পড়ে খুলে,—
তবুও আগাগোড়া;—
চৌকী দিতে পারলে না চোখ জোড়া;
দুধের বরন, মধুর বরন, মদের বরন ফুলে
বেঁধেছিলাম তোড়া!

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান!
হাল্কা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙেচুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধু তান!
মধুর মত, মদের মত, দুধের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মত, মদের মত, অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো!
নিশাসখানি পড়লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরাল!
নিবে গেল নিমেষহারা আলো!
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

একের অভাব

পুরানো মোর মরম-বীণায়
একটি তার আর বাজে না রে;
একটি তারের নীরবতায়
বিকল করে সকল তারে!
যে সুর বাজাই বেসুর লাগে,
কোথায় যেন কসুর থাকে;
জমে না হায় গান থেমে যায়
পরান-ভরা হাহাকারে।

বর্ষ-বিদায়

আমের মুকুল ঝরিয়া আজিকে মিশিছে নিমের ফুলে,
ম্লান হাসিটুকু কাঁপিছে অধরে অশ্রু আঁখির কূলে!
প্রাণ করে হায় হায়,
বরষের পথ সঙ্গে যে ছিল সে আজ চলিয়া যায়।

কত না তারার খণ্ড-জোছনা কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত ভ্রূণ আঁখি চেয়ে আছে কত তিক্ত-মধুর স্মৃতি;
কত আশা কত ভয়
কতই গরব, কত সে কুণ্ঠা,—ফুল-কণ্টকময়।

বকুল ঝরিয়া যায় গো মরিয়া পিছনে কিছু না রাখি',
সারা যামিনীর সাথী যে প্রদীপ স্তিমিত তাহার আঁখি:
বুক ভরে হাহাকারে,
লুতার লালায় লিপ্ত কুঁড়িটি পাপড়ি মেলিতে নারে।

কিশোর আশার কিশলয় ভেঙে স্মৃতি আজ বাঁধে নীড়,
দুর্বল মনে সংশয় আর দুর্ভাবনার ভিড়;
ব্যসন কলহ, ক্লেশ
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের বিষ-ভরা বিদ্বেষ।

অঞ্জলি করি' সুন্দরী ঊষা যে সোনা গেছিল ঢালি'
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে সকলি কি হ'ল কালি?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল শেষে অশ্রুজলের মত আগাগোড়া লোনা?

অতসী-অশোক গাঁথিতে কি হায় গেঁথেছি অপরাজিতা?
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা?
বিশ্ব কি বিস্বাদ?
একি ভুল নয়?—এই বিষময় মোহময় অবসাদ?

ঝরা ফুল পাতা মাটি হয়ে যায় জাগে তায় অঙ্কুর,
মৃত্যু প্রবল করে উজ্জ্বল জীবনের ক্ষীণ সুর।
ওরে নাই নাই শোক,
ত্যজিছে আবার অনন্ত তার বরষের নির্লোক।

ঘণ্টা পড়েছে নাট্যশালায় নূতন পর্দা উঠে!
নব নব নীড় উঠিছে গড়িয়া শামুকের দেহ-পুটে!
পুরাতন অবসান,
তারার কিরণ-সঙ্গমে ফিরে আজিকে পুণ্য-স্নান!

নব-জীবনের বিদ্যুৎ—সে যে বেদনার বুকে খেলে,
শিকড় কাটিতে ভয় নাহি যার সফলতা তারি মেলে!
মরণ মরণ নয়,
জীবন-শিখার গোপন আধারে ক্ষয়হীন সঞ্চয়।

নিমফুল আর আমের মুকুল চুমে আজ ধূলিকণা,
তিক্ত আভাসে বক্ষে ধরিছে মধুর সম্ভাবনা;
পুরানো চলিয়া যায়,
অশ্রু-সজল মৌন পরান নূতনের পথ চায়।

বর্ষ-বরণ

এস তুমি এস নূতন অতিথি!
উষার মতন প্রদীপ জ্বালি';
রৌদ্র এখনো হয়নি অসহ
এখনো তাতেনি পথের বালি।
মধুযামিনীর জোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েছে মহুয়া ফুল,
তোতার তুতিয়া রঙের নেশায়
বনভূমি আজ কী মশগুল!

রেশ্‌মী সবুজে সাজে দেবদারু
পশ্‌মী সবুজে রসাল সাজে,
আবৃত ধরার কিশোর-গরব
সবুজের মখ্‌মলের মাঝে।
কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া,—
পড়ুক ঝরিয়া নাহিক ক্ষতি ;
হালকা হাওয়ার দিন সে ফুরাল,
উদিল জীবনে তপের জ্যোতি।
বসন্ত আজ মাগে অবসর
যৌবন-শোভা পড়িছে ঝরি' ;
চির-নবীনের ওগো নবদূত !
তোমারে আজিকে বরণ করি।
এস গো মৌন ! মর্ত্য-ভবনে
নীরব চরণে এস গো চ'লে,
তন্দ্রা-তরল স্বচ্ছ আঁধার
উঠিছে দুলিয়া হাওয়ার দোলে।
ওগো পুরনারী ভরি' হেমঝারি
চন্দন-বারি ঢালো গো ঢালো ;
শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় উষার আলো।
এস গো নূতন ! রাজার মতন
এস আলোকের চতুর্দোলে ;
অশোকের ফুলে বুলে মধুকর
আমের কুঞ্জে কোকিল ভোলে।
আদি প্রভাতের প্রসন্ন প্রভা
পরানে আবার বিলাও আনি,
ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন
পুরানোর পরে পর্দা টানি !

বাসি স্বপনের কজ্জল-লেখা
হয়তো নয়নে রয়েছে লাগি,
তাম্বুল-রাগ রয়েছে অধরে,
সে ত্রুটির ক্ষমা নীরবে মাগি।
মঙ্গলারতি করিছে পাখীরা
চামেলি বরিষে লাজাঞ্জলি,
পুণ্যাহ! ফিরে এস গো জীবনে
প্রভায় ভুবন সমুজ্জ্বলি।
উঁচু সুরে বেঁধে তুলেছি সেতার
বাজাও তাহারে যেমন খুশি,
দীপকে, বাহারে, মেঘে, মল্লারে,
কখনো হাসিয়া কখনো রুষি'।
চন্দন-লেখা দ্বারে দ্বারে আজি
বন্দন-মালা দুলিছে বায়ে,
পেয়ারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়িছে দখিনে-বাঁয়ে।
উৎসব-সুরে বাঁশী বাজে পুরে
অতিথি আলয়ে এস হে তবে,
সাক্ষী দেবতা, তোমায় আমায়
সপ্তপদীর অধিক হবে।
রৌদ্র তখন রহিবে না মৃদু,
তাতিয়া উঠিবে পথের বালি,
তবু এস তুমি, অজানা পথিক!
আশার রতন প্রদীপ জ্বালি।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ ক্লিষ্ট মর্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ-কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি ;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা' সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি ;
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব !
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্যেরি সৌরভ।

বকুল

বোঁটায় বাঁধন অনায়াসে খুলি সহজে ঝরি ;
আমরা বকুল অতি ছোটো ফুল ধূলায় মরি !

আমরা হাসিনে ভুবন ভরিয়া রূপের জাঁকে,
সহজে মাটির মত হই, তবু গন্ধ থাকে।

রসের যোগান—বোঁটায় সে নাই বুকেতে আছে,
তাই থাকে বাস জীবনে-মরণে,—আগে ও পাছে।

কমল শুকালে সেও দেয় ।।ড়া ঘাসের বাসে,
আমরা শুকাই—ধূলা হই, তবু, গন্ধ ভাসে ।

নিজে আছি পূরা নিজে মশগুল দিবস রাতি,
আমরা বকুল ছোটো ফুল,—নাই রূপের ভাতি ।

আনন্দ ফুল

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হয়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ-আলিঙ্গনে !
বিষাদের বিষ ভরিয়া পেয়েছি
গরলের নীল রুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু
হয়েছে পাথর-কুচি ।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে
রুদ্রেরি পূজা করি,
আধ-নিমীলিত পাপড়ি আমার
ঢুলুঢুলু আঁখি স্মরি' ।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া
সর্পের আনাগোনা,—
আমি তারি সনে আছি একাসনে ;—
পেয়েছি প্রসাদ-কণা !

শিরীষ

মাথার উপরে সূর্য জ্বলিছে
ঘিরিয়া রয়েছে তপ্ত হাওয়া,
কৃচ্ছ্রসাধন জীবন আমার
শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া ।

মৌমাছিটিরে দিতে পারি ছায়া
এমন আমার পাপড়ি নাহি ;
হায় ! শিরীষের দৃঢ় বন্ধন !
সুলভ মরণ পাইনে চাহি'।

আশার পাপড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশর রূপে,
মধুপানে এসে মৌমাছি শেষে
মূরছি' পড়িল ধূলির স্তূপে ।

দুঃসহ দুখে কলিজা ছিঁড়িয়া
বাহিরায় যেন রক্ত নাড়ী,
পলক পড়ে না রক্ত আঁখিতে
তবু তো জীবন গেল না ছাড়ি !

একি বেঁচে থাকা—এই কি জীবন ?—
বুঝাতে বেদন নাহিক ভাষা ;—
চিতার অনলে অরুণ আরাম,
মরণের বুকে অ-মৃত আশা ।

পুষ্পের নিবেদন

ওগো কালো মেঘ ! বাতাসের বেগে
যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ভেসে ;
নয়ন-জুড়ানো মূরতি তোমার,
আরতি তোমার সকল দেশে !

আকাশের পথে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
পিপাসা বাড়ায়ে যেয়োনা চ'লে,
গদগদ ভাষে কি কহ ?—আভাসে
পারি না বুঝিতে, যাও গো ব'লে !

কি বেদনা, মরি, গুমরি গুমরি
উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে ?
তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা জুড়াও
দাঁড়াও ভুবন-ভুলানো বেশে।
করুণ তোমার কালো আঁখি হতে
দুটি ফোঁটা জল পড়িল ঝ'রে !—
ব্যথা পাও যদি, তবে, কেন যাও ?
দাও গো মোদের পরান ভ'রে।
আঙুর-দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন-বুলানো হাওয়া,
হে চির-শরণ ! জীবন-মরণ !
তোমার পানে যে যায় না চাওয়া !
হের পাণ্ডুর বনভূমি আজ,
পাখীদের সুরে কত কাকুতি,
বজ্রের ভয় রাখে না কেবল
কামিনী, কদম, কেতকী যূথী !
ওগো কালো মেঘ ! দাঁড়াও দাঁড়াও,—
বারিক দাঁড়াও যেয়ো না ভেসে,—
ধূলায় মলিন, পিপাসায় ক্ষীণ
দগ্ধ-জীবন-দিনের শেষে।
কদম আবার উঠুক পুলকি',
কেতকী উঠুক কণ্টকিয়া,
কামিনীর শাখে যে স্বপন জাগে
তাহারে সফল করগো পিয়া।
গভীর তোমার কাজল নয়নে
ছলছলি' জল পড়িছে এসে,
তপ্ত বনানী ঢাকিছে তোমায়,—
দাঁড়াও ক্ষণেক ফুলের দেশে।

কালো

হায় সখী কালো ভালোবেসে ফেলেছি !
কালো যমুনারি জলে প্রাণ ঢেলেছি !
বিজুলি-জুড়ানো রূপে
আমি যে গিয়েছি ডুবে,
কালো আঁখি-তারা ল'য়ে আঁখি মেলেছি ।

নব মেঘোদয়ে

কপোত ! উড়িয়া যা রে শুভ্র পাখা মেলি'
প্রচ্ছায় মেঘের নীল ঘন পক্ষ-তলে,
ডুবে যা' মিশে যা' তুই সুখে কর কেলি
অস্খলিত পরিণত বৃষ্টি বিন্দু-দলে ।
পাণ্ডুর তালের শ্রেণী হোক রোমাঞ্চিত,
ভয়ে পাংশু হোক ধরা ; কিবা ক্ষতি তায় ?
আছে যার উড়িবার সোয়াদ বিদিত
উড়িবে সে না ডরিয়া বজ্র-বেদনায় ।
নয়ন জুড়ায়ে দেবে নব নীলাঞ্জন,
পাওয়া যাবে সারা দেহে চকিত পরশ ;
শিহরি' বাদল হাওয়া দিবে আলিঙ্গন
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া অমৃতের রস !
ভবন-বলভী-তলে এ হেন সময়ে
কে রহিবে সুপ্ত, হায়, নব-মেঘোদয়ে !

নব পুষ্পিতা

আহা ! ওইখানে তুই থাকিস্ ! ও জুঁই
লুকাস্ নে খানিক !
তোর জ্যোৎস্না-হানা হাসিতে আজ
ফুটল কি মানিক !

নূতন যেন দেখিস্ ধরা,—
বিনি-মদের নেশায় ভরা!
সাঁঝের কুঁড়ি! সৌরভে তোর
ভুবন অনিমিখ!

জুঁই

বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে খুলেছে কল,
চল্ সখী মোরা তরুণ এ তনু জুড়াই চল্।

শিথিল করে দে সবুজ আভিয়া, আজ বিকালে,
কিসের সরম মেঘে ঘেরা এই রঙমহালে?

আঁধার কানন আলো করি আয়, বন-জোসিনী
আয় সুবাসিনী, আয় গো অমলা, সন্তোষিনী;

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলেছে চাবি,
ঘোমটা খুলিতে নয়ন মেলিতে আর কি ভাবি?

দুয়ারে দাঁড়ায়ে সংকেত করে সন্ধ্যা-দূতী,
প্রাবৃটের রঙমহাল-বাসিনী রূপসী যুথী!

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলে দে কল,
বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে চল্ গো চল্!

কেলি কদম্ব

মেঘলা মেদুর আলো স্মৃতির ভুবনে,
যেথায় কালিন্দী ধারা বয়ে যায় ধীরে,
আমি ফুটি সেইখানে; সজল পবনে
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে।

আমারে ঘিরিয়া চির রাস-রসোল্লাস,
প্রতি রোম-কূপে মোর মিলন-মাধুরী ;
সুষমা-সৌরভে মিল,—অপূর্ব বিকাশ,
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি !

পুলক-অঙ্কিত আমি জনমে জনমে,
স্মরণ-সরণী 'পরে, প্রাবৃটের পুরে !
মিশায়েছি গোরোচনা চন্দনে বিভ্রমে,—
মেখেছি ললাটে তাই—দেখেছি বন্ধুরে !

ওগো বন্ধু ! ওগো মেঘ ! শ্যামল ! শীতল !
আমি চির আনন্দের অখণ্ড-মণ্ডল।

"পূরবৈঞা"

বহিছে পূরব হাওয়া পূরবী তানে !
ক্লান্ত আঁখিতে সুখ-তন্দ্রা আনে !
সাঁঝের স্বপন লাগে মেঘের রাশে,
আধ-সুখে ভরে বুক আধ-তরাসে !
গুরু গরজন,
ধারা বরষণ,
হরষে রসায় তরু-লতা-বিতানে !

শ্রাবণী

নব গৌরবে রজনীগন্ধা কুসুমদণ্ড তুলিল !
শাখায় শাখায় সুখ-সৌরভে নব কদম্ব দুলিল !
আকাশে বাতাসে সলিল-কণিকা নাচে গো,
কামিনী-যুথীর উরসে মরণ যাচে গো ;
ঝিল্লীমুখর পল্লীভবন, স্বপ্নভুবন খুলিল !

কামিনী ফুল

ক্ষণিক বরষণে সজল পরশনে
ফুটি গো বনে বনে কামিনী ফুল ;
সাঁঝের অবসরে ক্ষণেক বায়ুভরে
দুলি গো শাখা 'পরে দোদুল্ দুল্ !

ক্ষণেকে যাই টুটি' ধূলিতে লুটোপুটি,
অমল দল ক'টি ধরণী চুমে ;
ক্ষণিক ফুল আমি টিঁকিনে দিন যামী,
নিমেষে ভরে আঁখি মরণ-ঘুমে।

ফুটি গো আঁখিজলে শ্মশান-ভূমি-তলে,
আঁখির ছলছলে ঝরি নিমেষে ;
সমাধিতটে আসি' উদাসী কাঁদি হাসি
বরষি সুধা রাশি স্মৃতির দেশে।

আমারি মত ফুটে নিমেষে যারা টুটে
তাদেরি সাথী হয়ে রয়েছি একা ;
সুরভি আঁখিজল,—ঝরি গো অবিরল,—
স্মরণ-সুমধুর—মমতা-লেখা !

সুখ-বেদনা

কেন ফুলের মুখে হাসি দেখে
মেঘের চোখে এল জল ?
কোন্ কথা তার জাগ্‌ছে মনে ?
বল্ তো তোরা আমায় বল্ !
সত্যি কি গো সুখের ব্যথা
জাগায় প্রাণে বিহ্বলতা ?
তবে সে কি নয় কো শুধুই
কাব্য-কথা—কথার ছল !

কেতকী

অর্ঘ্য লয়ে যুক্ত করে ঊর্ধ্ব মুখে আছি প্রতীক্ষায়,
আমারে সার্থক কর, ওগো প্রিয় মৌন-মনোহর !
কণ্টকী কেতকী আমি, ফুটেছি কাঁটার বনে, হায়,
তবুও করুণা তুমি কর মোরে ভীষণ-সুন্দর !

ফুটেছি কাঁটার বনে সাপের শাসনে করি বাস,
অজস্র অশ্রুর মাঝে দিনে দিনে হয়েছি লালিত ;
চৌদিকে শ্বসিয়া উঠে ভুজঙ্গের গরল নিশ্বাস,
সদা সশঙ্কিত প্রাণ, স্পন্দমান, নেত্র মুকুলিত ।

সুচির সন্ধ্যায় ঘেরা দৃষ্টিহারা ম্লান মহীতলে,
তোমারি ধেয়ানে থাকি গন্ধভরা তন্দ্রাধূপ ধরি' ;
মেঘের পরাগ ঝরে, ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকা সে জ্বলে,
কুণ্ঠিত এ প্রাণ মোর রসের রভসে ওঠে ভরি' ।

সুরভি সুষমা আর কাঁটা লয়ে জন্মেছি জগতে,
পেলব-পরুষ আমি, অবিদিত নহে সে তোমার,
তবুও সার্থক করি' লও ওগো লও কোনোমতে
কণ্টকের কুণ্ঠা সনে সৌরভের গৌরব আমার ।

দুধে-আলতা

এই দুধ-পাথরের বুকে রাখ
রক্ত-কমল পা' দুট,
এস দুধ-পাথারের লক্ষ্মী ! এস
ক্ষীর সাগরে পদ্মটি !

এস মূর্তি ধ'রে নয়ন 'পরে
আশৈশবের কল্পনা !
এই শূন্য ঘরে পড়ুক আজি
আলতা-পায়ের আলপনা !

ওগো পাথরের এই ঠুন্‌কো থালায়
চরণ রাখ, নেইক ভয় ;
এই নিটোল পাথর অটল আদর
ঠুন্‌কো হলেও সইবে ভর !

যারে বইতে কভু হয়নি ক' ভার
তোমার ভার সে বইবে গো,
এই ইচ্ছা-সুখের হাল্‌কা বোঝা
অনায়াসেই সইবে গো !

দুধে ভিজিয়ে তোলো ঘুঙুরগুলি
পাঁয়জোরে জোর বলবে না,
ওগো নইলে পরে দশের ঘরে
মিলন-আশা ফলবে না !

তুমি ভরা ঘটের ভার নিয়েছ,
আমের কচি ডাল তাতে,
ওগো বিধির বরে নূতন ঘরে
মিলাও দুধে-আলতাতে !

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল !
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,

মাছরাঙা চায় শিকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল ;
তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল।
তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে !
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রঙ আলোক জলে,
লুব্ধ করে মুগ্ধ করে
বৌ-কথা কও কেবল ডাকে ;
আর হাল্‌কা বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে।
তার সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল !
নীলাম্বরির বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্ লাগল মেঘে,
কানে জোড়া দুল দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল ;
তার সরু সিঁথায় সিঁদুর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল !
সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদ-মালা তার ভাসতে থাকে !

জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে,
কল্‌মি-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে ;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাসতে থাকে।

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুল্‌টি শুকায়,
বিনিসুতার হার সে গড়ে,
দোলনচাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
সে বেণীতে দেয় বকুল মালা
বিনিসুতার হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদলে পরে মুক্তা ঝরে
হাসলে পরে মানিক হাসে !
কেরল কাঠের নৌকাখানি
জানে নাক' তুফান পানি,—
কুল্‌কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
নুইয়ে মাথা আশেপাশে ;
যদি সে উঁতি 'পরে চরণ পড়ে
হয় সে সোনা অনায়াসে !

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায়
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে!
অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি'-
তারে দেখতে পেলেই করবে রানী
শুঁড়ে তুলে তুলবে মুড়ে!
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরান ব্যেপে ভুবন জুড়ে!

সুধা

সুধা আছে গো কোথা?
কেবা জানে বারতা?
আছে কোন্ সুদূরে—
কোন্ স্বরগ-পুরে!

হায় কোন্ নিঝরে
সুধা নিয়ত ঝরে?
সে কি হরে গো ক্ষুধা—
সেই স্বরগ-সুধা!

সে কি পিপাসা হরে?
সেকি অমর করে?
হায়! তাহারি তরে
মন কাঁদিয়া মরে।

আমি শুনেছিনু রে
সুধা আছে সুদূরে
কোন্ স্বরগ-পুরে,
তাই মরেছি ঘুরে।

ঘুরে মরেছি একা,
তবু পাইনি দেখা!
শেষে তোমারে পেয়ে
প্রাণ উঠিল গেয়ে!

করি তোমারে সাথী
চোখে জাগিল ভাতি!
মোর টুটিল রাতি
মন উঠিল মাতি'।

সুধা ছিল নিঝুমে,—
বুঝি মগন ঘুমে,—
তব প্রথম চুমে
এল মরত-ভূমে!

সুধা নিল সে হরি'
দিল অমর করি'
সুধা পড়িল ঝরি'
এই ভুবন 'পরি!

সে যে নিকটে আছে,—
আছে তোমারি কাছে,—
আগে জানিনি তাহা,
ঘুরে মরেছি আহা!

সুধা স্বরগে আছে
আছে তোমার কাছে ;
তবে, স্বরগ-ভূমি
সে কি ! তুমি গো তুমি ।

সুধা অধরে রহে,
শুধু স্বরগে নহে,
তাই জগত বাঁচে,
মোর হৃদয় নাচে !

সুধা আছে তোমাতে,
আছে মিলন-রাতে ;
সুধা প্রথম চুমে
নেমে এসেছে ভূমে ।

আমি জানি বারতা,
আমি জানি সে কথা,
চির- নীরব স্রোতে
সুধা বহে মরতে ।

তাই শিশুরা হাসে,
চাঁদ হাসে আকাশে,
তাই ফাগুন আসে
ফিরে বনের পাশে !

সুধা মিঠার মিঠা !
ফুল- মধুর ছিটা !
সুধা পরান ভরে,
সুধা নিঝরে ঝরে !

সুধা হয়ে অবসাদ,
হয়ে সকল বিষাদ ;
সুধা দেবতার সাধ,
সুধা অগাধ ! অগাধ !

গান

আমার যাহা ছিল আপন ব'লে,
আনিয়া দিয়াছি ও চরণতলে।
এ তনু মন ভরি'
এবে বিহরে, মরি,
তোমারি সৌরভ শতেক ছলে !

কৃষ্ণকেলি

পরীর ছেলেরা বিনিসুতে যবে ওড়ায় ফড়িং-ঘুড়ি
দুপুরের সেই আলোকের পুরে আমরা অফুট কুঁড়ি ;
সন্ধ্যার হাওয়া বহিলে ভুবনে তবে সে ঘোমটা খুলি,
আঙিনার কোলে ভাঁজে ভাঁজে খোলে রঙীন পাপড়িগুলি !
আমরা কৃষ্ণকেলি,
কাহারো পরনে জর্দা তসর কাহারো বা রাঙা চেলি !

আকাশ-বাহিনী মন্দাকিনীর সোনার কিনার জুড়ি'
পরীর মেয়েরা মিলিয়া গুঁড়ায় পঞ্চবরন গুঁড়ি ;
সোনার পইঠা 'পরে বসি' তারা প্রজাপতি ব্রত ক'রে
পঞ্চবরন মাথায় যখন প্রজাপতি ধ'রে ধ'রে ;—
তখন নয়ন মেলি,
পঞ্চবরন ঘাঘরিতে সাজি কিশোরী কৃষ্ণকেলি।

চাঁদ হেন বর আসে গো যখন শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা-বালিকা কপালে কপোলে ক'নে-চন্দন পরে,
সবুজ ডুলিতে আসি মোরা সবে বর বরণের লাগি'
এয়োর কর্ম আমরাই করি আমরা বাসর জাগি!
আমরা কৃষ্ণকেলি,
সন্ধ্যামণির সঙ্গিনী মোরা আঁধারে নয়ন মেলি।

পুষ্প-মেঘ

ওগো শরতের শুক্ল শশী!
কোন্ দেশে আজি দৃষ্টি তোমার
কি ভাবো না জানি একেলা বসি'!
তোমার অমল অমেয় অমিয়া
মেঘ-মল্লিকা হতেছে জমিয়া,
আমি চেয়ে আছি,—অমৃত-খণ্ড
ভূতলে কখন্ পড়িবে খসি'!
দূরে দূরে তারা স্বপনে মিলায়,-
কত ভঙ্গীতে, ছন্দে লীলায়!
নিশিদিশি তারা দেশে দেশে বুঝি
মন্দার-কলি যায় বরষি'!
ওগো নিশীথের মৌন শশী!

শরতের প্রতি

হৃদয়-জয়ের বাজিয়ে বাঁশী
দিগ্বিজয়ী! কোথায় যাও?
দাঁড়াও, তোমায় দেখি খানিক,
নয়তো আমায় সঙ্গে নাও!

ডাক দিয়েছ একেবারে
সকল ঘরের দ্বারে দ্বারে,
কুবের-পুরীর সোনার রাশি
দ্বারে দ্বারেই লুটিয়ে দাও!
আর্দ্র মেঘের স্নিগ্ধ কোলে
বিদ্যুতে ঘুম পাড়াও ছলে,
সোনার তুলি বুলিয়ে ধানে
ঢেউয়ের তানে দুলিয়ে যাও!
পদ্মফুলের মধ্যিখানে
হঠাৎ হলে মগন ধ্যানে,
কুড়িয়ে পেয়ে পরশমণি বিলিয়ে দিলে হায় গো তাও!
দিগ্‌বধূরা তোমার তরে
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া ধরে,
কাশের কুসুম হেলায় চামর
বন্ধু! হেথায় বারেক চাও।

পদ্মের প্রতি

যখন প্রথম প্রভাত-রবি
দৃষ্টি হানে তোমার 'পরে,
বল দেখি কমল! তোমার
প্রাণের ভিতর কেমন করে?
সকল মধু-গন্ধ-হাসি
প্রাণের অস্ফুট স্বপন রাশি
ফুটতে গিয়ে একেবারে
ওঠে নাকি অশ্রু ভ'রে?

আমি আপন হৃদয় দিয়া,—
বুঝতে পারি তোমার হিয়া,—
বুঝতে পারি আলোয় প্রেমে
কমল হৃদয় জীয়ে মরে।

লীলাকমল

মৃত্তিকা সাথে বাঁধা আছি আমি
জলেরো সঙ্গে আছি,
তবু আলোকের মুক্তি-লোকেতে
পৌঁছিয়া যেন বাঁচি!
মৃণালের ক্ষীর সম্বল করি'
সলিল ফুঁড়িয়া উঠি,—
নিশ্বাস রুধি' দীর্ঘ যামিনী
কঠিন করিয়া মুঠি।
অরুণের মৃদু পাণির পরশে
পরান ভরিয়া ওঠে,
শিথিলিয়া মুঠি আলোকের দান
শতদল হয়ে ফোটে!
ধ্যানের দেবতা প্রাণে আসে মোর
ধারণায় মিশে ধ্যান,
অনুভবে জানি পাঠায়েছে রবি
আলোর অভিজ্ঞান!
উষারানী আসি আল্‌তা পরায়
ডালিমের রাঙা রসে,
শফরী লীলায় সমীর প্রবাহ
শরীরে পরানে পশে!

সবুজ টগর টোপা পানাগুলি
দীঘির বুকেতে সাজে,
হিল্লোল-তালে সলিল-আলয়ে
হিন্দোল রাগ বাজে !

ঢেলে যায় রবি ধ্যানের সুরভি
গভীর এ মম মনে,—
অসেচ হরষ অমূর্ত রস
আলোর আলিঙ্গনে।

অতি অদ্ভুত মৃদু বিদ্যুৎ
উঠে মুহুঃ রণরণি'
হৃদয়ে চরণ রাখেন দেবতা,—
পদ্মের মাঝে মণি !

তার পরে ধীরে আকাশ মুকুরে
আলো হয়ে আসে আলা,
ঝরে যায় দল, জীবনের শুধু
অবশেষ জপমালা।

ভকতি-সাধন আমি গো তখন
পুষ্পের মহারানী,
প্রেমিকের লীলাকমল, মরাল-
মধুপের রাজধানী।

টের সঙ্গে বাঁধা আছি আমি
আছি গো জলের সাথে,
তবু আলোকের অভিসারে, করি
যাত্রা তিমির রাতে

কুমুদ

চাঁদের চুমায় জাগিয়া উঠেছি
বিথারি' অমল ছত্র,
আমি কুমুদিনী নৈশ-বাতাসে
খুলেছি সুরভি-সত্র!

অন্ধ ভ্রমর বন্ধ রয়েছে
মুদিত কমল-বক্ষে,
জোনাকী আমার বন্ধু এসেছে
জোছনা আহরি' পক্ষে!

গোপন করেছে প্রাচীন রোহিত
তার হরিহর মূর্তি,
আলোক-লিপ্ত লহরে এখন
জাগে শফরীর স্ফূর্তি!

কূলে দেউলের অঙ্গে লেগেছে
সময়ের মসী চিহ্ন,
আমার বঁধুর অমল পরশে
সে মসী ছিন্নভিন্ন!

চির-দক্ষিণ নায়ক—আমার
মরম বুঝিতে দক্ষ;
সুষমা যে শোষে দস্যুর মত
কে চাহে তাহার সখ্য!

সূর্যেরে আমি দূর হতে নমি,
ভালবাসি আমি ইন্দু,
লক্ষ যোজন দূরে থেকে মোরে
দেছে সে অমৃত বিন্দু।

গান

শেফালি গো ! সন্ধ্যা গেলো,
মুকুল ফুটাও !
সুরভি ছিটাও পবনে উড়াও—
ভুবনে ছুটাও !
মুকুল ফুটাও !
আঁধার গলে জ্যোৎস্না-জলে ;
তুমিও গলাও—
হাওয়ারে,—ঢুলাও ! তন্দ্রা বুলাও ।
পরান ভুলাও !
গন্ধ বিলাও !
গন্ধ লুকাও, আবার লুটাও
গন্ধ ছুটাও !
মুকুল ফুটাও !

শেফালি

যখন তিমিরে ভাঁটা পড়ে আসে জেগে জেগে ওঠে ডাঙা,
উষার ছবিটি বুকে ধরি' যবে মেঘের মুকুর রাঙা ;
সুপ্ত শিশুর হাসি সম যবে প্রভাতের সরোবরে
প্রথম-আলোক-পরশ-পুলকে মৃদু লেখা সঞ্চরে,
তখনি আমরা ঝরি,—
শরতের নব শিশিরের সনে ঘন তৃণ বন 'পরি ।

নামি গো নীরবে একে একে, যবে তারা ঝরে যায় নভে,
ভ'রে তুলি বন মৃদুল পবন সুকুমার সৌরবে ।
থেকে থেকে মোরা ঝরে ঝরে পড়ি শরতের ফুলঝুরি
বিথারি' অমল ধবল পক্ষ, অরুণ-বদন হরী ।
মোরা সবে ছোটো ছোটো
অরুণ-পূর্ব অমল-প্রকাশ শারদ দিনের 'ফোটো' !

একটি স্থলপদ্মের প্রতি

মেঘলা দিনের মলিন কমল !
অধরে তোমার একি গো হাসি !
জীবন-দিবার অবসানে বুঝি
খেয়ালে শুনেছ আশার বাঁশী !
রবি সে ডুবিল, উঠিল না,
তোমারি মাধুরী ফুটিল না,
সমুখে নিশার অন্ধ প্লাবন,
পিছনে মেঘের কালিমা-রাশি।
ফুটিলে না তবু ঝরিবে
মুকুল-জীবনে মরিবে
অস্ত-ক্ষণের ক্ষণিক কিরণে
তবু মৃদু হাসি উঠিছে ভাসি !
একি আকুলতা ! পুলকে
দুলিছে সাঁঝের আলোকে !
মেঘের নয়ন এল ছলছলি,
তবু তুমি একি হাসিছ হাসি !

নীলপদ্ম

আমি দেবতার অনিমেষ আঁখি
জেগে আছি দিনযামী,
আমি কামনার নীল শতদল
মর্ত্যে এসেছি নামি' !
সৌরভে মম অকূল পাথারে
নাবিকেরা পায় দিশা,
স্বর্ণ-পরাগ গর্ভে ধরেছি
আমি সুনিবিড় নিশা !

আমি চির শুভ, আমি চির ধ্রুব
চলৎ-লহর বুকে,
আমি জগতের অন্তরাত্মা
রয়েছি ধেয়ান-সুখে !
সোনার সুতায় বাঁধিয়া রেখেছি
শ্যামল পাপড়িগুলি,
সাগরে বসতি করি নিতি, তবু,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাহি দুলি।

শতদল

আজিকে কেবল ওগো শতদল !
মৃদু হিল্লোলে দোলা,
দিকে দিকে দিকে পাপড়িগুলিকে
একে একে একে খোলা।
থেমে গেছে ঝড় থেমেছে বাদল,
আকাশে না বাজে মেঘের মাদল
বাতাস মৃদুল শেফালি দোদুল
স্বপনে আপন-ভোলা !
ওগো শতদল আজিকে কেবল
হিল্লোল-ভরে দোলা।
শিশমহলের রূপসী দলের
ঘোমটা আজিকে খোলা !
মাথার উপরে তক্ তক্ করে
আকাশের পরকোলা !
দিকে দিকে ওড়ে গেরুয়া নিশান,
দিকে দিকে ওঠে গম্ভীর গান ;
দিগ্বিজয়ীর যতগুলি তীর
তূণীরে সে আজি তোলা ;

শিশমহলের রূপসী দলের
অবগুণ্ঠন খোলা !

নাই আর আজি নীপে ভরা সাজি
ঝুলনের হিন্দোলা ;—
মনের হরষে ডালিমের রসে
গোলাপী কাজল গোলা !
পেখম ধরে না ময়ূর আজিকে
কোকিলের তান নাই দিকে দিকে,
উদাসীন প্রায় আছে নিরালায়
হতবাক হয়বোলা ;
নীপে ভরা সাজি নাই আর আজি,
নাই ঝুলনের দোলা ।
ওগো শতদল ! আজিকে কেবল
সব কোলাহল ভোলা,
রাঙা টুকটুক পাপড়ি ঝিনুক
নিভৃতে ভরিয়া তোলা !
জ্যোৎস্না-মাখানো মরালের পাখা
আঁখি মেলে আজ তারি পানে তাকা,
বর্ষা চুকায়ে বিজুলি লুকায়ে
শাদা মেঘে চোখ বোলা ;
(আজ) শিশমহলের সকল তলের
সকল ঝরোখা খোলা !

অবসান

আলো ফুরায়, কমল গো তোর আয়ু ফুরায় !
ব্রজের বাঁশী বাজে সে আজ কোন্ মথুরায় !

বলক ওঠে তপ্ত হাওয়ায়,
পলক নাহি চক্ষেতে, হায়!
ঝরা পাতায় ঘূর্ণা সে আজ তবু ঘুরায়!
আলো ফুরায়!

আবির্ভাব

যে আলোকে বাঁধন হরে
শিউলি ঝরে হেসে গো!
সেই আলো লেগেছে আজি
আমার প্রাণে এসে গো!
সরম-রাঙা বাঁধনগুলি
খস্‌ল রে তাই পড়ল খুলি',
কাঁদন আমার মিশিয়ে গেল
লুপ্ত হিমের দেশে গো!
আমার প্রাণের কোমল গন্ধ
ভিজিয়ে দিলে দিগদিগন্ত,
আভাস পেয়ে বিভাত বায়ু
বইল ভালোবেসে গো!
ভরা দিনের বাজল বাঁশী,
ভরা সুখের ফুট্‌ল হাসি;
ভোলা স্বপন সফল হ'ল
সোনার শরৎ-শেষে গো!
যে আলোকে কাঁদন হরে
শিউলি মরে—হেসে গো!

তৃণ-মঞ্জরী

জগতের মাঝে অজানা অচেনা
চিরদিন মোরা আছি !
মধুকুপী আর পর্‌থুপী আর
কান্‌সোনা, নীলমাছি !
আছি দেশ ভরি' তৃণমঞ্জরী
হরষের বুদ্‌বুদ্‌,
ফুর্‌তির ফাউ—ফাল্‌তো আদায়,—
না-চাহিতে পাওয়া সুদ !
মোদের আদর জানিয়াছে শুধু
পাগল প্রেমিক কবি
আমরা ধূলিরে করি পুলকিত
নম্র-মধুর ছবি।
মোরা সাধারণ, নাই আভরণ,
নাহিক আড়ম্বর,
রথের চাকায় প্রাণ দিই মোরা
পথের ধূলায় ঘর।

পারুল

সোনার কেশর, পাপড়ি সোনার, সোনার কলেবর,
পারুল ! তোরে গড়েছে কোন্ ঢাকাই কারিগর ?
সোনায় মাজা রঙটি দেছে, দেছে শোভন ঠাম,
পারুলমণি ! বল্ তো শুনি কারিগরের নাম !

ছেলেবেলার সখী যে তুই চাঁপা ফুলের বোন্
একটি কথা শোন গো আমার একটি কথা শোন।
নীরব কেন ? করবে না রাগ ঢাকাই কারিগর,—
ঢাকা সে তো নাইকো পুরা,—জপছে চরাচর।

কানে কানে বল্‌তে কি দোষ ? কেউ তো কোথাও নাই,
ঘুমিয়ে আছে চাঁপার গাছে সাতটি তোমার ভাই ;
মুখখানি তোর কাঁচা সোনা—লাখ টাকা তার দাম ;
পারুলমণি ! বল্‌তো শুনি কারিগরের নাম ।

অপরাজিতা

কালো ব'লে পাছে হেলা করে কেউ
তাই তো আমার পিতা
সকলের সেরা দিলেন আমারে
নামটি,—'অপরাজিতা' !
আমি গুণহীন গন্ধবিহীন
ফুলের মধ্যে কালো,
পিতার আদরে আদরিণী, তবু,
আমিই কালোর আলো ।

হেমন্তে

শাঁইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে নিবিড় ঝোপের নীচে,
হেমন্তের এই হৈম আলো ঠেকছে ভিজে ভিজে ;
ঝরা শাঁইয়ের ফুল
নিশাস ফেলে নিরাশ মনে বিষাদ সমাকুল ।

কমল বনে নেই কমলা, চঞ্চরীকা চুপ !
বিজন আজি পদ্মদীঘি লক্ষ্মীছাড়ার রূপ !
কোজাগরের চাঁদ
ডুবে গেছে ছিন্ন ক'রে আলোর মায়া-ফাঁদ ।

একটি দুটি পাপড়ি নিয়ে রিক্ত মৃণালগুলি
রক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে মরাল গ্রীবা তুলি' ;
ভাঙা হাটের তান
আবিল ক'রে তুল্‌ছে হাওয়া ক্লান্ত ম্রিয়মাণ।

দেখছে মৃণাল নিজের ছায়া দেখছে মলিন মুখে,
পদ্মফুলের পাপড়ি শুকায় পদ্মপাতার বুকে !
ভরসা কিছু নাই,
ধোঁয়ার সাথে সন্ধি ক'রে ঝরছে শুধু ছাই।

আকাশ জোড়া আঁখির কোলে জম্‌ছে কালো দাগ,
বইছে বাতাস কুণ্ঠাভরা দীনের অনুরাগ !
ফিরে সে পায় পায়,
চাইলে চোখে সংকোচে সে চমকে সরে যায় !

ডাগরগুছি কনক-রুচি কনক-চূড়া ধান,
ওই পরশে কেঁপে কেঁপে হচ্ছে ম্রিয়মাণ ;
শিরশিরে সেই বায়,
ক্ষেতের হরিত কুজ্ঝটিকায় ঝাপসা চোখে চায় !

তেঁতুল ঝোপে ডাকছে ঝিঁঝি, ঝিমিয়ে আসে মন,
মিলিয়ে আসে দীঘির জলে আলোর আলেপন ;
সূর্য ডুবে যায়,
সন্ধ্যামণি নোয়ায় মাথা সন্ধ্যামুনির পায় !

হাওয়ার মত হাল্কা হিমের ওড়না দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা শূন্য চোখে চায় ;
তারায় আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি অশ্রু-পরিপূর।

দেউটি জ্বলে আকাশতলে তন্দ্রা-নিমগন,
শাঁইয়ের ঝোপে জোনাক চলে, স্তব্ধ ঝাউয়ের বন ;
সুপ্ত চারিদিক,
হিমের দেশে ঘুমের বেশে মরণ অনিমিখ।

শিশু ফুল

প্রভাত না হতে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
ফুটিয়া উঠিতে ফুরায় মোদের আয়ু,
ননীর পুতুল—হিমের পরশে মরি
বহে যবে হায় প্রথম শীতের বায়ু।

লাখে লাখে লাখে আমরা ঝরিয়া যাই,
পুলক-পেলব দুধে-ধোয়া শিশু ফুল ;
মৃদু সৌরভে হৃদয় ভরিয়া যাই,
শিশির-সজল স্মিরিতির সমতুল !

গণনায় কারো আসি নে আমরা কভু,
স্মরণের পটে থাকি নে অধিক ক্ষণ ;
অকালে লুপ্ত শিশুদের মত তবু
অশ্রু-সুরভি আমাদের এ জীবন !

শীতের শাসন

কুসুম-কলি শীতের শাসন চায় গো ভুলিতে !
বিরূপ হাওয়া দেয় না তারে ঘোমটা খুলিতে !
আঁখির পাতায় পাতায় জড়ায়, হায় !
কুহেলি আজ কেবল বেড়ায়, তায়,
ঘুমের কাজল মাখায় চোখে তন্দ্রা-তুলিতে,
(আঁখি) দেয় না তুলিতে !

আঁখিতে তার বুলায় পাখীর পর,—
রিমিঝিমি বিবশ কলেবর,
স্বপন-ঘোরে কুসুম-কলি লুটায় ধূলিতে ;
(আঁখি) হয় না খুলিতে।

কুন্দ

ফুল হয়ে আমি উঠেছি ফুটিয়া
তোমারি অশ্রু-কণা,
ফিরে চাও ওগো শীতের বাতাস !
উদাসীন উন্‌মনা !
দুনিয়ার লোক রুধিল দুয়ার
পাইয়া তোমার সাড়া,
রুদ্ধ কবাটে নিশ্বাস ফেলি'
কেন ফির পাড়া পাড়া ?
কুঞ্জবনের ঝরোখায় আজি
কাহারো নাহিক দেখা,
ক্ষুদ্র প্রাণের আরতি লইয়া
কুন্দ জাগিছে একা !
দাঁড়াও দাঁড়াও পউষ-বাতাস
তুষার-শীতল তুমি,
তুষারের মত শুভ্র অধরে
চরণ তোমার চুমি।
যারে তুমি আজ ফুটায়েছ বঁধু
তুচ্ছ সে অতিশয়,
পুষ্প-সভায় সকলেরি কাছে
মেনেছে সে পরাজয় !

তবু সাধ তার ছিল ফুটিবার
সে সাধ পূরিল আজ,
ওগো দক্ষিণ উত্তর-বায়ু
তুমি ভেঙে দিলে লাজ।
গোলাপের দিনে ছিল যে গোপন,—
কমলের দিনে ম্লান,—
তারেও ফুটালে ওগো অতুলন
এই তো তোমার মান,
এই তো তোমার গৌরব, ওগো!
কেন দূরে যাও তুমি?
দাঁড়াও, দাঁড়াও, তরুণ অধরে
চরণ তোমার চুমি।
ধূলির নিকটে ফুটায়েছ তুমি
প্রথম চাঁদের কলা,—
শকুনের পাখা কুয়াশায় ঢাকা
বনের শকুন্তলা
চ'লে যেয়ো না গো নিঠুরের মত
কঠোর করিয়া প্রাণ,
তোমার পূজায় একটি কুসুম,—
একটি জীবন দান।
সে জীবন অতি ক্ষুদ্র জীবন,
সুষমা নাই সে ফুলে;
নিরালার মাঝে সঙ্গী সে তবু,
আলো কুহেলির কূলে।
ওগো সহৃদয়! মদেকসদয়!
দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি;
কুণ্ঠিত কুঁড়ি ধন্য হইবে
তোমায় চরণ চুমি'।

কাঞ্চন ফুল

আমি বনানীর কর্ণভূষণ
সুন্দর পরিপাটি,
নাম 'কাঞ্চন' হাল্কা গড়ন
মধুপর্কের বাটি !
মধু-পিঙ্গল কিরণ মধুতে
যবে উঠে বুক ভরি'
দেবতার পায়ে তখনি নিজেরে
নিজে নিবেদন করি।
মৃদু পরশেই 'নোন্‌ছা' লাগে গো,
তাই দূরে ফুটে আছি,
ক্ষীর সাগরের মৃদু ফেন-লেখা
আমি জোছনায় চাঁছি !

ফুলের রানী

দেখা হ'ল ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে,
সন্ধ্যাবেলায় ঝাপসা ঝোপের ধারে,
পরনে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়না ওড়ে অঙ্গে,
দেখলে সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে ?
চোখ দুটি তার ঢুলুঢুলু মুখখানি তার মিঠে,
আফিম ফুলের রক্তিম হার চুলে ;
নিশ্বাসে তার হাস্নুহানা, হাস্যে মধুর ছিটে,
আল্‌গোছে সে আল্‌গা পায়েই বুলে।

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,—
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে !
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক-পোকার জেল্লা,
মন্ত্র প'ড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে !

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দা,
হতোম প্যাঁচা প্রহর-হাঁকে দ্বারে ;
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ-চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে !

কালো কাঁচের আর্শীতে সে মুখ দেখে সুস্পষ্ট,
আলো দেখে কালো নদীর জলে !
রাজ্যেতে তার নেইক মোটেই স্থায়ী রকম কষ্ট,
স্বপন সেথা বেড়ায় দলে দলে !

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে হঠাৎ হ'ল দেখা
ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সনে,
মধুর হেসে সুন্দরী সে বেড়ায় একা একা,
মূর্ছা হেনে বেড়ায় গো নির্জনে !

ফুলশয্যা

মিলন ফুলশয্যা হবে কুড়িয়ে-আনা ফুলে,
ছিঁড়ে কারেও নিতে যে জল আসে আঁখির কূলে !
যদি গো কেউ আপন বেসে
আপনি আসে মধুর হেসে
যত্নে নেব তারেই আমি বুকের 'পরে তুলে,
মোদের ফুলশয্যা হবে শিউলি-বকুল ফুলে।

মোদের ফুলশয্যা হবে রাঙা গোলাপ ফুলে,—
পাপড়িগুলি পড়বে যখন আপনি খুলে খুলে।
নইলে সাধের সোহাগ যত ;
ঠেকবে অপরাধের মত ;
মিলন-রাতি কান্না-সাথী করব না তো ভুলে,
মোদের ফুলশয্যা শুধু আপনি-ঝরা ফুলে !

মোদের ফুলশয্যা হবে গভীর আত্মদানে,—
শিউলি, বকুল, ঝরা গোলাপ, পদ্মেরি মাঝখানে!
বলবে যে দিন মনের পাঁজী
হবে সেদিন আপনি রাজী,
প্রাচীন বাঁধন শিথিল ক'রে মিলবে প্রাণের টানে ;
মোদের মিলন হবে শুধু স্বাধীন আত্মদানে।

ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
অভিনব চন্দন ;
রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
পুলকের ক্রন্দন!
সদ্য মধুতে সৌরভ ওঠে,
বায়ু বহে উতরোল!
দুলে দুলে ওঠে পরান-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল
চাঁপায় বরন তপনের আলো,
চামেলি চাঁদের হাসি,
কূলে কূলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে,—
অশ্রু-সায়রে ভাসি!
কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
হৃদয়-দোলায় পরান-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল।
জাগিল কী এক ভাব!
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন্
রসের আবির্ভাব!
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল!
পরান-পুতলি পরানে পরানে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

নির্মাল্য

ফলে পরিণতি হ'ল না যাহার
নিষ্ফল সেই ফুলে
ভক্ত সঁপিল আঁখি জলে তিতি'
দেবতার পদমূলে!
দেবতার পায়ে জীবন ঢালিয়া
সেই চির-ফলহীন
জগতের শিরোধার্য হয়েছে;—
হয়েছে গো অমলিন
শোভাহীন তার শুষ্ক পাপড়ি,—
আজি জগতের চোখে
অলোক-আলোকে মণ্ডিত,—সে যে
অশোক-বারতা শোকে;
দৈব অভয় সে যে দুর্গম
দূর গমনের পথে!
দেবতার বরে নির্মল করে
নিষ্ফলও এ জগতে!

প্রাণ-পুষ্প

আমার পরান যেন হাসে,
ফুলেরি মতন অনায়াসে ;
চাঁদের কিরণতলে,
বরষার ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে ;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।
সব সংকোচ শোক
কুণ্ঠা শিথিল হোক,
আপনারে মেলিয়া বাতাসে,
নবনীত-নিরমল
খুলিয়া সকল দল
সার্থক হোক মধু-বাসে ;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।

পারিজাত

এ পারে সে ফুটল নারে ফুটল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কখনো টুট্‌ল না,—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি',—
মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;
ও পারে তার মাল্য রচে উর্বশী,—
স্বপন-মাখা মৌন আঁখিপাত !

স্বর্গ-ভুবন মগ্ন-গো তার সুগন্ধে,
ফুটেছে সে মন্দারেরি সাধ ;
ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,
অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত !

এ পারে তায় হরণ ক'রে আনবে কে ?—
মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?
তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মানবে কে ?—
স্বর্গে হানা দিবে বারংবার ?

ঐরাবতের মাথায় অসি হান্‌বে কে ?—
প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?
পারের পারিজাতের মরম জান্‌বে কে ?
কে ঘুচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কল্পনাতেই থাকবে সে !—
নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?
সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাকবে সে,
চির-সাধের পারের পারিজাত !

কবিপত্নী কনকলতা দত্ত

কুহু ও কেকা

ভূমিকা

এই গ্রন্থের অল্প কয়েকটি কবিতা ভারতী, প্রবাসী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন এবং আরও দুই একখানি কাগজে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ নূতন।

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় এবারেও আমার পুস্তখানির সৌন্দর্য বাড়াইয়াছেন; প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি তাঁহারই।

রাখী-পূর্ণিমা
১৩১৯

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

কবি ও বন্ধু
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
করকমলেষু—

দুই সুর

কোকিল—কালো কোকিল রচে সুরের ফুলে ফুলঝুরি ;
বসন্তে সে ভুলায়ে আনে হাওয়ায় করি' মন চুরি !
কুজ্ঝটিকা-কুটিল নভে বুলায় তুলি রঙ্গিলা,
দোলায় তৃণ-বল্লরীতে মঞ্জু ফুল-মঞ্জরী !

বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে,
কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুরে সঞ্চরে !
শীতের গড়ে পাথর নড়ে—মুহুর্মুহুঃ হয় ঢিলা,
মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু-মন্তরে !

সুখীর সুখী শিখী সে নাচে হেলায়ে গ্রীবা গৌরবে,
আওয়াজে তার কদম ফোটে,—কানন ভরে সৌরভে ;
কলাপ মেলি' করে সে কেলি রৌদ্রে স্নেহ সঞ্চারি',
ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে !

দগ্ধ দেশে মুগ্ধ নাচে নয়ন মেঘে অর্পিয়া,—
মেদুর নভে ধূমল ফণী বেড়ায় যবে দর্পিয়া !
তমাল 'পরে নৃত্য করে কুহক কেকা উচ্চারি',
মূর্ছি পড়ে সর্প শত সত্রশিখা তর্পিয়া !

বনের কুহু, বনের কেকা,—কুহক-ভরা যুগ্ম-রাগ,
দেয় গো বাঁটি' নিখিল মাঝে আনন্দেরি যজ্ঞভাগ !—
অনাদি সুধা,—অনাদি সোম,—হয় না কেহ বঞ্চিত ;
অনাদি সাম, অনাদি ঋক্ পূর্ণ করে বিশ্ব-যাগ ।

মনের কুহু,—মনের কেকা,—অনাদি তারো মূর্ছনা,
গোপন তার প্রচার, তবু, তুচ্ছ না সে তুচ্ছ না।
গহন-গেহে নিভৃতে রহে নিখিল-হৃদি-সঞ্চিত,
মিলিয়া আছে উহারি মাঝে বরষা সাথে জ্যোৎসনা।

আপনি পড়ে ছন্দে ধরা আপনি তার উদ্বোধন,—
ক্রৌঞ্চী কাঁদে করুণ কুহু,—কবি সে—কেকা,—ক্ষুব্ধ মন।
'উলসি' ওঠে গুপ্ততোয়া সুপ্ত নদী সুড়ঙ্গের,
কল্পলতা মুকুল মেলি' বিতরে চির গুপ্তধন।

আদিম কুহু, আদিম কেকা,—ধরিবে কেবা ছন্দে সে,—
—জনম যার কামনা-লোকে মনের সুগোপন দেশে;
ফুটায়ে ফুল, ছুটায়ে হাওয়া, লুটায়ে ফণা ভুজঙ্গের
মিলায়ে দুঁহু গাহিবে মুহু—গাহিবে মহানন্দে সে।

ফুটিতে যাহা ঝরিয়া পড়ে,—গাঁথিবে তারে সংগীতে।
কামনা বুঝি কনক-ধূনী সুমেরু চূড়া লঙ্ঘিতে!
মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখিবে তারি মূর্ছনা,—
প্রকাশ যার আকাশ-তটে অযুত শত ভঙ্গীতে।

হৃদয়ে মুহু কোকিল কুহু ময়ূর কেকা রব করে,
গহন প্রাণ-কুহর মাঝে স্বপন-ঘেরা গহ্বরে!
ধেয়ানে দোঁহে আরতি করি' ফুটাবে মেঘে জ্যোৎসনা
স্মিরিতি সাথে পিরিতি, আজি মন্দ্র-মধু মন্তরে।

জ্যোৎস্না-মদিরা

চন্দ্র ঢালিছে তন্দ্রা নয়নে,
মল্লিকা বনে ঢালিছে মায়া;
ছায়ায় আর্দ্র আলোখানি আজ
আলো-মাখা ফিকে হাল্কা ছায়া!

সুদূর-স্বপন-বিধুর প্রাণ,
উঠিছে মৃদুল মধুর গান,
মৃদুল বাতাসে মর্মর ভাষে
উছসি' উঠিছে বনের কায়া !
স্ফুরিত ফুলের উতলা গন্ধে
গাহে অন্তর কত না ছন্দে,
আলোকে ছায়ায় প্রেমে সুষমায়
ভুবনে বুলায় মদির মায়া !

কু ?

বসন্তের প্রথম উষায়
ফুলদলে জাগাবে বলিয়া
বহিল দক্ষিণ বায়ু ;—কে আজি সুধায়
মুহুর্মুহুঃ আনন্দে গলিয়া ?—'কু ?'

মধু আলো, মধুর বাতাস
বুঝি তারে করেছে বিহ্বল,
ভুলে গেছে দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, দুখের আভাস,—
তাই সে সুধায় অবিরল—'কু ?'

সে যে আজ মেলেছে গো পাখা,
দেখেছে গো সৌন্দর্য অপার,
হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাখা,
তাই বুঝি পুছে বারংবার—'কু ?'

বিধাতা করেছে তারে কালো,—
নীরব শিশিরে বরষায়,
তবু সে ফেলেছে বেসে জগতেরে ভালো
প্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুধায়—'কু ?'

মদন-মহোৎসবে

বন উপবন আলো ক'রে অশোক ফুটে আছে,
অশোক ফুলের রূপটি ঠাকুর ! চাইছি তোমার কাছে
চোখের দাবি মিটলে পরে তখন খোঁজে মন,
তাই তো প্রভু ! সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।

মল্লিকা ফুল হাসছে হরি' হাওয়ার মগজ মন,
মনোহরণ বিদ্যাটি দাও—এ মোর নিবেদন ;
মনের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে শক্তি যেন হয়,—
নইলে, শুধু রূপের আদর—হয় না সে অক্ষয়।

আমের মুকুল জাগছে আকুল ফলের আশা নিয়ে,
সফল কর আমায় ঠাকুর ! প্রেমের পরশ দিয়ে ;
প্রিয় আমার স্নেহের নীড়ে স্নিগ্ধ যেন রয়,
মনের মোহ ফুরিয়ে গেলেও প্রাণের পরিচয়।

গন্ধ-মধু-রূপ-সায়রে ভাস্‌ছে নীলোৎপল,—
নিখুঁৎ-নধর অটুট আদর সোহাগ-শতদল ;
রূপে, রীতে, মাধুরীতে অমনি হতে চাই,
চোখের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে যেন যাই।

মল্লিকা ফুল, আমের মুকুল, অশোক, নীলোৎপলে,
ঠাকুর তোমার চরণ পূজি,—পূজি নয়ন-জলে ;
অরুণ অরবিন্দ সম তরুণ এ হৃদয়,—
তোমার বরে কামনা তার সফল যেন হয়।

মধুমাসে

যে মাসেতে পুষ্পে মধু,—
মধু মধুকরের মুখে,—
হিয়া যখন হাওয়ার আগে
হয় গো মদির অধীর সুখে ;—
আঁখি আকুল অন্বেষণে
ফিরছে যখন বনে বনে,—
মুহুর্মুহুঃ কুহু স্বরে
তন্ত্রী দুলে উঠছে বুকে ;—
তখন তুমি দিলে দেখা অমনি
ফুলের বনে ফুলের রানী রমণী !
অমনি বিপুল সুখের ভরে
আকুল আঁখি উঠল ভ'রে,
পুলক হাসি পাগল বাঁশী
বিদায় দিল মৌন দুখে !

গান

মুখখানি তার পদ্মকলি
ভাবের হাওয়ায় দোদুল-দুল্ !
সুখের স্বপন, বুকের সে ধন,
দুখের আপন সে বুলবুল।
ভুবন-ভোলা নয়ন দু'টি
খোঁজে না ছল, নেয় না ত্রুটি,
ছুটির হাওয়া ছুটিয়ে সে দেয়,—
আপন-ভোলা মধুর ভুল !

উড়ো পাখীর লাগল পরশ
তাইতো রে মন গেল উড়ে,
কি এক হাওয়া জাগল সরস
স্বপন-সুখের ভুবন জুড়ে !
তড়িৎ-ভরা মেঘের মতন
হৃদয় জুড়ে জাগল চেতন,
দেবতা সে কোন্ ছদ্মবেশে
কল্পলতার কাম্য-ফুল !

চার্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্বাক,
সূর্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, চিন্তিত, নির্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যামলেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।
তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।
চলিয়াছে চার্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর ;
শিশিরের পদ্মকলি সম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"আজি যদি মঞ্জুভাষা আসে এই পথ দিয়া,
চকিতে আঁচলখানি নেব তার পরশিয়া,
সে যদি জানিতে পারে! সে যদি পালটি চায়
মাগিয়া লইতে ক্ষমা আমি কি পারিব, হায়!
সে এলে অবশ তনু, কথা না জুগায় আর!
কত যেন অপরাধ,—আঁখি নোয় বারবার!
সময় বহিয়া যায়, চ'লে যায় রূপসী,
রাখিয়া রূপের স্মৃতি ডুবে যায় সে শশী।

* * *

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!
পিতা যদি সর্বশক্তিমান্,
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?
নাহি—নাহি—নাহি হেন জন,
বিধি নাই—নাহিক বিধান;
কোন্ ধনী পিতার সংসারে
অনাহারে মরেছে সন্তান?
মোরা যে বিশ্বের পরমাণু
স্নেহ প্রেম মোদেরো প্রবল;
আর যেই ত্রিলোকের পিতা
তারি প্রাণ পাষাণ-নিশ্চল?
দাসীপুত্র যারা জন্মদাস
ভয়ে ভক্তি জানি তাহাদের,
আজন্ম যে হতেছে নিরাশ,—

সেও রত তোষামোদে ফের !
ধিক ! ধিক ! মরণের দাস !
মুখে বল পুত্র অমৃতের !
ছিল দিন,—হাসি আসে এবে ;—
নখে চিরি' বক্ষ আপনার,
আমিও করেছি লোহদান
লৌহময় পায়ে দেবতার।

বালকের অখল হৃদয়ে
আমিও করেছি আরাধন,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন।

ফল তার ?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ !
মরণের পরে কিবা আর ?
নাহি—নাহি—নাহি কোনো জন।"

অকস্মাৎ চাহিল চার্বাক
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবুডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী !

মঞ্জুভাষা রূপে বনদেবী
শিরে ধরি' পাষাণ কলস,
আসে ধীরে আশ্রম বাহিরে
গতি ধীর, মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি' ;
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল-প্রদীপ আঁখি তার ;
পরিপূর্ণ সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার ;
ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
ছলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।
চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্বাকে,
"ওগো ! শোনো শোনো,
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো ?"
মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !
কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদ্‌গদ বচন,
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার সোনার বরন ;—
যেয়ো একদিন !
আজ যাবে ?" মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্বাক
ভরসা ও ভয়ে ;
মঞ্জুভাষা কহে, "না, না, আজ ?— আজ থাক !"
আধেক বিস্ময়ে।
সহসা সংবরি আপনায়,
কহে বালা চাহি মুখপানে,
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;

ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ ;
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,—
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন ।
বল, আমি মা হ'ব তাহার ।"
"তাই হোক্" কহিল চার্বাক,
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি ।" কহি যুবা হইল নির্বাক্ ।
কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল-গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে ।
আশার বাতাসে করি ভর
ফিরে এল চার্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে ।
ঠেকেছিল মনোতরীখান্
প্রাণ-নাশা সংশয়-চরায়,
ভাষাহীন আশা পেয়ে আজ
হর্ষে ভেসে চলে পুনরায় ।
যত কিছু ছিল বলিবার
না বলিতে হ'ল যেন বলা,
বোঝা—সোজা হ'ল মনে মনে,
ধুয়ে গেল যত মাটি মলা ।
ছিল ঠেকে মনোতরীখান্,—
চলিল সে কাহার ইঙ্গিতে ?
কে গো তুমি দুর্জ্ঞেয় মহান্ ?
কে দেবতা এলে আজি চিতে ?

"এ আনন্দ কে দিলে আমায়?—
আশা-সুখে মন পরিপূর্ণ!
এতদিন চিনিনি তোমায়;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর!"
রাত্রি এল;—শয্যাতলে জাগিয়া চার্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার!
সেই একদিন শুধু জীবনে চার্বাক
নত হয়েছিল নিজে চরণে ধাতার;
প্রেমের কল্যাণে শুধু সেই একদিন,—
সে যে আনন্দের দিন,—সে যে প্রত্যাশার।

সহজিয়া

ফুলের যা' দিলে হবে নাকো ক্ষতি
অথচ আমার লাভ
আমি চাই সেই সৌরভ,—শুধু—
অতনু অতল ভাব।
আমি চাই সেই দূর-হতে-পাওয়া
আমি চাই মধু-মশগুল হাওয়া,
অন্তরে চাই শুধু রূপসীর
অরূপ আবির্ভাব,
যাহা দিলে তার ক্ষতি নাই, তবু
আমার পরম লাভ।

বৃন্তটি হতে ছিঁড়িতে না চাই
দিতে নাহি চাই দুখ,

সহজ প্রেমের অমল আমোদে
ভরিয়া উঠুক বুক !
খাঁটিতে না চাই দুনিয়ার মাটি,
তারি মাঝে মিশে রয়েছে যা' খাঁটি,
নিতে হবে সেই পরশমণির
চুম্বিত সোনাটুক্,
কারো কোনো ক্ষতি হবে না, অথচ
আমার ভরিবে বুক ।

লীলার ছল

আমি যদি চাই, অবগুণ্ঠনে
তুমি মুখখানি ঢাক ;
নয়ন ফিরালে, তবে, অনিমিখে
কেন গো চাহিয়া থাক !
এমনি করিয়া চিরদিন কিগো !
জড়ায়ে রাখিবে মোরে ?
তবু কাছাকাছি হবে না ? আমার
জীবন দিবে না ভ'রে ?
নয়ন তোমার করে অনুনয়,
তুমি দূরে স'রে থাক ।
লীলায় হেলায় মেঘের মেলায়
রঙীন স্বপন আঁক !
পূজা চাও তুমি হৃদয়-প্রাণের
হায় গো পাষাণ-দেবী !
তবুও আমায় ধন্য হইতে
দিবে না তোমায় সেবি' !

ফাগুন ফুরায় ফুল ঝরে যায়
ওগো কৌতুক রাখ,
হৃদয়ের পুরে পরিচিত সুরে
ডাক গো বারেক ডাক।

অবগুণ্ঠিতা

আমি বসনে ঢেকেছি মুখ
দেখিতে তোমায়
দূরে সরে যাই, বুকে
আঁকিতে তোমায়!
তুমি অভিমান-ভরে ফিরে যেয়ো না,
নিরাশ নয়নে বঁধু তুমি চেয়ো না;
আমার ভুবন ভরি'
আছ দিবা-বিভাবরী,
আঁখির পুতলি! হেরি
আঁখিতে তোমায়!

লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি! সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির-আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা!
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জোছনারি মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই!
অয়ি ইন্দুলেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে
ফিরিনাকো দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে ;
হে অমৃত-ধারা !
উষ্ণ কটাক্ষের ভিক্ষা হয়ে গেছে সারা।

এসেছ হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে
পূর্ণ করি' দশ দিক্ মন্দার-সৌরভে ;
আমি মুগ্ধ চিতে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমারি ইঙ্গিতে !

আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে,
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে !
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ ? হায়, কে তা' জানে !

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস,
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস,
আনিলে চেতনা,
দুখের গদ্‌গদ সুখ, সুখের বেদনা !

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে !

আজি মোর সর্বচিত্ত সারা তনু ভরি'
আনন্দ-অমৃত-ধারা ফিরিছে সঞ্চরি' !
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে !

জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তা-তিথি-শেষে,
মানসী দিয়েছ দেখা মানুষের দেশে,
অয়ি স্বপ্ন-সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি।

তুমি সে বালিকা—যার চম্পক-অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলী!
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া।

শিয়রে সোনার কাঠি ঘুমাইতে তুমি,
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি!
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত-বাতাস,
বর্ষা-জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস!
মূর্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্য-মণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালোচুল খুলে,
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দুলে;
সন্ধ্যা সরোবরে
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে!

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে;
আজ একেবারে
মর্ত্যে এলে মূর্তি ধ'রে আমারি দুয়ারে!

মুগ্ধ মোরে করেছ গো মুগ্ধ চোখে চাহি',—
ধুয়ে মুছে দেছ গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি,
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারী !

প্রিয়-প্রদক্ষিণ

প্রিয়ার ও তনু অতনু সে কোন্
দেবতার মন্দির !
বন্ধনহীন মন উদাসীর
আলয় সে শান্তির।
তাহারে ঘিরিয়া ঘুরিছে হৃদয়
ঘুরিছে রাত্রিদিন,
উৎসুক সুখে কৌতুকে তারে
করিছে প্রদক্ষিণ !
ফিরিছে হৃদয় কুন্তলে তার,
ফিরিছে কপোলে, চোখে ;
অধরে, উরসে, চরণে, পাণিতে
ফিরিছে তাম্র-নখে !
ফিরিছে আঙুলে, ফিরিছে জড়ুলে,
ফিরিছে ভুরুর তিলে,
ফিরে অবিরাম,—কৌতূহলের
অন্ত নাহিক মিলে।

ঘুরি গো যাত্রী দিবস-রাত্রি
অনুপ দেউল ঘিরে,
নূতন প্রেমের নির্মল-করা
'নির্মালি' ধরি' শিরে !

কত হাসি কত পুলক-অশ্রু
করি গো আবিষ্কার,
দৈব প্রসাদে খোলে দেউলের
নূতন নূতন দ্বার !

নূতন প্রণয় নব পরিচয়
নব রাগিণীর গীতি,
কত জনমের মূর্ছনা তাতে
মূর্ছিত কত স্মৃতি !
প্রিয়ার দিঠিতে ভোলা মন আজ
হয়েছে জাতিস্মর,
দৈব আলোকে ভরেছে দু'চোখ
ভরেছে নীলাম্বর

প্রিয়ার রূপের অন্ত নাহিরে
নূতন সে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে তার শোভা নব নব
হেরি বিস্ময় মনে !
উদ্বেল তাই হৃদয়-পরান
নাচিছে রাত্রি দিন ;
নিবিড় পরশ আঁখি সনে করে
প্রিয়ারে প্রদক্ষিণ !

তুমি ও আমি

তুমি আমি—আমরা দোঁহে যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
ফুল-জনমে ;—ছিলাম যখন পাপড়ি-ঘেরা সিংহাসনে ;
আমরা ছিল সোনার রেণু, স্নিগ্ধ মধু তোমার হাসে,
তুমি ছিলে মধ্য-কেশর, আমি তোমার ছিলাম পাশে।

হঠাৎ কি যে মর্জি হ'ল,—হঠাৎ কেমন হ'ল মতি,
তফাত হয়ে গেলাম দোঁহে,—বিমুখ পরস্পরের প্রতি !
দীর্ঘদিনের তপস্যাতে কায়মী হ'ল ছাড়াছাড়ি,
আমি ক্রমে হলাম পুরুষ, তুমি প্রিয়ে হলে নারী।

তফাত হয়েই ফুটল আঁখি,—দেখতে পেলাম পরস্পরে—
ভিতর থেকে টান পড়েছে,—চলবেনাকো থাকলে সরে ;
'নোঙ' দিয়ে তাই এগিয়ে এলাম,—এগিয়ে হ'টে গেলাম পিছে,
মান-অভিমান জাগল দারুণ, মিলন-বাধা বাড়ল মিছে।

আজ বিরহের দারুণ দাহে পরস্পরে চাইছি মোরা,—
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা ;
আর মিলনের নেইকো আশা মৌমাছিদের ঘটকালিতে,
ভাঙা এ মন জুড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে !

তফাত হয়ে নেইকো তৃপ্তি, দু'ঠাঁই হয়ে দুখ মেনেছি,
লাভের মধ্যে, হায় গো বিধি, হারিয়ে পাওয়ার স্বাদ জেনেছি ;
হারিয়ে-পাওয়া ! গভীর সে সুখ !—প্রবল সে যে দুখের বাধায় !
বিচিত্র সে নূতন মিত্র !—এক সাথে সে হাসায়-কাঁদায় !

ফুল-জনমে অভেদ ছিলাম,—যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে,
আজ আমাদের এই মিলনে সেই কথাটিই জাগছে মনে ;
দূরে সরে দুনিয়া ঘুরে আবার মিলন এই জনমে,
যুক্ত দোঁহার যুক্ত হৃদয় আজ বিধাতার পায়ে নমে।

অকারণ

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর,
পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়ে নাকো দাঁড় খেয়া-তরণীর
তিমির-মগন জলে,—

নীলাম্বরির অঞ্চল দিয়া
সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধতৃণের বিভোল গন্ধ
বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,
দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখ-নীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি
স্বপনে কি যেন বলে ;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে—অশ্রু ছলে।

যবে ঝরে ঝরে বারিধারা ঝরে,
আর সব রহে চুপ—
তরুপল্লবে সঞ্চিত জল,
জলে পড়ে—টুপ টুপ,—
যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে
জড়ায়ে নিভৃতে সুনিবিড় পাকে
গন্ধ-মগন কালভুজঙ্গ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;
দাদুরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,
দাপটিয়া ফিরে দস্যু পবন,
নব কদম্ব যূথীর গন্ধ
আকাশে বাতাসে লুটে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া
নয়নে অশ্রু ফুটে !

প্রথম শরতে অম্বরে যবে
মেঘ-ডম্বরু বাজে,—

যবে খরশান বিধাতার বাণ
ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল-কলিকা শঙ্কিত মনে
রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ-অরুণ-কিরণ স্মরিয়া
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরান খুঁজে আশ্রয়,—
খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,-
এ তিন ভুবনে আপনার জনে
খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া
নয়ন—সলিলে ভরে।

পউষের রাতে কঙ্কাল সম
বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাঁদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে
ভস্ম-কুহেলি মাখা,—
কুক্কুর তুলে বুকন ধ্বনি,
ঘুৎকার করে উল ক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ
প্রচারে ভূমণ্ডলে,—
দীর্ঘ যামিনী পোহায় জাগিয়া-
তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরান ক্ষুণ্ণ নয়ন শূন্য
নিবিড় তিমির তলে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া,
নয়নে মুকুতা ফলে।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী !
কালে কালে নিতি নিতি !
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি'
কি অপরূপ গীতি !
এ কি মিছামিছি দুঃখের খেলা,
এ কি মিছামিছি আঁখিজল-ফেলা
কোন্ বেদনার চির হাহাকার
চিরদিন জাগে প্রাণে !
কোন্‌খানে সুরু, কোথা উন্মেষ,
কোন্ যুগে হায় হবে এর শেষ,
কোন্ রাগিণীর ব্যথা-ভরা রেশ
ধ্বনিছে সকল গানে !
অকারণে হায় অশ্রু গড়ায়
কোন্ সাগরের টানে

পাল্কীর গান

পাল্কী চলে !
পাল্কী চলে !
গগন-তলে
আগুন জ্বলে !
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'

পাটায় ব'সে
ঢুলছে ক'ষে !
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি,—
উড়ছে কতক
ভন্‌ভনিয়ে।—
আসছে কা'রা
হন্‌হনিয়ে ?
হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে !

কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো,—
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।
ঢুকছে গরু
দোকান-ঘরে,
আমের গন্ধে
আমোদ করে !

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
দুল্‌কি চালে
নৃত্য তালে !
ছয় বেহারা,—
জোয়ান তারা,—

গ্রাম ছাড়িয়ে
আগ্ বাড়িয়ে
নাম্‌ল মাঠে
তামার টাটে !
তপ্ত তামা,—
যায় না থামা,—
উঠছে আলে
নামছে গাঢ়ায়,—
পাল্কী দোলে
ঢেউয়ের নাড়ায় !
ঢেউয়ের দোলে
অজ দোলে !
মেঠো জাহাজ
সামনে বাড়ে,—
ছয় বেহারার
চরণ-দাঁড়ে !

কাজলা সবুজ
কাজল প'রে
পাটের জমি
ঝিমায় দূরে !
ধানের জমি
প্রায় সে নেড়া,
মাঠের বাটে
কাঁটার বেড়া !

'সামাল্' হেঁকে
চল্‌ল বেঁকে

ছয় বেহারা,—
মর্দ তারা !
জোর হাঁটুনি
খাটুনি ভারী ;
মাঠের শেষে
তালের সারি ।

তাকাই দূরে
শূন্যে ঘুরে
চিল্ ফুকারে
মাঠের পারে ।
গরুর বাথান,—
গোয়াল-থানা,—
ওই গো ! গাঁয়ের
ওই সীমানা !

বৈরাগী সে,—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁথে
লেপছে কাদা ;
মটকা থেকে
চাষার ছেলে
দেখছে—ডাগর
চক্ষু মেলে !—
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি ;
বৈরাগীটির
মূর্তি শুচি ।

পেরজাপতি
হলুদ বরন,—
শশার ফুলে
রাখছে চরণ !
কার বহুড়ী
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ;—
এ টো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথায়
কাপড় গোছায় !

পাকী দেখে
আসছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে !

পোড়োর আওয়াজ
যাচ্ছে শোনা ;—
খোড়ো ঘরে
চাঁদের কোণা !
পাঠশালাটি
দোকান-ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে !
পোড়ো ভিটের
পোতার 'পরে

শালিক নাচে,
ছাগল চরে।

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাটকা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

গ্রামের সীমা
ছাড়িয়ে, ফিরে
পাল্কী মাঠে
নামল ধীরে ;
আবার মাঠে,—
তামার টাটে,—
কেউ ছোটে, কেউ
কষ্টে হাঁটে ;
মাঠের মাটি
রৌদ্রে ফাটে,
পাল্কী মাতে
আপন নাটে !

শঙ্খচিলের
সঙ্গে, যেচে—
পাল্লা দিয়ে
মেঘ চলেছে !

তাতারসির
তপ্ত রসে
বাতাস সাঁতার
দেয় হরষে !
গঙ্গাফড়িং
লাফিয়ে চলে ;
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে ।

পাল্কী চলে রে !
অঙ্গ ঢলে রে !
আর দেরি কত ?
আর কত দূর ?
"আর দূর কি গো ?
বুড়ো-শিবপুর
ওই আমাদের ;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা ।"

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে ;
সূর্য ঢলে,
পাল্কী চলে !

মুগ্ধা

ওই রূপে মোর মন ভুলেছে, ভরেছে মন মোহন রূপে !
জেগে তোমায় স্বপন দেখি, তোমার রূপে যাচ্ছি ডুবে !

ওগো আমার দখিন হাওয়া! অসীম তোমার দক্ষিণতা,
ওগো আমার তমাল ছায়া! তপ্ত জনের ঘুচাও ব্যথা;
ওগো শ্যামল শাওনী মেঘ! স্বপ্নে তোমায় চায় যে যুথী,
ওগো আমার গায়ক গুণী! ওগো আমার গানের পুঁথি!
এই গিয়েছ কাছটি থেকে,—ভাবছি ছুটে যাই এখুনি,
বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-ভুল-বকুনি;
হায় গো বিধির এমনি বিধান মিলন-বেলাই অল্প-আয়ু,—
শীতের বেলার চেয়েও খাটো,—বইছে তবু দখিন বায়ু!
ফুল-জাগানো দখিন হাওয়া,—দিল্-জাগানো দক্ষিণতা;
মিলন-মেলা যায় ফুরায়ে, ফুরায় না হায় মনের কথা।
দূরে কেন যায় গো লোকে,—আমি যে চাই থাকতে কাছে,
আনাগোনা ফুরিয়ে দিয়ে কাছে থাকায় দোষ কি আছে?
এস কাছে প্রিয় আমার—এস আমার জনম ভরি';
একলা ঘরে ওগো! আমি তোমার কথা স্মরণ করি!
আসতে তোমায় হবেই হবে—অগৌণেতেই আসতে হবে,—
জেগে ভাল ফেল্‌লে বেসে—স্বপ্নে ভাল বাসতে হবে।

গ্রীষ্ম-চিত্র

বৈশাখের খরতাপে মূর্ছাগত গ্রাম,
ফিরিছে মন্থর বায়ু পাতায় পাতায়;
মেতেছে আমের মাছি, পেকে ওঠে আম,
মেতেছে ছেলের দল পাড়ায় পাড়ায়।
সশব্দে বাঁশের নামে শির
শব্দ করি' ওঠে পুনরায়,
শিশুদল আতঙ্কে অস্থির
পথ ছাড়ি' ছুটিয়া পালায়।

স্তব্ধ হয়ে সারা গ্রাম রহে ক্ষণকাল,
রৌদ্রের বিষম ঝাঁঝে শুষ্ক ডোবা ফাটে ;
বাগানে পশিছে গাভী, ঘুমায় রাখাল,
বটের শীতল ছায়ে বেলা তার কাটে।
পাতা উড়ে ঠেকে গিয়ে আলে
কাক বসে দড়িতে কুয়ার ;
তন্দ্রা ফেরে মহালে মহালে,
ঘরে ঘরে ভেজানো দুয়ার।

সাড়ে-চুয়াত্তর

দূর থেকে আজ ওগো তোমায় মনের কথা কই,
নূতন খবর নেই কিছু আজ মনের খবর বই।
ভাবছি আমি কোথায় তুমি হায় সে কতদূর,
কোথায় শহর কলকাতা আর কোথায় কুসুমপুর !
না জানি কি ভাবছ এখন করছ কিবা কাজ,
কার সাথে বা কইছ কথা ? পরেছ কোন্ সাজ ?
ইচ্ছা করে হাওয়ার ভরে তোমার কাছে যাই,
করছ যে কি পিছন থেকে লুকিয়ে দেখি তাই।
ইচ্ছা করে শুনতে তোমার বচন সোহাগের,
ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে ঢের !
ইচ্ছা করে কত কি যে—সাধ যে জাগে আজ,—
শাদার পরে কালি দিয়ে লিখতে সে পাই লাজ।
তবে যদি না পড় সে দিনের বেলায় আর
তবে লিখি,—লিখতে সে লোভ হচ্ছে যে বারবার !
হচ্ছে সে লোভ, কিন্তু, ওগো !—প'ড়ো না এর পর,
আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়াত্তর ;
এইখানে শেষ করতে হবে দিনের বেলায় পাঠ,
রাতের পড়া রাতে হবে, ভাঙলে লোকের হাট।

বাকিটুকু শোবার বেলায় বন্ধ ক'রে ঘর
একলা খুলে দেখতে হবে রেখে শেজের পর ;
সেই গোপনে মনে মনে পোড়ো চিঠির শেষ,
নিদ্-মহলে বন্ধু ! আমার আজি হবে পেশ।
সেই গোপনের আবরণে, জানাই তোমার পায়,—
একটি তোমার চুমার লাগি পরান কাঁদে, হায় !
দিয়ো দিয়ো একটি চুমা আমার চিঠির গায়,
প্রদীপ যদি হাসতে থাকে নিবিয়ে দিয়ো তায়।
দাও যদি সে পাবই আমি, পাবই আমি টের,
হাওয়ার আগে হবে বিলি বার্তা হৃদয়ের।
আস্‌বে স্বপন তোমার বেশে মুদলে আঁখির পাত,
কাটবে সারা রাত্রি সুখে বন্ধু ! প্রিয় ! নাথ !
দূর থেকে সুর লাগবে বীণায়,—জাগবে গো অন্তর,
আমার চিঠির মাঝখানে তাই সাড়ে চুয়াত্তর।

গ্রীষ্মের সুর

হায় !
বসন্ত ফুরায় !
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহুঃ কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্ছিত দশদিক্ !
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায় !

হায় !
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ !
সংবর ও মূর্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্ছি' বুঝি পড়ে,—আর সে ছুটাবে কত দূর ?
সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে !
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে !
তৃপ্তি নাহি পায় !
হায় !

হায় !
সান্ত্বনা কোথায় ?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উষ্মা-মনে ;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম মযূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !
হর্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ঝরে,
হাতে মাথে ধুনি জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত আশীর্বাদ,
দীর্ঘ দিন যায়,
হায় !

হায় !
হৃদয় শুকায় !
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল !
মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অনুৎসুক,—ধুকধুক করে শুধু প্রাণ
কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্‌যোগ !
নাহি বাষ্প-বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর ;
দগ্ধ দেশ তৃষ্ণায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায় ;
হায় !

অন্তঃপুরিকা

আর যে আমার সইছে নারে সইছে না আর প্রাণে,
এমন করে কতদিন আর কাটবে কে তা' জানে !
দিন গুণে দিন ফুরায় নাকো নিমিষ গণি তাই,
বুকের ভিতর হাঁফিয়ে ওঠে, আকুল চোখে চাই।
যেখানটিতে বসত সে জন বসছি সেথায় গিয়ে,
দেখছি খুলে চিঠিটি তার ঘরে দুয়োর দিয়ে ;—
বেশী আমি পাইনি যে গো পাইনি বেশী আর,
পারে যাবার একটি কড়ি একটি চিঠি তার।
হাসিয়েছিল কোন্ কথাতে,—হাসছি মনে ক'রে,
দেখতে হঠাৎ ইচ্ছে হয়ে চক্ষু এল ভ'রে।
শোবার ঘরে কবাট এঁটে ছবিটি তার লিখি,
হয় না কিছু,—সেইটি তবু নয়ন ভ'রে দেখি।
নানান কাজে ব্যস্ত থাকি, তবুও কেন ছাই,
মনটা ওঠে আকুল হয়ে, উদাস হয়ে যাই।

ডানা যদি দিতেন বিধি উড়ে যেতাম চ'লে,
সকল ব্যথা সইত, মাথা রাখতে পেলে কোলে।
সীতা সতী বুদ্ধিমতী,—প্রণাম করি পায়,—
আজ বুঝেছি বনে কি সুখ, কি দুখ অযোধ্যায়।

আনন্দ-দেবতার প্রতি

এস প্রমোদ! পুলক! রভস হে!
আমি মুছেছি অশ্রুধার;
আজ মুকুল নহে তো অবশ হে!
তায় নীহার নাহিক আর।

আজ ধরণী আঁচলে আবর' গো
যত কালিকার ঝরা ফুল,
পাখী কাকলি-কূজনে কুহর' গো
নদী গাহ গাহ কুলুকুল!

তবু নীহারে শিহরে ফুলদল!
পাখী নীরব পুনর্বার!
নদী ভাসাইয়া আনে অবিরল
শুধু চিতার ভস্মভার!

আমি শ্মশানে বাসর রচিব গো
পরি' শুষ্ক ফুলেরি হার;
আমি নয়ন উপাড়ি রুধিব গো
এই নয়নের বারিধার!

এস রভস-দেবতা! বঁধুয়া হে!
তুমি এস সখা একবার,
আমি রাখিব রাখিব রুধিয়া হে!
এই নয়নের বারিধার!

দরদী

(বাউলের সুর)

মনের মরম কেউ বোঝে না !
(এরা) হাসলে কাঁদে, কাঁদলে হাসে !
(আহা) দরদ দিয়ে কেউ দেখে না,
(ওগো) গরজ নিয়ে সবাই আসে ।
(যে জন) হিয়ার হাসি কান্না বোঝে
(ওগো) ছিলাম আমি তারি খোঁজে,
(হায় রে) কাটল বেলা ভাঙল মেলা
(তবু) বসেই আছি আসার আশে ।
বন্ধু ! তোমায় বলব বা কি ?
আড়াল থেকেই মিলাই আঁখি,
(আমি) প্রাণের খবর পাইনে চোখে
(শুধু) মুখ-চাওয়া সার দ্বারের পাশে ।
(ওগো) মরমী কেউ মিল্‌ত যদি
(তবে) বইতো উজান জীবন-নদী—
(ওগো) নিরবধি সেই দরদীর
(মোহন) বাঁশীর সুরে প্রেমোল্লাসে !

রিক্তা

(মালিনী ছন্দের অনুকরণে)

উড়ে চ'লে গেছে বুলবুল,
শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর ।

রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।

ফিরিবে কি হৃদি-বল্লভ
পুষ্পহীন শুষ্ক কুঞ্জে ?
জাগিবে কি ফিরে উৎসব
খিন্ন এই পুষ্প পুঞ্জে ?

ভাঙনে ভেঙেছে মন্দির
কাঞ্চনের মূর্তি চূর্ণ,
বেলা চ'লে গেছে সন্ধির,—
লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ।

কনক-ধুতুরা

কনক-ধুতুরা ! কনক ধুতুরা
পরিপূর্ণ তুমি বিষে ;
ও তনু-পাত্রে অতনু-সুষমা
উপচি' উঠিল কিসে ?

তুমি অপরূপ ওগো রূপবতী !
অপরূপ তব কথা !
মুকুলিত করি' তুলিছ কেবলি
মৃত্যু ও মাদকতা !

উথলি' উঠিছে একটি বৃন্তে
দুখের সঙ্গে সুখ,
মৃত্যু-অভেদ জীবন-নৃত্য !—
মনে করে উৎসুক !

সোনার গেলাসে মুগ্ধ মদিরা !
কর্ণে কী কথা জপে !
ফেনগুঞ্জনে মত্তলোচনে
মৃত্যুর হাসি সঁপে !

কনক-ধুতুরা ! কনক-ধুতুরা !
কিসে তুমি পরিপূর ?
মুগ্ধ নয়নে আমি তোর পানে
চেয়ে আছি তৃষাতুর ।

চাতকের কথা

হে সরসী ! তুমি স্বচ্ছ শীতল,—
বলেছে আমায় অনেক পাখী ;
হায়, আমিও তৃষিত, তবু তোর পানে
নারিনু নারিনু ফিরাতে আঁখি !

তুমি সুন্দর, তুমি সুবিপুল,
সুলভ তোমার অগাধ বারি,
মোর সমুখে রয়েছ নিশিদিনমান
তবু তো ও জল ছুঁইতে নারি !

নিয়ত আকাশে আশাপথ-চাওয়া,
নিত্য নিয়ত তৃষার জ্বালা,
তবু তোর 'পরে মোর ফিরিল না মন,
হায় গো রূপসী সরসীবালা !

ওগো বাঁধাজল ! করি' কোলাহল
দর্দুরদল বন্দে তোরে,
হায় কাকের ভেকের তুমি আরাধ্যা,—
আমি তোরে সেবি কেমন ক'রে ?

নিন্দা তোমায় করিনে গো আমি,—
নাই নাই মনে ঘৃণার কণা ;
হায় খেলা-ছলে হেলা করিনে তোমায়,—
পাইনি তেমন কুমন্ত্রণা ।

তৃষ্ণা আমায় দিয়েছেন বিধি,—
সে তৃষা ফটিক-জলের তৃষা,
ওগো শান্তির আশা সুদূর আমার,—
দহন আমার দিবস-নিশা !

আমি মেঘের রন্ধ্রে করি আনাগোনা,
বিজলীতে জ্বলি' ফুকারি 'ত্রাহি' !
তবু উধাও-ধাওয়ার হঠাৎ-পাওয়ার
চকিত-চাওয়ার তুলনা নাহি ।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী ;
তাই পুষ্কর মেঘে মজে আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি ।

হে সরসী ! তুমি তারার আরসী,—
স্বচ্ছ অগাধ আরামে ভরা ;
তবু আকাশে জলের রয়েছে যে দ্রোণী
সেই চাতকের তৃষ্ণা-হরা ।

ঝোড়ো হাওয়ায়

ঝোড়ো হাওয়ায় রোল উঠেছে কোলাহলের সাথ !
আকাশ জুড়ে অকালে ওই ঘনিয়ে আসে রাত !
আজকে যারা ফিরত ঘরে
হারাল পথ পথের 'পরে
ধূলায় আঁখি বন্ধ, হ'ল অন্ধ অকস্মাৎ ।

ভাঙায় গাছের ডাল টুটছে বিষম ডামাডোল,
জলে নায়ের হাল ছুটিছে,—বোল রে হরিবোল ।
তূর্ণ ছোটে ঘূর্ণি হাওয়া
ফুরায় বুঝি পারে যাওয়া ;
পান্থ পাখী পাল্‌টে পাখা নিল মাঠের কোল ।

যোজন জুড়ে মেঘে মেঘে বজ্র-আকর্ষণ,
বহুক হাওয়া ক্ষুরের ধারে,—হবে সুবর্ষণ ।
গম্ভীরা যে বুকের 'পরে
বসে আছে আড়ম্বরে,—
দম্ভটা তার খর্ব হবে,—এ তার নিদর্শন ।

ঝোড়ো হাওয়ার রোল শুনে আজ মেতেছে পরান !
সাবধানী ! তুই আজকে কারে করিস্ রে সাবধান ?
মৃত্যু যে আজ চোখের আগে
নাচে মিলন-অনুরাগে,
বাহুতে তার মিলিয়ে বাহু গাইতে হবে গান !

ঝড়ের তালে নাচবে ধূলি উড়িয়ে ধূসর কেশ ;
রুদ্রজটা পড়বে ছিঁড়ে—জুড়িয়ে যাবে দেশ ;
স্বর্গ হতে গঙ্গা ঝরে
দিবে ভুবন স্নিগ্ধ করে ;
কুম্ভীরের ওই জিহ্বা-তালুর ঘুচবে পিঙ্গ বেশ ।

জানি আমি অপূর্ব ওই রুদ্র গঙ্গাধর,
যেথাই দাহ সুদুঃসহ সেইখানে তার ভয়।
দুখের আদি,—সুখের নিদান,—
তারি বরে দুঃখ-নিধান
মরণ করে অমৃত দান, শিব সে—ভয়ংকর!

ছুটুক না সে রুদ্র মরুৎ, নাই তো কোন ভয়—
চেতন-জড়ে না হয় হবে পাগড়ি-বিনিময়;
নিশ্বাসে যাঁর ঝঞ্ঝা ছোটে,—
প্রশ্বাসে প্রশান্তি ফোটে,—
তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে মোরা মরণ করি জয়।

বজ্র কামনা

হায় শূন্য জীবন নীরস হৃদয়
নীরব দহনে দহে,
আর লুপ্ত অশ্রু মরমের তলে
ফল্গু-ধারায় বহে;
ওগো রুদ্র আকাশ নিথর বাতাস
অন্ধ হুতাশে ভরে,
আজ বরষণ-লোভে বিবশা ধরণী
বজ্র কামনা করে!
হায় কুম্ভীরকের পিঙ্গল তালু—
আকাশ পিঙ্গ ছবি,
তার জিহ্বার মত প্রান্তর ঢালু
রৌদ্রে শুষিছে রবি;
হায় খাকী রঙে খাক হ'ল দুই আঁখি
দুনিয়াটা গেল খ'য়ে,

তাই ঘন-বরষণ-লালসে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

আজ সুখ নাহি দেহে বিশ্রাম গেহে
স্বস্তি নাহিক প্রাণে,
যেন আঙার-ধানীর বাষ্প বিভোল্
শ্বসিছে সকল খানে !
নাই নাই ফুল ফল, ফলেনি ফসল,
ধূ ধূ ধূ তেপান্তরে,
হায় ফলের লালসে বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে !

ওগো ঝিলমিল করে বহিবে সলিল
ফেনমুখ ফণা তুলি' ?
আর ঝিলমিল করে দুলিবে সমীরে
তাজা অঙ্কুরগুলি ?
ওগো খালি কোল করে ভরিবে আবার—
আর কত দিন পরে ?
হায় সফলতা লাগি মৌনে ধরণী
বজ্র কামনা করে !

ওগো বজ্রের রাজা অস্ত্র তোমার
হান একবার বেগে,—
এই ক্ষীণ বাষ্পের দীন উচ্ছ্বাস
পরিণত হোক্ মেঘে ;
ওগো ঘনায়ে মিলায়ে কর সুনিবিড়
তড়িত-জড়িত স্বরে,
আজ বধ-ভয় ভুলি' বন্ধ্যা ধরণী
বজ্র কামনা করে !

ওগো বজ্র-দেবতা বজ্র তো শুধু
বধের যন্ত্র নয়,
ও যে বন্ধ্যা-জনের সন্তাপ-হারী,—
বন্ধন করে ক্ষয় ;
ও যে মিলন ঘটায় কাঞ্চন-ডোরে
ধরণী ও অম্বরে,
তাই বন্ধ্যা ধরণী মরণ-দোসর
বজ্র কামনা করে।

যক্ষের নিবেদন

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্ত্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক ;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করহে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস !
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন !

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;

ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দু'জনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা সে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল-ধার।

নির্মল হোক পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোক ;
চঞ্চল খঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ ;
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
'বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক'—বন্ধু ! বন্ধুর আশিস লও !

দুর্দিনে

মলিন আঁচল চক্ষে চাপিয়া
কে তুমি ভুবনে এলে,
অসীম অকূল দুর্ভাবনার
পাংশুল ছায়া মেলে !

হে নীরবচারী, বুঝিতে না পারি
মুখে কেন নাহি ভাষ,
কোন্ অশ্রুর অতলে ডুবিয়া
হিম হয়ে গেছে শ্বাস ?

ছিন্ন-বসন ! রিক্ত-ভূষণ !
গভীর-শ্বসন ! ওরে !
কেন গুমরিয়া উঠিস্ কাঁদিয়া ?
কি বেদনা বল্ মোরে।
বিহ্বল সুর ডাকে দর্দুর,
চাতক উড়িয়া বসে ;
মদালস তব মূরতি—সে কোন্
শোকের মাদক রসে !

সহসা শিহরি' চীৎকার কেন
করিলি, রে উন্মাদ,
রুদ্ধ ব্যথার রূঢ় তাড়নায়
এই কি আর্তনাদ !
ত্রাসে মুদে এল বিশ্বলোকের
আয়ত চোখের পাতা,
আধা শাদা হয়ে গেল শঙ্কায়
বিকচ নীপের মাথা !

অকালে দিনের আলোক হরিয়া
কে এলে গো চুপে চুপে,
বিজুলির হাসি পাণ্ডুর করি'
দেখা দিলে ছায়ারূপে !

আঁচল তোমার তিতিয়া ভূতলে
অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
বেদনায় তরু-বল্লরী বীথি
এ পাশ ও পাশ নড়ে।

ওগো দুর্দিন! কে পূজিল তোমা
ভূঁই-চাঁপা ফুল দিয়া!
চাঁদ-আঁকা পাখা দোলায় ময়ূর
বিস্ময়াকুল হিয়া।
মূর্ছিত ধরা আঁখি মেলে, তোরে
পাইয়া ব্যথার ব্যথী,
খুলে গেল তার হাজার নেত্র,
ফুটিল হাজার যূথী।

ওগো কামচারী! সন্তাপহারী!
অন্তর তুমি জানো,
বিষাদের বেশে এসে দেখা দাও,
ব্যথিতে বক্ষে টানো;
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতের সাথে
অশ্রু মিশাতে হয়,—
তুমি তাহা জানো, বন্ধু পুরানো!
দুর্দিন সহৃদয়!

ওগো দেবতার অশ্রু প্লাবন!
তোমার পাবন-ধারে
মলিনতা তাপ ঘুচাও মহীর
উর্বর কর তারে;

নীলপদ্মের মথিত নীলিমা
ব্যথিত চক্ষে দাও,
ঘন চুম্বন দান কর, ওগো,
বুকে নাও! বুকে নাও!

অভয়

মেঘ দেখে কেউ করিস্ নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে!
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে!
দখিন হাওয়ার অমোঘ বরে
রিক্ত শাখাই পুষ্পে ভরে,
সিক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে!

বর্ষা

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগলী জেগেছে,
ছাইমাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়ে ছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্র-হাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকেয়ে রে !

ময়ূর বলে, 'কে গো ?' এ যে আকুল-করা রূপ !
ভেকেরা কয় 'নাই কোনো ভয়', জগৎ রহে চুপ ;
পাগলী হাসে আপন মনে পাগলী কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায় ।

কোন্ মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে একরাশ
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল্ হাওয়ায় আজকে আমার পাগলী মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্য-শশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

নাগ-পঞ্চমী

হায় ! প্রতি বৎসরে
হাজার হাজার সোনার মানুষ নাগ-দংশনে মরে !
সেই নাগে মোরা পূজি !
সর্প-পূজার মন্ত্রের লাগি' বেদ-সংহিতা খুঁজি !
নাগ-পঞ্চমী করি !
গ্রন্থিল বাঁকা হিন্তাল-শাখা ধরিতে আমরা ডরি !

দুধকলা দিই সাপে !
পূজা খেয়ে খল দংশন করে !—মরি গো মনস্তাপে।
জানিনে কিসে কি হয়,—
মৃত্যুরে পূজি' অমরতা লাভ,—কিছু বিচিত্র নয় !

রামধনু

পুণ্য আখণ্ডল-ধনু মণ্ডিত কিরণে,
রম্য তুমি জলদের নীল শিলাপটে,
স্ফুরিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে
রচিত ও তনুচ্ছদ ; ধূর্জটির জটে।

ধূপছায়া শাটি-পরা জাহ্নবীর মত
মেঘমাঝে মূর্তিখানি মনোজ্ঞ তোমার
শ্যাম অঙ্গে রাখী সম, শোভন সতত ;
হর্ষ-কলতান বিশ্বে তোল বারংবার !

ইন্দ্রধনু তুমি কিহে পুরাণ-বর্ণিত ?
কিংবা রামধনু নাম যথার্থ তোমার ?
প্রজা-বৎসলের কর করি' অলংকৃত
লভিছ কি আজো তুমি শ্রদ্ধা সবাকার

রামধনু ! রামরাজ্য অতীতে বিলীন,
তুমি তারি রম্য-স্মৃতি চির-অমলিন।

প্রাবৃটের গান

দাঁড়া গো তোরা ঘিরিয়া দাঁড়া নীরব নত নেত্রে,
দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে !

শুনিস নে কি ঘর্ঘরিয়া
চলেছে কে ও স্বর্গ দিয়া,
গগন-পথে বিপুল রথে হেলায়ে হেম বেত্রে !

আবৃত-করা প্রাবৃট্ এল মেলিয়া মেঘ-পক্ষ,
বিবশা ধরা বিতথ বেশ, শ্বসিছে মুহু বক্ষ।
অজানা ভয়ে অচেনা সুখে
কথাটি কারো নাহিক মুখে,
পাখীর গেছে বচন হরি' আঁখির থির লক্ষ্য !

বৃহৎ সুখে বৃংহিতে কি দিগ্‌গজেরা গর্জে ?
মিলাবে কি ও অমরা ধরা আকাশ ভাঙি বজ্রে ?
ধরণী আছে প্রতীক্ষাতে
অর্ঘ্য ধরি' স্নিগ্ধ হাতে,
সূচিত স্বরভঙ্গ তার কেকায় রবে ষড়্‌জে

দাদুরী করে উলুধ্বনি, দেবতা নামে মর্ত্যে,
উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপেরি পরিবর্তে !
স্তব্ধ চলা, বন্ধ খেয়া,
একাকী উঁকি দেয় গো কেয়া,
জ্বালায়ে মণি জাগিছে ফণী ত্যজিয়া নিজ গর্তে।

দেবতা নামে ! পুলকে হের দ্যুলোকে দোলে সিন্ধু !
রথের ধূলে মলিন হ'ল তপন তারা ইন্দু !
বাদল-বায়ে মন্ত্র পড়ি'
বাজায় কে ও সাঁঝের ঘড়ি ?—
থাকিতে বেলা ! বিধান বিধি মানে না একবিন্দু !

অন্ধ-করা অন্ধকারে নাহিরে নাহি রন্ধ্র !
বিরামহারা অধীর ধারা পাগল-পারা ছন্দ !
হাজার-তারা সেতারখানি
বলিছে কি ও ডাগর বাণী !
তরল তারে উঠিছে ধ্বনি মেদুর মৃদু মন্দ !

দেবতা চুমে ধরার আঁখি অলক চুমে রুক্ষ !
এলায়ে পড়ে বাদল-মালা—রুপালী জরি সূক্ষ্ম !
চুমিয়া তনু কুসুমি' তোলে,
হরষ-দোলে পরান দোলে !
সেচনা করে সফল করে মোচন করে দুঃখ।

দাঁড়া গো তোরা রাখীর ডোরা বাঁধিয়া নে গো ত্রস্তে ;
দেবতা আসি' আশিস-ধারা বরিষে আজি মস্তে !
দেখিস্ নে কি নীলাম্বরে
এসেছে করী-কুম্ভ-'পরে,—
আয়ত চোখে বিজুলী লেখা, উষীর মাখা হস্তে !

নূতন মানুষ

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ !— ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে !
দুয়ার 'পরে আমের মুকুল,—
ঝুলিয়ে দে রে অশোক-বকুল,
দেবতা আসে শিশুর বেশে, হায় রে, স্নেহের দান সেধে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নূতন আঁখির সোনার পাতায় সোহাগ-কাজল বুলিয়ে দে !
নূতন আওয়াজ কান্না কাঁদে !
নূতন আঙুল আঙুল বাঁধে।
নূতন অধর পীযূষ পিয়ে নূতন মায়ার ফাঁদ ফেঁদে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
নরম আঁচে সদ্য-দুধের ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে !
প্রাচীন দোলায় নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক !
অরাজকের আপনি-রাজা রাখবে হৃদয়-মন বেঁধে !

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দোলনা ঘিরে কাঁকন কারা বাজায় চামর ঢুলিয়ে রে !
মরণ-বাঁচন-মেলার মাঝে
ওই রে শুভ শঙ্খ বাজে,
পুরানো দীপ চায় গো হেসে, নূতন মানুষ চায় কেঁদে !

প্রথম হাসি

দোলায় ঘরে শুনছি গো আজ নূতন হাসির ধ্বনি
ফুলঝুরিতে ফুল্‌কি হাসির রাশি !
রুপার ঘুঙুর জড়িয়ে হাতে বাজায় কে খঞ্জনী !
কাঁদুনে ওই শিখলে কোথায় হাসি !

পিচকারিতে হানলে কে রে গোলাপ-জলের ধারা ?—
ঝারায় পাখী কয় কি হাসির কথা ?
বরফ-গলা ঝর্ণা যেন জাগল পাগল-পারা !—
স্বচ্ছ প্রাণে সরল চঞ্চলতা !

প্রথম হাসির পান-সুপারি কে দিল ওর মুখে ?
হাসির কাজল কে পরালে চোখে ?
হাসছে খোকা ! হাসছে একা ! হাসছে অতুল সুখে !
এমন হাসি কে শিখালে ওকে ?

কলস্বরে হাসছে ! ওরে ! হাসছে আপন মনে !—
দেখন্-হাসি পরীর হাসি দেখে !
খুলেছে আজ হাসির কুলুপ কোন্ কুঠুরির কোণে,—
মানিকে তাই আকাশ গেল ঢেকে !

আনন্দের এই পরম অন্ন—প্রথম অন্ন—হাসি
কোন্ দেবতা প্রসাদ দিল ওকে ?
কাঁদুনে আজ নূতন ক'রে জন্মেছে রে আসি'
জন্মেছে সে হরষ-হাসি-লোকে !

ভাদ্রশ্রী

টোপর পানায় ভর্‌ল ডোবা নধর লতায় নয়ান-জুলী,
পূজা-শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন কুণ্ডলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মত পুবে বাতাস লাগছে শীতল,
অতল দীঘির নি-তল জলে সাঁতরে বেড়ায় কাতলা-চিতল।

ছাতিম গাছে দোলনা বেঁধে দুলছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া ফুলের রেণুর সাথে ইলশে-গুঁড়ির কোলাকুলি ;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে।

কলকে ফুলের কুঞ্জবনে জ্বলছে আলো খাসগেলাসে,
অভ্র-চিকন টিকুলি জলের ঝলমলিয়ে যায় বাতাসে ;
টোকার টোপর মাথায় দিয়ে নিড়েন হাতে কে ওই মাঠে ?
গুড়-চালেতে মিলিয়ে কায়া ছিটায় গায়ে জলের ছাটে ?

নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূ য়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে ;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠছে বেজে আশার বাঁশী !

বাঁশের বাঁশী বাজায় কে আজ ? কোন্ সে রাখাল মাঠের বাটে ?
অগাধ ঘাসে দাঁড়িয়ে গাভী ঘাসের নধর অঙ্গ চাটে !
আজ দোপাটির বাহার দেখে বিজ্‌লী হ'ল বেঙা-পিতল,
কেয়া ফুলের উড়িয়ে ধ্বজা পুবে বাতাস বইছে শীতল !

তখন ও এখন

(রুচিরা)

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল-বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু,—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াই তো বাস—কে সেই বালা ?
বিপাশ হিয়ার বিনাই তো ফাঁস অলক রাশে,
সুদূর সুদূর স্মৃতিখানি তার হিয়ায় ভাসে।

এখন বিভায় মহামহিমায় আকাশ ভরা,
শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা,
এখন তাহার চেনা হবে দায় নূতন বেশে,
তরুণকুমার কোলে আজি তার হাসায় হেসে।
লুকাও লুকাও লালসা-বিলাস লুকাও ত্বরা,
বাসর-রাতির সাথীটি—সে আর না দেয় ধরা
এখন কমল মেলিতেছে দল সলিল মাঝে,
বিলোল চপল বিজুলী এখন লুকায় লাজে।

কিশোর প্রাণের কোথা সে ফেনিল প্রেমের পাঁতি,
কোথায় গো সেই নব বয়সের নূতন সাথী ;
বিলাস-লীলায় দেখে না সে আর বারেক চাহি,
খেলায় পুতুল কোথা প'ড়ে ?—আজ খবর নাহি !
পুতুল পয়ান পেয়েছে গো তার সোহাগ পেয়ে,
নূতন আলোক প্রকাশিছে তাই আনন ছেয়ে !
নূতন দিনের মাঝে পুরাতন লুকায় হেসে,
নূতন দুয়ার দেউলে ফুটাও নিশির শেষে।

"ওগো"

কিচ্ছু ব'লে ডাকিনেকো তারে,—
ডাকতে হলে বলি কেবল 'ওগো !'
ডাকি তারে হাজারো দরকারে
জীবন-রণে সেই জেনারল টোগো !
সন্ধি এবং বিগ্রহেরি মাঝে
মুহুর্মুহুঃ চাই তারে সব কাজে ;
ডাকতে কিন্তু বাধছে সম্বোধনে,—
ডাকতে গিয়ে এগিয়ে দেখি—'No Go'.
লজ্জা কেমন যোগায় এসে মনে
তাই তো তারে ডাকি সেয়েফ 'ওগো !'

ছলে ছুতায় ডাকছি সকাল থেকে
'চাবিটা কই ?' 'কাগজগুলো ?—ওগো !'
'পানের ডিবে ?—কোথায় গেলে রেখে ?'
হাঁক-ডাকেতে ডাকাত আমি রোখো।
টানতে সদাই চাই গো তারে প্রাণে
শব্দ খুঁজে পাইনে অভিধানে,—

ভাষার পুঁজি শূন্য একেবারে,—
টাঁকশালে তার হয় না নূতন যোগও ;
মন-গড়া নাম চাই রে দিতে তারে,
শেষ-বরাবর কিন্তু বলি 'ওগো !'

বলব ভাবি 'প্রিয়া', 'প্রাণেশ্বরী'
ছেড়ে দিয়ে 'শুনছ ?' 'ওগো !' 'হাঁগো' ;
বলতে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো ।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রাদলের গন্ধ ওতে ভারী,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো ;—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো !

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো',
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও !
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো !'
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো !'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে একচোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো' ।

কাশ ফুল

হোথা বরষার ঘন-যবনিকাখানি
সহসা গিয়েছে খুলি',
হেথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি !

ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তুলি !

যেন রাতারাতি সুধা-ধবলিত করি'
দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তুলি লাখে লাখ
সহসা উঠেছে জেগে !

তারা কিছু রাখিবে না পাংশু ধূসর
কিছু রাখিবে না রুখু,
তারা আকাশের চাঁদে বুলাইতে চায়
আপনার রঙটুকু !

তাই বাতাসের বুকে বুলিছে ধরার
ধৃত-তুলি অঙ্গুলি,
ওগো বাতাসের রঙ ফলাইতে চায়
কাশের ক্ষুদ্র তুলি !

জোনাকি

ওই একটি দু'টি পাতার পরে
একটু মৃদু আলো,
ও যে দেখতে ভারী নূতন, ওরে—
কেমন লাগে ভালো!
আয় জোনাকি বুকটি ভ'রে
একটু নিয়ে আলো,
আজ আঁধার রাতি বাদল সাথী
চাঁদের ভাতি কালো।
যেটুকু তোর দেবার আছে
দিয়ে দে তুই আজ,
ও সে তারার মত নাই বা হ'ল,—
তাতেই বা কি লাজ?
ছোট?—সে তো ভালোই আরো
ছোট বলেই মান;
ও যে দুঃখীজনের ভিক্ষা মুঠি,—
দানের সেরা দান!
থাক না তারা তপন শশী
থাক না যত আলো,—
তাদের মোরা করব পূজা,
বাসব তোরেই ভালো।

ফুল-সাঞ্চি

মনে যে সব ইচ্ছা আছে
পূরবে না সে তোমায় দিয়ে,
তাইতে প্রিয়ে! মন করেছি
আরেকটিবার করব বিয়ে।

হাসছ কি ও ? ভাবছ মিছে ?
মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয় ;—
মন যা' বলে শুনতে হবে,—
মনের নাম যে মহাশয় !

মন বলেছে 'বিয়ে কর'
কাজেই হবে করতে বিয়ে ;—
এবার কিন্তু ফুলের সঙ্গে,—
চলছে না আর মানুষ নিয়ে।

মনের কথা মনই জানে ;
লুকিয়ে কি ফল তোমার কাছে ?
মন সে বড় কেও-কেটা নয়
মনের নিজের মর্জি আছে।

মন বলেছে বাসলে ভালো
পুড়তে হবে এক চিতাতে ;
মৃত্যু আমায় করলে দাবী—
মরতে তুমি পারবে সাথে ?

পারই যদি ;—তাতেই বা কি ?
আইন তোমায় বাঁধবে, প্রিয়ে !
কাজেই দেখ,—যা' বলেছি
চলবে নাকো তোমায় দিয়ে।

এবার বিয়ে ফুলের কুলে,
জ্যোৎস্না-ধারায় অঙ্গ ধুয়ে,
হ'ক সে চাঁপা কিংবা গোলাপ
আপত্তি নেই বকুল জুঁয়ে।

আনব ঘরে কিশোর কুঁড়ি
মনের গোপন পাঁজি দেখে,
বাঁদীর মত আন্‌ব বেছে
বনের বান্দা-বাজার থেকে।

সোহাগ দিয়ে রাখব ঘিরে
ঢাকব কভু প্রাণের নীড়ে,
ইচ্ছা হলে তুলব শিরে,
ইচ্ছা হলে ফেলব ছিঁড়ে

মর্জি হলে হাজারটিকে
পরব গলায় গেঁথে মালা,
ঝগড়াঝাঁটির নেইকো শঙ্কা
সতীন-কাঁটার নেইকো জ্বালা।

নেইকো দ্বন্দ্ব দু' ইচ্ছাতে,—
নেইকো লোকের নিন্দাভয়!
—হাসছ? হাস। কিন্তু প্রিয়ে
করব বিয়ে সুনিশ্চয়।

ফুল-সাঞি যে ফকির আছে
ফুলকে তারা ভালবাসে,
তাদের ধারা ধরব এবার,—
থাকব মগন ফুলের বাসে।

থাকব ডুবে অগাধ রূপে
কুরূপ কাঁটা দেখব নাকো;
ফুল নিয়ে ঘর করব এবার
তোমরা সবাই সুখে থাকো।

তারপরে দিন আসবে যখন
মরতে আমি পারব সুখে,
ইতস্ততঃ করবে না ফুল
থাকতে একা শবের বুকে।

ফুল—সে আমার সঙ্গে যাবে—
পুড়ব মোরা এক চিতাতে ;
দেখিস তোরা দেখিস সবাই
যেতে সে ঠিক পারবে সাথে।

ভেবেছিলাম প্রথম, প্রিয়ে।
তোমায় এসব বলব নাকো,
লুকিয়ে ক'রে আসব বিয়ে
লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও।

কিন্তু ছাপা রইল না, হায় ;
মনের কথা—গোপন অতি—
বেরিয়ে গেল কথায় কথায়,—
কথায় বলে মন-না-মতি !

মনের ভিতর মর্জি আছেন
নবাবী তাঁর অনেক রকম,
মনের কথা বললে খুলে
টিটকারি সে করবে জখম।

লুপ্ত যুগের অস্থিগুলো
গুপ্ত আছে মনের ভিতে,—
সভ্যতার এই সৌধতলেই,—
বর্তমান এই শতাব্দীতে !

তাই মগজের পোড়ো কোঠায়
অন্ধকারে ঘুরছে চাবী,—
বলছে উঠে গঙ্গাযাত্রী ;—
সহমরণ করছি দাবী !

বাঁচন এই যে, সম্প্রতি মন
মগন আছে ফুলের রূপে,—
নইলে কি যে ঘটত বিপদ !
বলব তাহা তোমায় চুপে ?

মরণ-দায়ে গেছ বেঁচে ;
পালাও প্রিয়ে প্রাণটা নিয়ে ;
ফুল-সাঞ্চিদের মতন আমি
ফুলকে এবার করব বিয়ে !

জবা

আমারে লইয়া খুশি হও তুমি
ওগো দেবী শবাসনা !
আর খুঁজিয়ো না মানব-শোণিত
আর তুমি খুঁজিয়ো না।

আর মানুষের হৃৎপিণ্ডটা
নিয়ো না খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুলো না গো আর
সুখের নিভৃত নীড়ে।

এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া
উজলি' পুষ্প-সভা,—
ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ড, গো !—
আমি সে রক্তজবা।

তোমার চরণে নিবেদিত আমি
আমি সে তোমায় বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙা খর্পরে
রক্ত-কলিজা কলি।

আমারে লইয়া খুশি হও ওগো !
নম দেবী নম নম,
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ
ধরার শিশুরে ক্ষম।

ছায়াচ্ছন্না

ছিন্ন ছায়া ঘনিয়ে এল
ঘুমে নয়ন আলা,
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা ;
হাওয়ার ভরে যায় পরীরা,
ঢেউয়ের ফণার নিব্‌ল হীরা,
জড়িয়ে গেল ললাট ঘিরে
নিদ্‌কুসুমের মালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !

তোলেনি আজ বৈকালী ফুল,—
ভরেনি আজ থালা,
ছায়ায় ছাওয়া রূপের রসের
ডালা ;
গন্ধ তৃণের গহন শ্বাসে
শিউলি কুঁড়ি ঝিমিয়ে আসে,
তন্দ্রা-ভারে পড়ল ভেরে
আঁধারে ডাল-পালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !

শিয়রে থোও সোনার কাঠি
সন্ধ্যা-মেঘে ঢালা,
খণ্ড চাঁদের দীপখানি হোক্
জ্বালা ;
হাওয়ার মুখে নাই কোনো বোল,-
অশথ পাতায় দেয় না সে দোল,
আঁধার শুধু কোল ভরেছে,—
হিমে শীতল—কালা !
ঘুমাক্ আহা ঘুমাক্ তবে
বালা !

শুনবে না সে আজ ঝিঁঝিদের
রাত্রিব্যাপী পালা,
দেখবে না গো বনে জোনাক্-
জ্বালা ;
পর্দাখানি দাও গো টানি'
ঘুমিয়ে গেছে আলোর রানী,

লুপ্ত-শিখা সোনার প্রদীপ
মৃত্যু-ভুবন আলা ;—
ঘুমিয়ে গেছে ঘুমিয়ে গেছে
বালা।

সৎকারান্তে

রেখে এলাম একলা-যাবার পথের মোড়ে ;
সেই কথাটি জানাই প্রভু ! করজোড়ে !
নেহাৎ শিশু নয় সেয়ানা,
অচেনা তার ষোল আনা,
ভয় যদি পায় নিয়ো তুলে অভয় ক্রোড়ে,
প্রভু আমার ! একলা-চলা পথের মোড়ে।

তোমার পায়ে সঁপে দিয়ে—নির্ভাবনা ;
নইলে প্রভু ! সইতো কভু যম-যাতনা ?
যম—নিয়মের ভৃত্য তোমার,—
চিতার শিখা অঙ্গুলি তার,
সেই আঙুলে নেয় সে চুনি' রত্ন-কণা ;
তোমার হাতে সঁপে সে হয় নির্ভাবনা !

সঁপে গেলাম প্রভু ! তোমার চরণ-ছায়ে,—
মুক্ত হলাম তোমার দয়ায় সকল দায়ে ;
ফিরিয়ে তোমার গচ্ছিত ধন
হাল্কা হয়ে গেল জীবন,
মায়ের বুকের রত্ন দিলাম বিশ্ব-মায়ে,
ওগো প্রভু ! সঁপে গেলাম তোমার পায়ে

রেখে গেলাম তুমি-দোসর পথের মোড়ে,
সেই কথাটি জানাই তোমায় করজোড়ে ;
জানি তুমি নেবেই কোলে,
তবু তোমায় যাচ্ছি ব'লে—
বিশ্বমায়ে বলছি,—অবোধ,—নিতে ওরে ;—
দাঁড়িয়ে তোমার যম-জাঙালের বক্র মোড়ে।

ছিন্ন-মুকুল

সব চেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে ;
বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,—
খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ;
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে' ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি !

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে,—
দিনের আলো গেছে আঁধার করে ;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধরে।
চ'লে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝি !
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি।

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশানঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশান-বাসী

সব চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে ;
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

ভুঁইচাঁপা

দিনের আলোয় লাগ্‌ল রে নীল তন্দ্রা-লেখা !
নিবিড় সুখে কি কৌতুকে বাজ্‌ল কেকা
রসিয়ে রবি-রশ্মি হোথা
পুবে-হাওয়ায় বইল সোঁতা,—
আজ পাতাল-ঘরের নাগিনী ওই বাইরে একা !

কৌতূহলী কেকাধ্বনি মূর্তি ধরে !—
ফুটল সে ভুঁইচাঁপা হয়ে মাটির 'পরে !
বিস্ময়েরি বোল বেজেছে,
বিনা-ডালেই ফুল সেজেছে,
ওই লুপ্ত গাছের গোপন মূলে কী মন্তরে !

শাঁওল-বরন শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি,
মাটির কোলে পাপড়ি মেলে ভুঁইচাঁপাটি !
মগন ছিল পাতাল-তলে
জাগ্‌ল সে আজ কিসের ছলে ?—
বুঝি ঠেক্‌ল মাথায় বৃষ্টিধারায় রুপার কাঠি !

বেরিয়েছে তাই পাতাল-পুরীর রত্ন-কণা !—
লক্ষ-ফণা অনন্তেরি একটি ফণা !
আন্‌ জনমের নষ্ট মুকুল,
এই দিনের এই ফুটন্ত ফুল,
ওগো যুক্ত সে কোন্‌ গোপন সূতায়—অদর্শনা।

দিনের আলোয় লাগছে আজি তন্দ্রা চোখে,
নিবিড় নীলে ডুবিয়ে নিল স্বপ্নলোকে !
পাতালপুরীর কুণ্ড হতে
অমৃত কে বহায় স্রোতে !
ওগো জন্ম-মরণ যুক্ত ক'রে ফুটল ও কে !

আজকে খালি ফিরে-পাওয়ার বইছে হাওয়া !
নেই কিছু নেই চিরতরেই হারিয়ে-যাওয়া !
হারানো ফুল ফুটছে ফিরে
শাঁওলা মাটির আঁচল ঘিরে !
ওই মূলের ঘরে মিল্ যে আছেই—যাবেই পাওয়া

ধূলি

জীবনের লীলাক্ষেত্র পুণ্য ধরাতল,
প্রতি ধূলিকণা তার পবিত্র নির্মল।
মানবের হর্ষ, ব্যথা, মানবের প্রীতি,
মানবের আশা, ভয়, সাধনার স্মৃতি,—
স্পন্দিত করিছে তার প্রত্যেক অণুরে
নিত্য নিশিদিনমান ; অবিশ্রাম সুরে
উঠিছে গুঞ্জন গান অশ্রুত-মধুর—
অতীতের প্রতিধ্বনি বিস্মৃত সুদূর !
এই যে পথের ধূলি উড়ায় বাতাস
মহামানবের ইহা মৌন ইতিহাস ;
তীর্থময় মর্ত্যলোক ; প্রতি রেণু তার
আনন্দ-গদ্‌গদ চির অশ্রু-পারাবার।

মাটি

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির-চমৎকার,
চরণে লীন এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,
এই মাটি গো এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয়।

মাটি তো নয়— জীবন-কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার!
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আরেকটি দিন অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুবেল!

মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয় লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয়!
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সূতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই!

গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য-হাসি,
তরঙ্গে সংগীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি
অয়ি সুরধুনী-ধারা! অমোঘ তোমার আশীর্বাদ!
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর প্রসাদ!

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্বর
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্তি তোর গাহে নিরন্তর,
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ-মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা! সর্বতীর্থময়ী তুমি মাতা!

তোরে ঘিরি' উর্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা;—
তীরে তীরে প্রেতভূমে; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী!
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব-নাশিনী।

অমল পরশ তোর বড় স্নিগ্ধ মাগো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্রকন্যা তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে।

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়,—
ভস্ম মিলে ভস্ম সনে,—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার।

পর্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারংবার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

শোণ নদের প্রতি

সৈকত-শয্যার 'পরে সুবিশাল বাহু যেন কার
সূচনা করিয়া শুভ স্ফুরিয়া উঠিছে বারংবার
বলদৃপ্ত, কাঞ্চন-বরন ! হে হিরণ্য-বাহু নদ,
কোন্ দেবতার তুমি বাহু ? কত ঋদ্ধ জনপদ,
কত গ্রাম, কত ক্ষেত্র—সম্পদে দিয়েছ তুমি ভরি' ;
দিয়েছ—দিতেছ আরো ; নাহি জানি কতকাল ধরি'।

প্রাচীন পাটলিপুত্র—পোষ্য প্রতিপাল্য সে তোমার,
মৌর্যমণি চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরানী অঙ্কে ছিল যার,—
মৌর্যবংশ-স্থাপয়িতা ; যে বংশের প্রতাপে মলিন
সূর্যবংশ।—ধর্মাশোক যাহারে পালিল বহুদিন

জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা। ওগো শোণ! তোমারি শোণিতে
পুষ্ট সে গোবিন্দসিংহ ;—গুরু নামে খ্যাত অবনীতে।

ওগো শোণ! স্বর্ণবাহু! অতীতের মুকুটের সোনা!
তোমার ও ঊর্মিজাল—গৌরবের স্বর্ণ-জরি বোনা!

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি' চাহিনু,—স্বর্ণ-সুষমা মর্ত্যে পড়েছে খসি'!
এ পারে সবুজ বজড়ার ক্ষেত, ও পারে পুণ্যপুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি ;
শারদ দিনের কনক-আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম-চম্পকদল!
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।
জয় জয় বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে ;
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যার নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে ;—
যার রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিল বারবার
ন্যায়-ধর্মের মর্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত-চোখে স্বপন মিলায় আনি'!
এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর,—
—কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।

সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইল আপনায়।
তেজের মূর্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয়;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার,—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।
শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম হেথায় প্রথম করিল প্রবর্তন।
এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্বচনে প্রাণ মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হতে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করেছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত ভকতিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুঁহু হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যার সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব ;
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলন-ধর্মী মানুষ মিলিবে ; এ নহে স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়।

স্ফটিক শিলায় বিপুল বিলাস মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দ-ধাম ছুঁয়ে আছ মরভূমি ;
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসী!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি'?
মধু-বিদ্যায় বিশ্বমানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হোক সকল মানব, জয়ী হোক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্মনাশা।
ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হবেনাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচরব্যাপী চিরজনমের বেদ।
শুদ্ধ হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী তুমি!
ঘোষণা করেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?
দাও সুধা দাও, পরানের ক্ষুধা চির-নিবৃত্ত হোক,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।

অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।
পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো ;
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরনের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক পাশাপাশি মিলেজুলে ;
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয় ! বারাণসী জয় !
অভেদ মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

হিমালয়াষ্টক

নম নম হিমালয় !
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয় !
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর !
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর !
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয় !
নম নম হিমালয় !

নম নম গিরিরাজ !
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ !
নম নম গিরিরাজ !

নম মহামহীয়ান্ !
নত শিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',
ভীম অর্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয়-গান !
নম মহামহীয়ান্ !

নম নম গিরিবর !
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর !
নম নম গিরিবর !

নম নম হিমবান্ !
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নম নম হিমবান্ !

নম নম ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী', তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির-অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর !

নম নম হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরান ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল !

অতীত-সাক্ষী, নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্ব-পূজিত, নম ।

কাঞ্চন-শৃঙ্গ

কোথা গো সপ্ত-ঋষি কোথা আজ ?
কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম,
এস গো তুলিবে যদি !
প্রত্যুষে সে যে ফুটিয়া, প্রদোষে
নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী স্মরিতে একটি
পাপড়ি না রহে, হায় !
কে জানে কখন অপ্সরাগণ
সে ফুল চয়ন করে,
সোনালী স্বপন লেগে যায় শুধু
নরের নয়ন 'পরে !

নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার
ওগো কাঞ্চন-গিরি !
দেব-হস্তের কুমকুম ঝরে
নিত্য তোমারে ঘিরি' !
সোনার অতসী সোনার কমলে
নিত্যই ফুল-দোল !
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস !
হরষের হিল্লোল !
নিত্য আবার বিভূতি তোমার
ঝরে গো জটিল শিরে,
কন্‌কনে হিম তুষার-প্রপাত
সর্পের মত ফিরে !
দিনে তুমি যেন মূর্ত জীবন
রজত-শুভ্র-কায়া,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু
মহা-মরণের ছায়া ;—
আঁধারের পটে যখন তোমার
পাণ্ডু ললাট জাগে,—
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন
তারাগণ চেয়ে থাকে !
তুমি উন্নত দেবতার মত,
উদ্ধত তুমি নহ,
নিগূঢ় নীলের নির্মলতায়
বিরাজিছ অহরহ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে
রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জোয়ার
বিস্ময় নব নব !

এ কি গো ভক্তি ?—বুঝিতে পারি না ;
ভয় এ তো নয় নয়,
সকল-পরান-উথলানো এ যে
সনাতন পরিচয় !
তোমার আড়ালে বাস করি মোরা
তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ রচনা
মুগ্ধ মোদের আঁখি ;
ভূলোকের হয়ে দ্যুলোক কেড়েছ
স্বর্লোক আছ চুমি',
অমর-ধামের যাত্রার পথে
দিব্য-শিবির তুমি !

নম নম নম কাঞ্চন-গিরি !
তোমারে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ
অবনীতে অনিবার !
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে
তোমারি আশীর্বাদে
সোনার কমল চয়ন করেছি
সপ্ত ঋষির সাথে !

মেঘলোকে

গিরি-গৃহে আজ প্রথম জাগিয়া
আহা কি দেখিনু চোখে,
মর্ত্যলোকের মানুষ এসেছি
জীবন্তে মেঘলোকে !

গিরির পিছনে গিরি উঁকি মারে
চূড়ায় লঙ্ঘে চূড়া,
বিন্ধ্যের মত কত পাহাড়ের
গর্ব করিয়া গুঁড়া!
তারি মাঝে মাঝে এ কি গো বিরাজে ?-
এ কি ছবি অদ্ভুত!—
গিরি-উপাধান সানুতে শয়ান
কোন্ যক্ষের দূত ?
চারিদিকে তার তল্পি যত সে
ছড়ানো ইতস্ততঃ,
পাশমোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে
ক্লান্ত জনের মত!
কে জানে কাহার কি বারতা ল'য়ে
চলেছে কাহার কাছে,
বসনের কোণে না জানি গোপনে
কার চিঠিখানি আছে!
সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে
ক্রৌঞ্চদুয়ার পথে ?—
তুষার ঘটার জটিল জটায়
লঙ্ঘিয়া কোনো মতে ?
কূপ, নদী, নদ, সমুদ্র, হ্রদ—
যার যাহা দেয় আছে,
সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে,
পবনের পাছে পাছে—
সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে
করিতে সমর্পণ ?
কিবা, তার শুধু কুটজ ফুলের
জীবন বাঁচানো পণ!

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিয়াছে টলমল ;
দেখিতে দেখিতে বিশা'য়ের এই
পাষাণ-যজ্ঞশালে
শত বরনের সহস্র মেল
জুটিল অচির কালে !
চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহারো
ময়ূর-পুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পরিয়া কেহ বা
দাঁড়াইল সভা ঘিরে !
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া,
অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল হৈম মুকুটে
গিরিরাজ হিমবান্ !
গগন-গরাসী প্রলয়ের ঢেউ,
আদি প্লাবনের স্মৃতি,
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ,
উদ্বেল মহাগীতি,—
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন
সফল হয়েছে কাজে,—
আদি কল্পনা রেখেছে নিশানা
সৃষ্টি-পুঁথির মাঝে !
নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা
যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া, গগন—
ফুঁড়িয়া উঠেছে গিরি !

একি মহিমার মহান্ বিকাশ !—
আকাশের পটে আঁকা,
দ্যুলোকে দুলিছে স্বর্গের জ্যোতি
স্বর্গের স্মৃতি মাখা !
নিখিল ধরার ঊর্ধ্বে বসিয়া
শাসিছে পালিছে দেশ,
বজ্র টুটিছে, বিজুলী ছুটিছে,
নাহি ভ্রূক্ষেপ-লেশ !

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথ-নাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথ-দলের মত !
নীরবে চলেছে গিরি-প্রধানের
সভায় কর্মচয়,
সৃজন, পালন—বহু আয়োজন
ওই সভাতলে হয় ;
কোন্ ক্ষেতে কত বরষন হবে,
কোন্ মেঘ যাবে কোথা,—
সকলের আগে হয় প্রচারিত
ওইখানে সে বারতা ;
শিখরে শিখরে তুষার মুকুরে
ঠিকরে কিরণ-জ্বালা,
মুহূর্তে যায় দেশদেশান্তে
গিরির নিদেশমালা !

বার্তা বহিয়া শূন্যের পথে
মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র-ছায়ার চিত্র বসনে
নানা গিরি-বন ঢেকে ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক্ নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশিছে একেলা চুপে !
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের
নিরিখ সেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হতে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
প'ড়ে থাকে সানু জুড়ে ;
কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্তনে রত !
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোধ্বেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্য-প্রেতের
কলহ হয়নি শেষ !
কৌতুকে মিহি চাঁদের সুতায়
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ !

আমি ব'সে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম-চোখে !
স্বর্গের ছায়া মর্ত্যে পড়েছে,
শান্ত হয়েছে মন,
নয়নে লেগেছে ধ্যানের সুষমা—
দেবতার অঞ্জন ;
চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ
দূরে গেছে গ্লানি যত,
মেঘেরও ঊর্ধ্বে করেছি ভ্রমণ
গ্রহ-তারকার মত !

চূড়ামণি

ডুবেছে সকলি, তবু, শীর্ষ জেগে আছে
জেগে আছে হিমালয় ; সে তো কারো কাছে
কোনোদিন ভ্রমেও হয়নি অবনত !
শক, হূণ, মোগল, পাঠান কত শত
আসিয়াছে মুক্তরোধ বন্যা সম, তবু
পারেনি ডুবাতে কেহ কোনমতে কভু
মহিমা-মণ্ডিত পুণ্য হিমালয়-চূড়ে !
কোলাহল করেছে কেবল ফিরে-ঘুরে।
পরাজয় স্বীকার করেনি হিমালয়।
তুষার-উষ্ণীষ তব কলঙ্কিত নয়
চরণধূলায় কারো, ওগো পুণ্যভূমি !
সকল গ্লানির ঊর্ধ্বে বিরাজিছ তুমি—
লয়ে তব ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্যার বল ;
জগতের চূড়ামণি অটল অচল !

"লরেল"

প্রতীচ্য-কবির চির-সাধনার ধন
তোরে আজি হেরি চক্ষে,—লরেল-পল্লব !
রাজ্যবান্ রাজা হতে পূজ্য যেই জন
সেই লভে লরেলের মুকুট দুর্লভ।

অন্ধকবি হোমরের ছিলি আঁখিতারা
দান্তের 'প্রথমা প্রিয়া' ছিলি সখী তুই ;
তোরে পরশিয়া আজি আমি আত্মহারা,—
ইচ্ছা করে হে শ্যামাঙ্গী ! শিরে তোরে থুই।

প্রকৃতির প্রাণ-দেওয়া প্রাচীন হাপরে
গঠিত পল্লব তোর শ্যামল-কোমল,—
রসের রসান্ করা ; কবি বিনা পরে
অরসিকে রূপ তোর কি বুঝিবে ? বল্ !

চির-হরিতের গড়া তনু সুকুমার,
চির-নবীনের শিরে আসন তোমার।

দার্জিলিঙের চিঠি

বন্ধু,
আমি এখন বসে আছি সাত-শো-তলার ঘরে !
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।
ফিরোজা-রঙ আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্না ঝেড়ে যায় !
অস্তরবির আভাস লাগে পূর্ণিমা-চাঁদে,
শীর্ণ ঝোরা যক্ষ-নারীর দুঃখেতে কাঁদে !

তবু এখন নাই অলকা, নাই সে যক্ষ আর,
মেঘের দৌত্য সমাপ্ত, হায়, কবির কল্পনায়।

*　　*　　*

হঠাৎ এল কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া!
কুহেলিকায় কুহকে হায় সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপ্‌সা হ'ল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ-বিভূতি
বিশ্ব 'পরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি!
সকল গ্লানি যায় ধুয়ে গো দৈব এই স্নানে,—
অরুণ আভা অঙ্গে জাগে আমার পরানে!

*　　*　　*

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াশায়,
গুল্ম ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায়;
নীল আলোকের আবছায়াতে নিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি'-মণির দুল দুলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়!
মেঘ টুটে, ফের ফুটে ওঠে আকাশ-ভরা নীল,—
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল;
শান্তি-হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা?

*　　*　　*

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে!
মেঘের বুকে কিরণ-নারী পিচকারি হানে,
রামধনুকের রঙীন মায়া ছড়ায় বিমানে;
মেঘে মেঘে পান্না-চুনীর লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষারগিরি উদ্যত জাগে!

দিব্য-লোকের যবনিকা গেল কি টুটি' ?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি' ?

গিরিরাজের গায়ত্রী-টোপর ওই গো দেখা যায়,—
স্বর্ণ-সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ-সুষমায় !
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে লাখ,
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্বাক্ !
নর-চরণ-চিহ্ন কভু পড়েনি হোথায়,
নাইকো শব্দ, বিরাট স্তব্ধ,—আপন মহিমায় !
সন্ধ্যা প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধগতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায় !
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় রঙীন মহোৎসব,
বিদূর-ভূমে রত্ন-ফসল হয় বুঝি সম্ভব !
মর্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার—
ওই পাদপীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার !

* * *

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য, তারা, মুখ দেখে সবাই !
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াশার,
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা যমুনার !
ওইখানেতে তুষার-নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখার ঘাত-প্রতিঘাত চলছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ওযে মহামহত্তর,
নির্মলতার ওই নিকেতন অক্ষর-ভাস্বর !

হয়তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয়তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর ;

রজতগিরি শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মূরছায়!
হয়তো আদি বুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি' কিরণ-সাজে!
কিংবা হোথা আছে প্রাচীন মানস সরোবর,—
স্বচ্ছশীতল আনন্দ যার তরঙ্গনিকর!
কবিজনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদুহাস!

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াশায়?—
বাংলা দেশের মানুষ যেথা আজো পূজা পায়!
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি' উৎসাহ-শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়।
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব!
এমনি ক'রে স্বর্ণ-শৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাঁদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়।
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে আজ কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে আপনাহারা?
চোখে পলক নাইকো তাঁদের—পড়ে না ছায়া,—
মমতা কি যায়নি তবু—ঘোচেনি মায়া?
তাই বুঝি হায় ফিরে যেতে ফিরে ফিরে চাই,
কে যেন, হায়, রইল পিছে,—কাহারে হারাই!

* * *

সন্ধ্যা এসে ডুবিয়ে দিল রঙীন চরাচর,
অনিচ্ছাতে রুদ্ধ হ'ল দৃষ্টি অতঃপর।
উঠল সেজে সাঁঝের আলোয় দার্জিলিং পাহাড়,
ফুটল যেন ভুবন-জোড়া গাঁদাফুলের ঝাড়!

কুজ্ঝটিকায় সাঁঝের আঁধার হ'ল দ্বিগুণ কালো,
অরুণ-ছটার ছাতা মাথায় হাসে গ্যাসের আলো।
তখন দুয়ার বন্ধ ক'রে বন্ধ ক'রে সাসি,
অন্ধ-করা অন্ধকারে স্বপন-সুখে ভাসি।
ঘুমের বুড়ীর মন্ত্র-মোহ অমনি তখন খসে,
চেনা মুখের ছবিগুলি ঘিরে ঘিরে বসে!
ঘোর নিশীথে দারুণ শীতে কষ্ট যখন পাই,
ইচ্ছা করে কৃচ্ছ্র-সাধন পাহাড় ছেড়ে যাই;
শিক্ষা-শাসন হেথা, সেথায় হরষ-হিন্দোল;
এ যে কঠোর গুরু-গৃহ, সে যে মায়ের কোল।
তাই নিশীথে ঘরের কথা জাগে সে সদাই,
মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেলিতে চাই।
সংগোপনে শব্দযোজন করি দু'চারিটি
সশরীরে যেতে না পাই তাই তো পাঠাই চিঠি।
ভগ্নস্বাস্থ্য কর্তে আস্ত পড়ছে ভেঙে মন,
ডাক-পিয়নের মূর্তি ধেয়ান ক'রে সকল ক্ষণ;
তাই অনুরোধ, মাঝে মাঝে পত্র যেন পাই,
চিঠির ভেলায় প্রবাস-পাথার পার ক'রে নাও, ভাই!

সিংহল

('Young Lochinvar'-এর ছন্দে)

ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ!
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ!
যার উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস!

ওই শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর যৌবন তার 'সিংহে'র বশ,—সিংহল নাম যায় ;
এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

ওই বঙ্গের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ শঙ্কর যার বল্কল-বাস, সিংহল যার নাম।
যার মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
যার পুষ্কর-মেঘ পুষ্করিণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।

ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায়—সিংহল তার ঘর,
হায় লুব্ধের প্রায় সিংহল ধায় বঙ্গের অন্তর :
ছিল সিংহল এই বঙ্গের, হায়, পণ্যের বন্দর,
ওগো বঙ্গের বীর সিংহল-রাজ-কন্যার হয় বর।

ওই সিংহল দ্বীপ সুন্দর, শ্যাম,—নির্মল তার রূপ,
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ নির্বাণ।

সিদ্ধিদাতা

(যবদ্বীপের একটি গণেশ-মূর্তির ছবি)

একি তোমার মূর্তি হেরি !—একি হেরি সিদ্ধিদাতা !
হাজার নর-মুণ্ড 'পরে ঠাকুর ! তব আসন পাতা !
হাজার জীবন নষ্ট হলে—ব্যর্থ গেলে হাজার জন—
তবে তোমার হয় প্রতিষ্ঠা ? নির্মিত হয় সিংহাসন ?
তখন তুমি প্রসন্ন হও—তখনি হও আবির্ভাব ?
নইলে পরে ব্যর্থ আশা ?—নইলে সুদূর সিদ্ধিলাভ ?

খুলে গেল দৃষ্টি এবার !—ঠাকুর ! তোমায় নমস্কার !
হাড়ের স্তূপে সিদ্ধিদাতার আসন পাতা ! চমৎকার !

*　　*　　*

দুর্গমে কে যাত্রা ক'রে যবদ্বীপে করলে জয় !
কত বছর যুদ্ধ হ'ল, কতই প্রাণের অপচয় !—
হিসাব তাহার নাইক' কোথাও ; শিল্পী শুধু কল্পনাতে
আভাসখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অস্থিপাতে ;
গ'ড়ে গেছে পাথর কেটে মূর্তিখানি জীবন্ত,
শবাসনে সিদ্ধিদাতা,—শোকের দহন নিবন্ত।
নৃমুণ্ডেরি স্তূপের 'পরে জাগল বিপুল জয়ের গাথা,
অভেদ হয়ে দিলেন দেখা সিদ্ধি সনে সিদ্ধিদাতা !

*　　*　　*

খর্ব তুমি—স্থূল রকমের, সিদ্ধি—তুমি লম্বোদর ;
তবু তোমায় চায় সকলে, তবু তুমিই মনোহর !
তোমার লাগি' বিশ্বামিত্র পীড়া দিল নিখিল জীবে,
যাত্রী ছোটে তোমার লোভে মর্ত্যলোকে আর ত্রিদিবে ;
কারো হঠাৎ নিবছে বাতি,—কারো মাথায় চক্র ঘোরে,
কেউ বা লভে জ্ঞানের ভাতি, কেউ বা পথেই যায় গো ম'রে !
সিদ্ধি লাগি' কর্মী, জ্ঞানী ছুটছে কবি দিবস-নিশা,
কেউ বা লভে স্বর্ণকণা, কেউ বা ধূলায় হারায় দিশা !

*　　*　　*

শিখাও প্রভু ! বিঘ্ন-বিপদ ফেলতে ঠেলে দুঃখ-রাতে ;
করতে শিখাও কৃচ্ছ্রসাধন নাম লিখিয়ে খরচ-খাতে,
মরতে শিখাও শুষ্ক মুখে, ফিরতে শিখাও শূন্য হাতেই,
সত্যভানু প্রদীপ্ত যে নৃ-কপালের শুভ্র তাতেই।

*　　*

পণ্ড পূজা ঠাকুর ! তোমার ক্ষুদ্রচেতা বেনের ঘরে,—
উদ্ধলোভী মূষিকে সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে !

তারা তোমায় চেনে না, হায়, চেনেনাকো সিদ্ধিদাতা,
অভ্রভেদী নৃকঙ্কালে প্রভু ! তোমার আসন পাতা।

ওঙ্কার-ধাম

(Un Pelerin D' Angkar পড়িয়া)

ওঙ্কার-ধাম ! ওঙ্কার-ধাম !
চিত্ত-চমৎকার !
শ্যাম-কাম্বোজে কনকাম্ভোজ
হিন্দুর প্রতিভার !

তোরণে তাহার সপ্তশীর্ষ
সর্প সে ফণা ধরে,
পর্বতসম বিপুল দেউল
মিশরের যশ হরে।

যোজন ব্যাপিয়া পত্তন তার,
বিঁধিয়া নীলাম্বর
পর্বতজয়ী গর্বে উঠেছে
দেউল স্তরে স্তর !

গুম্বজে তার সোনার পদ্ম,
চূড়ায় চতুর্মুখ—
নীরব হাস্যে নিরখে চতুর্-
দিকের দুঃখ সুখ ;

বিরাট মূরতি, আরতি তাহার
জাগায় ভকতি ভয় !
দেউল ঘিরিয়া মূর্তি-মেখলা,—
রামায়ণ শিলাময় !

রাক্ষস, রথ, হস্তী মহৎ,
যুদ্ধের হুড়াহুড়ি,
সাগর-মথন, দেব-অগণন,—
রয়েছে যোজন জুড়ি'

প্রতি শিলা তার পেয়েছে আকার
শিল্পীর স্পরশে,
সারি সারি সারি বুদ্ধ-মূরতি
মগন ধ্যানের রসে।

বিশ্ব হাজার একই দেবতার
রেখেছে গো খুদে খুদে,—
নির্বাক শিলা নীরবে ঘোষিছে,—
দেবতা সর্বভূতে!

শিল্পীর তপে হেথা অপ্সরা
রয়েছে পাথর হয়ে—
হেম-মুখী প্রেম মদিরেক্ষণা—
বহুর সোহাগ স'য়ে!

যোজন জুড়িয়া রয়েছে পাষাণ-
স্তম্ভের মহাবন,
জনপদ দশলক্ষ লোকের
নামশেষ সে এখন!

নিবিড় বনের সবুজ আঁধার
দিনে আছে দিক্ জুড়ে;
শব-শিব একা বিরাজিছে আজ
চতুর্মুখের চূড়ে!

আধেক ভগ্ন ধূলায় মগ্ন
আঙনে মূরতিগুলা,
নাই লোক শুধু বাদুড় পেচক,—
পালক এবং ধূলা।

ওঙ্কার-ধাম! ওঙ্কার-ধাম!
নাই—কারো নাই সাড়া,
ঘণ্টার মালা দুলিছে কেবল
বাতাসে পাইয়া নাড়া!

ধ্বংসের দাড়া অশথ-শিকড়
পাকড়ি' ধরিছে আঁটি' ;—
তার সাথে ধূলি আর বিস্মৃতি,
শিয়রে মরণ-কাঠি।

ওঙ্কার-ধাম! ওঙ্কার-ধাম!
বিস্মৃত তুমি আজ,
জানে না হিন্দু কীর্তি আপন!
হায় নিদারুণ লাজ!

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

দিগন্ত-বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত্ত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত।

দুর্নমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর !

রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ-হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য-সম্ভার।
উর্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
প্লাবিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি' !

অন্তহীন মূর্ছনায় আন্দোলিছ আকাশ সঙ্গীতে,—
ঝঙ্কারিয়া রুদ্রবীণা,—মিলাইছ ভৈরবে ললিতে !
প্রসন্ন কখনো তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর ;
দুর্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্ঞেয়-সুদূর !

শিশুকাল হতে তুমি উচ্ছৃঙ্খল ; দুরন্ত-দুর্বার ;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার !
স্বর্গ হতে অবতরি' ধেয়ে চ'লে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে !

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ ;
আর্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী !
অনাহূত—অনার্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি !

সেই হতে আছ তুমি সমস্যার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্যয় প্রবলের কাজে !
দম্ভ যবে মূর্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন ; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী !
মূর্খে বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !

ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতায় কুটীরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তায় বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক' বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

পাগ্‌লা ঝোরা

তোমরা কি কেউ শুনবে না গো পাগ্‌লা ঝোরার দুঃখ-গাথা ?
পাগল ব'লে কর্বে হেলা ? কর্বে হেলা মর্মব্যথা ?
জন্ম আমার হিম-উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি, গঙ্গাদিদির পাগল ভাই।

বরফ-মরুর একলা জীবন ভাল আমার লাগত না রে,
লুকিয়ে উঁকি তাইতো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে ;
সুড়সুড়িয়ে গুড়গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলে
গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক' বাধা, পিছনে টান নাইক' মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হতে
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জুড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জ্বালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনিসুতার রাঙামালা ;
একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁঝি সকল গায়,
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুম্‌রে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে,
ঐরাবতের বৈরী হয়ে, কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে—

পরান ভরে নৃত্য করে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ ছাড়া আজকে আমি যাচ্চি মরে মনের দুখে ;
যাচ্চি ম'রে মনের দুখে পূর্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝরে।

চক্রী মানুষ চক্র ধরে ছিন্ন করে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে নাইক' দয়া, নাইক' স্নেহ !
আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়-কোলে নির্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন সুদূরে—সাধি নি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে, রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প-আয়ু, আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হয়ে যাচ্চি, ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিনতো যারা বলছে শোনো,—'যায় না চেনা !'
বাজবে কবে প্রলয়-বিষাণ ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা !
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচব কবে ? তোমরা কেহ বলতে পারো ?

শূদ্র

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো !
শূদ্রে দেখোনা বক্র-চোখে।

আদি দেবতার চরণের ধূলি
শূদ্র,—একথা শাস্ত্রে কহে,
আদি দেবতার পদরেণু-কণা
সকল দেবতা মাথায় বহে।

বিধাতার পাদ-পদ্মের রেণু
না করিবে শিরোধার্য কেবা ?
কে সে দর্পিত—কে সে নাস্তিক—
শূদ্রে বলে রে করিতে সেবা ?

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে
তাহে উপজিল শূদ্র জাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন,
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী।

শূদ্র শোধন করিছে ভুবন
তাই তার ঠাঁই শ্রীপদমূলে,
আপনারে মানী মানিয়া সে কভু
শিয়রে হরির বসে না ভুলে।

শুদ্ধসত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

শিশুজ্ঞান সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।
ঘৃণায় নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী!

নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল!

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

পথের স্মৃতি

হাত পেতে বসেছে ভিখারী
রাজপথে মৌন প্রত্যাশায়
শাখা মেলি' শীর্ণ তরু-সারি
শূন্যমনে আকাশে তাকায়।

লঘু মেঘ চলে যায় ভেসে,—
উপবাসী রহে শাখাদল ;
শাদা মেঘ ভেসে গেল হেসে
পিপাসীরে দিল না সে জল!

ধোয়া ধুতি—রেশমী চাদর—
চলে গেল ফিরাইয়া মুখ ;
অনুদার বিলাসী বাঁদর
অভুক্তের বুঝিল না দুখ।

সহসা উড়ায়ে ধূলিজাল
ম্লান মেঘ এল বায়ুভরে,—
বজ্রকণ্ঠ মূরতি করাল,—
সেই শেষে দিল স্নিগ্ধ ক'রে !

থামাইয়া থার্ডক্লাস গাড়ি
রুক্ষমূর্তি দুঃখী গাড়োয়ান
গাড়ি হতে নামি' তাড়াতাড়ি
গরীব গরীবে দিল দান !

শাদা মেঘ দেয় না রে জল,
ম্লান মেঘ ! আয় তোরা আয়,
রিক্ত শাখে হবে ফুল ফল
বিন্দু বিন্দু তোদেরি দয়ায় ।

দুর্ভিক্ষে

ক্ষিদের জ্বরে যাচ্ছে মারা, ক্ষিদেয় ঘুরে পড়ছে ম'রে !
উপরওলার মর্জি, বাবা, একে একে যাচ্ছে স'রে ।

বিকিয়ে গেছে হালের বলদ, দুধুলি গাই বিকিয়ে গেছে,
চালিয়েছিলাম দু'পাঁচটা দিন কাঁসা পিতল সকল বেচে !

বিকিয়ে গেছে লক্ষ্মী মোহর জনার্দনের রুপার ছাতা,
ভিটার গ্রাহক নাইক' গাঁয়ে, তাই আজো সব গুঁজছে মাথা ।

বিকিয়ে গেলাম পেটের দায়ে, পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা,
কেড়ে খাবার দিন গিয়েছে, কুড়িয়ে খাবার গেছে পালা ;

কচি ছেলের খেইছি কেড়ে,—কান্নাতে কান দিইনি মোটে,
চোখে-কানে যায় কি দেখা ?—ক্ষিদেয় যখন ভিতর ঘোঁটে ?

প্রথম প্রথম লুকিয়ে খেতাম, চোরের মতন হেথা হোথা,
নিজের ক্ষিদেয় ভুলতে হ'ত ছেলেমেয়ের ক্ষিদের কথা !

ঘাস পাতাতে চলবে ক'দিন ? ক'দিন ওসব সইবে পেটে ?
শুকিয়ে আসছে ক্ষিদের নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে।

ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি,
ক্ষিদের জ্বরে কচি-কাঁচা মরছে নিত্য ঘড়ি ঘড়ি।

শুষছে পড়ে শ্মশান-ভিটায়,—শুষছে পড়ে সারি সারি,
সকলগুলোর মুক্তি হলে নির্ভাবনায় মরতে পারি।

একে একে হচ্ছে নীরব খড়ের শেষে কঠিন ভুঁয়ে,
হচ্ছে নীরব—যাচ্ছে ম'রে,—বুঝছি সবি শুয়ে শুয়ে।

বুঝতে পারছি—ওই অবধি—জান্‌তে পাচ্ছি মাত্র এই,
মুখে দেব জল দু'ফোঁটা—তেমন ধারাও শক্তি নেই।

মড়ার লোভে ঢুকবে কুকুর,—ভাবতে ওঠে শিউরে গা'টা—
জ্যান্তে পাছে খায় গো ছিঁড়ে, ভাবছি এখন সেই কথাটা।

চোখের আগে অন্‌কি ওড়ে, গায়ে মুখে বস্‌ছে মাছি,
বুঝতেও ঠিক পারছি নাকো—মরেছি না বেঁচেই আছি !

হায় ভগবান ! মর্জি তোমার ! হায় জগদীশ ! তোমার খুশি !
রাখলে তুমি রাখতে পার, মারতে পার মারলে রুষি' ;—

বাঘের ক্ষিদে মিটাও ঠাকুর,—প্রাণ রাখ প্রাণহানি ক'রে ;
মানুষ মরে ক্ষিদেয় জ'রে—হাত গুটিয়ে রইলে স'রে !

সংশয়

গ্রহণ-দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্কার সুর ভুবন ভরি' !
রাহুর গরাসে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে আলোর পিয়াসী নয়নতারা।

যে দিকে তাকাই কেবলি যে ছাই পড়িছে ঝরি' !
ক্লান্ত পরান, দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি ;
'কি হবে গো' !—কারে সুধাইব, হায়, পাই নে ভাবি,
মধ্য-সাগরে ছিদ্র-তরণী যায় যে নাবি !

স্থির-নিশ্চিত মৃত্যুর মত আসিছে ঘিরে,
নিশ্বাস হরি' দৃষ্টি আবরি' ঘন তিমিরে ;
কোথা সাদা পাল ? কই তরী তব ? হে কাণ্ডারী !
লোনা জলে এ কি মিছে মিশে গেল নয়ন-বারি।

হাহাকার

দুর্ভিক্ষের ভিক্ষুকের মত
কেঁদে কেঁদে ওঠে সে নিয়ত,
রোদন উদ্যমে অবসান,
আছে শুধু বদন-ব্যাদান !
আছে বুকে বুভুক্ষার মত
জগতের ক্ষুণ্ণ খেদ যত,
আছে শুধু যমের যন্ত্রণা
প্রেতলোকে জাগাতে করুণা।

এ সংসার অন্ধ-কারাগার,
কোনোদিকে মিলে না দুয়ার ;
ক্ষুন্ন প্রাণ, সংক্ষুব্ধ বেদনা,
কেবল পিঞ্জরে আনাগোনা।
এ পিঞ্জর ভাঙ ভগবান,
শোক তাপ হোক অবসান
এ উৎকট রোদনের শেষ
কর, কর, কর পরমেশ !

শূন্যের পূর্ণতা

কৃষ্ণ হতে পাংশু হয়ে, রুদ্র হ'তে ব্যাপ্তি লয়ে
শকুন্তের ছায়া ক্রমে আলোকে মিলায় !
জিজ্ঞাসা সংশয়-শেষে, দগ্ধ রিক্ত চিত্তদেশে
অনাসক্ত পূর্ণজ্ঞান বিহরে লীলায় !

১৪ জ্যৈষ্ঠ

(আমার পিতামহ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে রচিত

অনেক দেছেন যিনি মানবেরে অকৃপণ করে,—
ধীশক্তির দাতা বলি' মুখ্যভাবে ধ্যান তাঁর করে
আমাদের এ ভারত ; প্রতিদিন প্রভাতে-সন্ধ্যায়
মুখরিত করি' দিক শ্রেষ্ঠ সে দানের কথা গায়।

সেই শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ছিলে তুমি ভূষিত ধীমান্ !
জ্ঞানাঞ্জনে নেত্র মাজি' বিশ্ব-দৃশ্য দেখিলে মহান্ !
বিজ্ঞানের তূর্যনাদে স্তব্ধ করি' দিলে তুচ্ছ কথা,
সর্ব সংকীর্ণতা ত্যজি' নিলে বরি' বিশ্বজনীনতা ;—

অন্ধ বিশ্বাসের বিষে জর্জরিত এ বঙ্গ-ভুবনে
এনে দিলে জ্ঞানামৃত ; হলে গুরু চক্ষুরুন্মীলনে।
সত্যের করিতে সেবা স্বার্থ, সুখ, স্বাস্থ্য বিসর্জিলে,—
মিথ্যা সংস্কারের মোহ ক্ষয় করি দিলে তিলে তিলে।

অর্ধ পথে থামো নাই সন্ধি করি অজ্ঞতার সনে,
সূর্যকান্ত মণি তুমি পরিপূর্ণ অপূর্ব কিরণে।

২

আজি তব মৃত্যুদিনে, ওগো পূজ্য ! ওগো পিতামহ !
এনেছি যে দীন অর্ঘ্য—তুমি সে প্রসন্ন মনে লহ !
বার্ষিকী এ শ্রাদ্ধে তব পিণ্ডভোজী ডাকিনি ব্রাহ্মণ,
জানি তাহে হইত না, ওগো জ্ঞানী ! তোমার তর্পণ ;

অন্তরের শ্রদ্ধা শুধু আমি আজি করি নিবেদন ;—
এই তো যথার্থ শ্রাদ্ধ—কীর্তি-কথা স্মরণ কীর্তন।
সত্য-দেবতার পদে আজ শুধু এই ভিক্ষা চাই,
বুদ্ধেরে পূজিতে যেন রক্তধারে বেদী না ভাসাই ;—

অবতার বলি' মুখে যেন, হায়, অজ্ঞতার ফলে
রঘুবীরে না বসাই মৎস্য, কূর্ম, বরাহের দলে;—
তব প্রিয় কর্ম ত্যজি যেন তব তর্পণে না বসি,
বিদ্যা তপ বিবর্জিয়া শুধু যেন কৌলীন্য না ঘোষি !

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ;—গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।

শ্মশান-শয্যায় আচার্য হরিনাথ দে

আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,—
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝ'রে উল্কাতরল জ্বালার মালা !
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব,—শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা,
যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা।
পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে,
ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হয়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুল্‌বুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে ;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্তমানের বাবিল্-চূড়া,
দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিব্‌ল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা,
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

সাগর-তর্পণ

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার!
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার!

নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায়;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!
কীর্তি-ঘন মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত!—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির,
তোমার মত ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায়;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক-একবার
শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার!

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনায় পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।

রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
'বাপ-মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !'
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—এ কি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় !

ঋষি টলস্টয়

সংকীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি রুষিয়ার ! মুক্ত রন্ধ্রে স্বর্গের বাতাস
প্রবেশিলা অন্ধকূপে ; বিশ্ববাসী বাঁচিল নিশ্বাস

ফেলি ; ওগো টলস্টয় ! বিনাশিলে তুমি মহাভয়
মানবের ; প্রচারিলে পৃথ্বীতলে বিশ্বাসের জয় ।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে, দ্রষ্টা ! তুমি, মহামিলনের পূর্বকথা !

বাণী তব মৃত্যুহীন মৃত্যুময় এ মর্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুঞ্জয় কবি ! হে মনীষী, জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব,
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব !

সেই ত্যাগ ! সেই তপ ! সেই মহামৈত্রীর বাখান !
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্তমানে তুমি মহাপ্রাণ !

কবি-প্রশস্তি

(ঋষিকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি ! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে !
তোমার গানে তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে ।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে নিশিগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলালে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা !
যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা !

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমায় করি গর্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি',
হে গুণী, তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।

জীবন-ব্রতে পঞ্চাশতে পড়িল তব অঙ্ক,
বঙ্গ-গৃহ জুড়িয়া আজি ধ্বনিছে শুভ শঙ্খ ;
পান্থ এসে পুষ্পরথে—
পৌঁছিলে হে অর্ধ-পথে,—
সারথি তব শুভ্র-শুচি কীর্তি অকলঙ্ক !

অর্ধশত শরতে সোনা ঢেলেছ তুমি নিত্য,
অর্ধশত মিলিলে হেন তবে সে পূরে চিত্ত ;
সোনার তরী দিয়েছ ভরি,
তবুও আশা অনেক করি ;
ভরিয়া ঝুলি ভিখারী সম ফিরিয়া চাহি বিত্ত।

চাতক ! তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু !
মরাল ! তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর ! তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরান হ'ল মগ্ন !
বিষাণ যবে বাজালে, মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

গভীর তব প্রাণের প্রীতি, বিপুল তব যত্ন,
দিশারি ! তুমি দেখাও দিশা, ডুবারী তোলো রত্ন !
যে তানে টলে শেষের ফণা
পেয়েছ তুমি তাহারি কণা,—
অমৃত এনে দিয়েছে শ্রোতে,—নহে সে নহে প্রত্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরান-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য ;
শোকের রাতে রহিলে ধ'রে
হিরণ্‌ময় মৃণাল ডোরে,
রুদ্রে নিলে বরন ক'রে রণায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা—
চাহ না তবু মুক্তি বিনা,
উজল মনোমুকুর তব হয়নি মলীলিপ্ত।

বাজাও কবি ! অলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয়-শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে ;
যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে লকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ,—মিলেছে মহানন্দে।

গহন মেঘে বিজলী সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ।
সূর্য সম উজলি' তুমি
সপ্ত ঘোড়া ছুটাও তুমি,
তৃপ্ত হ'ল হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

অর্ঘ্য

(কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যদিগের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)

নেতধটী মোরা পাই নাই খুঁজে,
বিশ আড়া ধান আনিনি কবি!
এনেছি কেবল হৃদয়ের প্রীতি—
বিকচ কমল কোমল ছবি।
পরগণা লিখে সঁপিতে কবিকে
কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গে নাহি,
আঁখিজলে শুধু করি' অভিষেক
দূর্ব-আসনে বসাতে চাহি।
জীবনের বহু শূন্য প্রহর
ভরিয়া তুলেছ বীণার তানে,
অন্ধ-যামিনী হেসেছে পুলকে,—
যে হাসি হাসিতে অন্ধ জানে।
তোমার যোগ্য কি দিব অর্ঘ্য?
কোথা পাব মোরা ভাবি গো তাই;—
জনক রাজার মত কোথা পাব
হিরণ-শৃঙ্গ হাজার গাই!
ব্রহ্মবিদের তুমি বরেণ্য,—
কাব্য-লোকের লোচন রবি!
স্বর্গে বসিয়া আশিসিছে তোমা,
ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী।

শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দন আর
অনুরাগ-ধারা এনেছি মোরা,
তোমায় যোগ্য নাহিক' অর্ঘ্য,—
তবু লও প্রীতি রাখীর ডোরা।

নিবেদিতা

প্রসূতি না হয়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;—
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,—
বিদেশিনী নিবেদিতা ! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্বধন,—কায়, মন, বচন আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্ম-নিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হতে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণ-দীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;—
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর !

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈল-মূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।

নফর কুণ্ডু

নফর নফর নয়,—একমাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায় ; দীন হীন প্রতি জীবে শিব

প্রত্যক্ষ করেছে সেই। নহিলে কি অস্পৃশ্য মেথরে
বিপন্ন দেখিয়া, নিজ প্রাণ দিতে পারে অকাতরে
দুঃখের উদ্ধার লাগি'? পঙ্কে সে মানেনি অগৌরব;
সে শুধু মানস-চক্ষে দেখেছে গো বিপন্ন মানব;
শুনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্তরব,—
অমনি গিয়েছে ভুলে পুত্র, জায়া, পিতা, মাতা,—সব,—
গৃহ, গৃহস্থালী-সুখ; বাষ্প-বিষ-বিহ্বল-গহ্বরে
নেমেছে অকুতোভয়ে;—একটি সে জীবনের তরে।
একটি প্রাণের লাগি' নিজ প্রাণ দেছে মহাপ্রাণ।
স্বদেশী বিদেশী মিলি' স্মরে আজি পুণ্য অবদান
নিঃস্ব এই নফরের। নফর আজিকে পুণ্যশ্লোক;
আলোকিছে মাতৃভূমি শুভ্র তার সুকৃতি-আলোক।

দেশবন্ধু

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদে গীত)

বন্ধুর ভালে চন্দন-টীকা কণ্ঠে কমল-মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা;
মাধবে মাধবী-কঙ্কণ বাঁধো বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথো মনোরম ছন্দে;
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণডালা,—
ইন্দু-কিরণ-নিন্দিত যাঁর মুকুট-রশ্মি-জ্বালা!
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা করেছে নূতন বর্ষ,—
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে; উথলে নবীন হর্ষ!
বর্ষণ করে লাজ-অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জনবন্ধুর আগমন-পথে লক্ষ কুসুম ঢালা।

জ্যোতির্মণ্ডল

যাঁহাদের পুঞ্জ তেজে দীপ্ত আজি বঙ্গের গগন,
বাঙালীর চিত্তপটে তাঁহাদের একত্র মিলন!
মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ,
সৌর-জগতের সত্য সাহিত্য-জগতে হের আজ
হয়ে আছে সপ্রমাণ! ঊর্ধ্বে তার নিস্পন্দ আলোক,—
যুগ-যুগান্তর রাজা আছেন রচিয়া ধ্রুব-লোক;
আর্য-লোক পার্শ্বে তার,—তপঃক্লিষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল,—
স্তব্ধ, শান্ত সুগম্ভীর পুরাতন জ্যোতিষ্কের দল,—
অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী বিদ্যার সাগর,
দূরতায় মন্দীভূত রশ্মি তবু স্পষ্ট সুগোচর।
রবির দক্ষিণভাগে বঙ্কিম বঙ্গের বৃহস্পতি;
বামে মধু শুক্রগ্রহ,—বিতরিল যেই শুভ্র জ্যোতি
রবি উদয়েরও আগে! শূন্যে শোভে নীহারিকা-সেতু,
উল্কা আছে, গ্রহ আছে, আছে তারা, আছে ধূমকেতু।

বিশ্ববন্ধু

(বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম্ ষ্টেডের মৃত্যু উপলক্ষে)

গ্রহণ-বর্জিত শুচি সূর্য সম নিত্য নির্নিমেষ
নিয়ন্তার নেত্রবিভা পশেছিল ও তব পরানে;
তাই জান নাই শঙ্কা, তাই তুমি মান নাই ক্লেশ,
বিবাদ, বিপদ, বিঘ্ন; টল নাই নিন্দা অপমানে।

হে তেজস্বী! অগ্নি-সত্ত্ব! হে তপস্বী! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে; তোমার নাহিক' আত্মপর;
ঘোষণা করেছ তুমি নিত্য সত্য; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিরদিন; ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর!

'জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায়-নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে'
এ তোমার মূলমন্ত্র,—এ তোমার প্রাণের সাধনা ;
জয়-ডঙ্কা-নাদে তাই আতঙ্কিত হতে তুমি প্রাণে
দুর্বলের পীড়াভয়ে। বিশ্ব-মানবের আরাধনা,—

সনাতন ন্যায়-ধর্ম,—তুমি তার ছিলে পুরোহিত ;—
কত অভিচার-মন্ত্র নষ্টবীর্য তব শঙ্খরবে !
হে বিশ্বাসী ! বিশ্ববন্ধু ! ওগো কর্মী উদার-চরিত !
নিঃস্ব নির্জিতের পক্ষে একা তুমি যুঝেছ গৌরবে।

হে ধর্মিষ্ঠ ! আত্মনিষ্ঠ ! লভিয়াছ সমুদ্র-সমাধি
অন্তে তুমি সমুদার ! মানুষের রাজ্যের বাহিরে ;
ঊর্ধ্বে শুধু নীলাকাশ—সীমাহীন, অনন্ত, অনাদি,
নিম্নে লীলায়িত নীল উচ্ছ্বসিত চন্দ্রমা-মিহিরে।

তোমার সমাধি ভঙ্গ করিবে না তরঙ্গ দুর্জয়.
আত্ম-প্রাণ-দানে তব আর্তত্রাণ ঘটেছে সুক্ষণে ;
কীর্তনীয় তব নাম ; কীর্তি তব অমর অক্ষয়,
ক্ষাত্রধর্ম মূর্ত তুমি, হে যশস্বী ! জীবনে মরণে।

চৌদ্দ প্রদীপ

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি ;
পিতৃযানের অজানা আঁধারে আলোক জ্বালি,
আলোর রাখীতে বাঁধি গো অতীতে,—ঘুচাই কালি !
মৃত্যু গহনে বিস্মৃত জনে স্মরণ করি,
স্মৃতি-লোকে সবে জাগাই পুলকে চিত্ত ভরি'।
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অশ্রু-হিমানী জড়িত আকাশে অতীত-কথা !

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি ;
স্মরি অগস্ত্যে—ফেরেনি যে আর যাত্রা করে,
স্মরি গো বুদ্ধে—জ্ঞানে প্রেমে যার ভুবন ভরে ;
স্মরি পরাশরে—তার রাক্ষস-সত্র-কথা,
স্মরি মৈত্রেয়ী অরুন্ধতীরে পতিব্রতা ;
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগিছে ভারত সর্বদমন ভারত-আদি,
অশোক-প্রতাপ-পৃথ্বী-বিজয়সিংহ-সাথী !
জাগে বিক্রম অভিনব নবরত্নে ধনী,
যবনী রানীর বক্ষে জাগিছে মৌর্যমণি !
লুপ্ত দিনের বিস্মৃতি-লেপ ঘুচেছে কালো,
চৌদ্দ প্রদীপে আজিকে চৌদ্দ ভুবন আলো।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা !
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার ঝরোখা খোলা !
এ পারে প্রদীপ উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্তা ছোটে :
আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে !
আঁধার-পাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া।

বন্দরে

শাস্ত্র-শাসন রইল মাথায়, তর্ক মিছে,—নেইকো ফল ;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ,—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
বাজে কথায় কান দিয়ো না, কান দিয়ো না ক্রন্দনে,
দুলতে হবে সিন্ধু-দোলায় বিরাট বুকের স্পন্দনে।

সাগর-পথে যাত্রা-নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভরা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে।

বাণিজ্যে সে বসত্ করে সিন্ধুজলে জন্ম তার,
সাগর সেঁচে আনব তারে আনব ঘরে পুনর্বার ;
আনব ঘরে মাথায় ক'রে বিদ্যা মৃত-সঞ্জীবন,
শুক্র ঋষির চরণ-ধূলায় প'রব মোরা জ্ঞানাঞ্জন।

দেবযানীরে রাখব খুশি ব্রহ্মচর্য ছাড়ব না,
আপনজনে ভুলব না রে পরের আদর কাড়ব না ;
জালের কাঁঠি নিরেট খাঁটি, ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার,—
মিললে নিধি, জলের তলে থাকবে না সে ছড়িয়ে আর ;

ঘেঁষে ঘেঁষে ঘনিয়ে এসে মিলিয়ে দেবে সকল খুঁট,—
ধন ঘড়াটি ধরবে আঁটি' লাখ আঙুলের লোহার মুঠ !
ছড়িয়ে গিয়ে জগৎমাঝে মিলব মোরা অন্তরে ;
নূতন করে পড়ব বাঁধা দেশের মায়া-মন্তরে।

পাঁজি পুঁথি রইল মাথায়, জ্ঞানের বাড়া নেইকো বল,
যৌবনের এই শুভক্ষণে বেরিয়ে পড় বন্ধুদল !
হিন্দু যখন সিন্ধুপারে করলে দখল যবদ্বীপ
কোথায় তখন ভট্টপল্লী কোথায় ছিলেন নবদ্বীপ ?

কোথায় ছিল জাতির তর্ক—অর্কফলার আন্দোলন—
যেদিন রুদ্র সমুদ্রেরে বিজয় দিল আলিঙ্গন ?
মেক্সিকোতে হ'ল যে দিন মঠপ্রতিষ্ঠা রামসীতার—
বিধান দিল কোন্ মনীষী ?—খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার ?

উড়ুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধু পার,
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুটত নিয়ে পণ্যভার ;
তাদের ধারা লুপ্ত হবে ? থাকবে শুধু পঞ্জিকা ?
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিয়ে ফসল হ'ল গঞ্জিকা ?

করুক তবে সূক্ষ্ম বিচার শাস্ত্র নিয়ে পণ্ডিতে ;
নিঃস্ব করুক নস্যধানী গোময়-লিপ্ত গণ্ডীতে।
চলবে না কেউ মোদের নিয়ে ?—সাগরের তো চলছে জল ;
পরের কথা ভাব্‌ব পরে ;—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।

ছেলের দল

হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাসছে কেবল,—ভাস্‌ছে যেন আলগা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ভাবনা যা' সে' ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।
ওরাই ভাল বাস্‌তে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,
প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে, খুল্‌তে জানে মনের কল,—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,—ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে ;
পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—নেইকো দ্বিধা ওদের প্রাণে ;
ওই আমাদের ছেলেরা সব—ঘুচিয়ে অগৌরবের রব
দেশ-দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ;
মার্কিনে আর জর্মনিতে পাচ্ছে তারা তপের ফল,
হিবাচীতে আগুন জেলে শিখছে ওরা কজাকল ;
হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হয়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্বভরে ;
প্রয়োজনের ওজন-মত আয়োজন সে কর্তে পারে,
ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।
ওই আমাদের ছেলেরা সব,—ত্রুটি ওদের অনেক হয়,—
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,—কারণ ওরা দেবতা নয় ;
মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতেও হয় গো কাবু,—মনের মতন দেয় না ফল ;
তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস ঘৃণা !
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা ।
কালো ফণীর মাথায় মণি,
সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রঙ নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা ;
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা !

কালো মেঘের বৃষ্টিধারা তৃপ্তি সে দেয় তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যামসায়রে !
কালো অলির পরশ পেলে
তবে মুকুল পাপড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয় গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে !
কালো মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে ।

সন্ন্যাসী শিব শ্মশানবাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো মেয়ের কটাক্ষেরি ভয়ে অসুর আছে থেমে ।
দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে
কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্য-ধারা গঙ্গা হ'ল—সেও তো কালো চরণ ঘেমে ;
দূর্বাদলশ্যামের রূপে—রূপের বাজার গেছে নেমে ।

প্রেমের মধুর ঢেউ উঠেছে কালিন্দীরি কালো জলে,
মোহন বাঁশীর মালিক যেজন তারেও লোকে কালোই বলে ;
বৃন্দাবনের সেই যে কালো—
রূপে তাহার ভুবন আলো,
রাসের মধুর রসের লীলা,—তাও সে কালো তমাল তলে ;
নিবিড় কালো কালাপানির কালো জলেই মুক্তা ফলে ।

কালো ব্যাসের কৃপায় আজো বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণ কবি—শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে
আঁটবে কে কূট-নীতির ফেরে ?
কালো-অশোক জগৎ-প্রিয়,—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাবসী কালো লোকমানেরে মানে আরব আর ইরাণী।

কালো জামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে—
কালোর আলো জ্বলছে আজো, আজো প্রদীপ যায়নি নিবে ;
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি
কল্যাণেরি করছে সৃষ্টি,—
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত—কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত চোখের ঠাণ্ডা কাজল—তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে !

কালোর আলোর নেই তুলনা—কালোরে কী করিস্ ঘৃণা !
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল—চোখের তারা বিনা ;
কালো মেঘে জাগায় কেকা,
চাঁদের বুকেও কৃষ্ণ-লেখা,
বাসন্তী রঙ নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
কালোর গানে জীবন আনে নিথর বনে বয় দখিনা !

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর-হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপংকর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজে 'ওংকার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন-কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম স্মরিনশ্বর।

আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি ;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলের ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে ;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি' থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।

সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে ;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি ।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সুজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে ;
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে ।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে ।

ফুল-শিরনি

(মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আহূত সভায় কোজাগর পূর্ণিমায় পঠিত)

গুগ্‌গুলু আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে !
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে !
পূর্ণিমা রাতি ! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু-মুসলমান !

পীর পুরাতন,—নূর-নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হ'ন।
তাঁরই ইশারায় মিলিয়াছি মোরা
হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি' ;
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি
ফুল-শিরনির ডালি।
পুলকের ফেনা সফেদ বাতাসা
শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান
আলাপের তাম্বুল !
মিলন-ধর্মী মানুষ আমরা
মনে মনে আছে মিল,
খুলে দাও খিল, হানুক নিখিল
দাও খুলে দাও দিল !
হিন্দু-মুসলমানে হয়ে গেছে
উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগড়ী-বদল-ভাই—সে আদরে
সোদর-অধিক হয়।
সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
আমাদের এই দেশে !
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
বাউলে ও দরবেশে !
বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ,—
সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি' কুতূহলে
মোরা দোঁহে দিন যাপি

মিলন-সাধন করিছে মোদের
বিশ্বদেবের আঁখি,
তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে গেল ফুল—
শিরনিতে মাখামাখি !
গুগ্‌গুলু জ্বালি' ধূপের ধোঁয়ায়
মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে
সিতার উঠেছে বাজি' !

গান

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি !
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি !
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদমহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি ।

মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলায় কমল গন্ধে মাতায়,
পায়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' যোগায় গো সে,
কোল-ভরা তার কনক ধানে
আটটি শিষে বাঁধা আঁটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি

আমি

তোমরা সবাই যা' বল ভাই, আমি তো সেই আমিই,
সমান আছি সকল কালে,—সমান দিবাযামী;
আমি তো সেই আমি।

বাইরে থেকে দেখছে লোকে,—
বেজায় বুড়ো,—চশমা চোখে,
মুখোস দেখে যাচ্ছে ঠ'কে,—ভাবছে 'এ নয় দামী'!
কিন্তু আমি জানছি মনে—আমি তো সেই আমি!

ভিতরে যে মনটি আছে
উল্লাসে সে আজো নাচে,—
নাচত যেমন বাল্যে পেলে মুড়কি-লাড়ুর ধামী
আমি তো সেই আমি!

বাইরে ভেঙে পড়ছে মাজা
কিন্তু আছে প্রাণটি তাজা,
যৌবনে সে যেমন ছিল হৃদয়-মধু-কামী ;—
আমি তো সেই আমি।

মায়ের দুলাল, মিতার মিতা,
দাদার ভাইটি, ছেলের পিতা,
সীতার শ্রীরাম—তার মানে ওই গৃহিণীটির স্বামী ;
আমি তো সেই—আমি।

শানাই-বাঁশী—কানাই-বাঁশী—
আগের মতোই ভালবাসি,
ভালবাসি রঙ্গ হাসি—যায়নি লেহা থামি' ;—
আমি যে সেই আমি।

ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবীর-মাখা মেঘের কোণে সূর্য অস্ত-গামী ;
আমি যে সেই আমি।

সকল শোভা সুখের মাঝে
আমার আমি মিশিয়ে আছে,—
মোহন-মালার মধ্যিখানের পান্না-হীরার খামি ;—
আমি গো এই আমি।

দেখছ বুড়ো বাইরে থেকে,—
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দু'টো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিলবে সালতামামী ;
আমি যে সেই আমিই।

ভোজ ও পুত্তলিকা

(৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র দর্শনে)

যে এসেছে আজ আসনে বসিতে
তায়ো ভালে রাজ-টীকা,
তবে কেন তোরা হইলি বিমুখ
ওরে ও পুত্তলিকা !

তোরা কী বলিবি ? চিরনির্জীব
তোদের কী আছে কথা ?
পুতুল থাকিবি পুতুলের মত ;—
কেন এই বাতুলতা ?

চাষারে তো ক'রে তুলেছিলি রাজা,—
তাহাতে তো ছিলি রাজী,
ভোজরাজে দেখি তবে কেন হেন ?
কেন এই ভোজবাজি ?

চোখ, মুখ,—সব থাকে পুতুলের,
তবু সে কহে না কথা,
পুরানো সে ধারা ভেঙেচুরে দিবি ?—
সনাতন মৌনতা ?

পুতুল হইয়া তর্ক করিবি ?
ছেড়ে চলে যাবি পায়া ?
ভোজ বসে যদি এ মহা-আসনে ?—
নাই কি রে দয়া মায়া ?

বত্রিশখানা হয়ে চ'লে তোরা
যাবি বত্রিশ দিকে ?
জনমের মত ধূলিসাৎ করি'
পুরানো আসনটিকে ?

বিক্রম এই আসনে বসেছে ?
বসেছে ;—তাহাতে কিবা ?
তারপরে কত বসেছে কুকুর,
বসেছে তো কত শিবা।
তোরা তো মাত্র পুতুল ; তোদেরো
আছে নাকি মতামত ?
যা'হোক কিন্তু, খুব দেখাইলি ;—
চরণে দণ্ডবৎ !
রাজা নিজে খাড়া রয়েছে সমুখে,—
তাহারে বসিতে বল,
তা' না,—জুড়ে দিলি প্রশ্নের পরে
প্রশ্ন অনর্গল !
গল্পের পরে গল্প চলেছে
নাম নাই ফুরাবার,
লগ্ন ফুরায়ে যায় যে এদিকে,
খবর রাখিস তার ?
ভোজ হতে নয় বিক্রমই বড়,—
বড় বত্রিশ বার ;
তা' ব'লে আসনে বসিতে দিবি না ?—
এই কি শিষ্টাচার ?
বড় মুখ ক'রে এসেছে বেচারা,—
ওরে তোরা দয়া কর ;
দেখ দেখি কত ডঙ্কা, নিশান,
কত সে আড়ম্বর !
দধি, দর্পণ, দূর্বা এনেছে
সাজায়ে সোনার থালে,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর ছবি
লিখেছে বাঘের ছালে।

বিক্রম সম সাহসটি ঠিক
না-হয় নাহিক' বুকে,—
না-হয় অবোধ ঘোষণা করেছে
নিজ যশ নিজ মুখে ;—
তবু, একবার বসিতে দে, আহা
কেন থাকে মনে খেদ ;—
এ কি ! যাস কোথা ? না ফুরাতে কথা
মাঝখানে দিলি ছেদ !
সওয়াল-জবাবে নাকাল করিয়া
শেষে দিলি পিট্‌টান !
'হাপু-গেলা' হয়ে হবু-মহারাজ
হাপুস নয়নে চান !
পাষাণের প্রাণ নেহাৎ তোদের,
না, না, থুড়ি, কেঠো প্রাণ,
বাদ্যভাণ্ড করিয়া পণ্ড
হ'লি অন্তর্ধান !
কালকূটে ভরা চামচের মত
দিনে ওড়ে চামচিকা,
রাজটীকা তোরা ব্যর্থ করিলি,
নারাজ পুত্তলিকা !

নষ্টোদ্ধার

আমরা এবার মন করছি
ডোবা-জাহাজ তুল্‌তে,
যাচ্ছি সাগর—ভরাডুবির
ধনের ঘড়া খুলতে !

মোহর-ভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোনা জল ঢুকে যায়—
লোনা তবু সোনাই থাকে
পারি নে সে ভুলতে ;
আমরা এবার পণ করেছি
ডোবা-জাহাজ তুলতে !

মন করেছি আমরা ক'জন
নষ্ট মানুষ তুলতে,
পঙ্কে আছি নাবতে রাজী
মনের চাবি খুলতে !
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে—
মজিয়ে থাকে মগজটাকে—
মানুষ তবু মানুষ, ওগো
পারব না তা' ভুলতে,
মন করেছি—পণ করেছি
হারা-হৃদয় তুলতে ।

উছল ঢেউয়ের পিছলা পিঠে
হবে রে আজ দুলতে,
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব,—
পারিস যদি উল্‌তে ;
জাহাজীরা যাদের মানে
—হাজা-মজার হিসাব জানে—
তারা তো কেউ দেখায় না ভয়,—
দিচ্ছে সাহস উলটে ;
আয় তবে আয়, চল দরিয়ার
ওলোন-ঝোলায় ঝুল্‌তে ।

লোনা জলে রেশম পশম
আর দেওয়া নয় ফুল্‌তে,
আর দেওয়া নয় পতিত জনে
পাপের নেশায় ঢুলতে ;
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে,—
আমরা শোধন করব তাকে,
করতে হবে নূতন বোধন
জাগিয়ে তারে তুলতে,
মানুষ—দোষে গুণেই মানুষ,—
পারব না সে ভুল্‌তে।

কাঁটা-ঝাঁপ

কাঁটা-ঝাঁপের বাজনা বাজে, ঢাকের পিঠে পাখনা দোলে,
মহেশ্বরে স্মরণ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড় কাঁটার কোলে।
দৃষ্টি রাখিস শিবের পায়ে, চাস্‌নে রে আর নিজের প্রতি,
কাঁটার জ্বালা ভোলায় ভোলা,—ভুলিস্‌নে তা' ব্রতের ব্রতী।
দেবতা মানুষ সবাই মিলে তোর পানে আজ আছে চেয়ে,
মঞ্চে উঠে ডরাস নে মন ! পিছাসনে রে সামনে ধেয়ে।
সংসারী তুই সন্ন্যাসী আজ শিবের শুভ প্রসাদ লাগি',
শিবের পায়ে হৃদয় সঁপে পালিয়ে হ'বি পাপের ভাগী ?
আগুন লুফে কাঁটায় শুয়ে দিন ক'টা তুই কাটিয়ে দে রে,
শিবের দোহাই, পিছাস্‌ নে ভাই, পরীক্ষাতে যাসনে হেরে।
ঝাঁপ দিয়ে পড় কাঁটার বুকে উল্লাসে প্রাণ উঠুক মেতে,
কাঁটা সে হয় কুসুম-শয্যা মহেশ্বরের কটাক্ষেতে।
কাঁটা তো নয় কেবল কঠোর, রুদ্র শিবের অঙ্গুলি ও,—
কোল যে দিতে পারে কাঁটায় সেই মহেশের হয় রে প্রিয়।
জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে ;
শঙ্কা কি তোর ? ঝাঁপ দিয়ে পড়, দেখ রে তাঁরে নিজের মাঝে

গান

মন ! আমায় হারায়ে যা' রে !
(তোর) কাজ কি রে আর কূল-কিনারে ?
কান্না-হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অকূল পানে চল রে বেয়ে
(যেথা) কূল ভাঙে না বান ডাকে না—
তরঙ্গ নেই যে পাথারে !

ক্ষুদ্রের প্রার্থনা

ঠাঁই দাও সখা ! কুণ্ঠা-কাতর
শীতল-শিথিল কুন্দরে ;—
ব্যথা-বিমর্ষে তোমারি হর্ষে
তব নিরাময় সুন্দরে ।
লুকায়ে লও হে লাজ-লাঞ্ছিতে
অনাথ-শরণ ধূলিতে—
লজ্জা-হরণ তোমার চরণ-
কমলের রেণুগুলিতে !
কুহেলি আঁধার মরণের পারে
অমৃতে জুড়ায়ে দাও হে তাহারে
ক্ষুদ্র তরীটি লও হে ভিড়ায়ে
চির-নিরাপদ বন্দরে ।

শীতান্তে

আজিকে শীতের শেষ সবুজের নবোন্মেষ,
জলস্থল বিকাশ-বিহ্বল !
মত্ত হাওয়া হাহা স্বরে কারে যেন খুঁজে মরে,
দেহ প্রাণ আকুল চঞ্চল ।

মন তবু আজি কয় এ উৎসব কিছু নয়,
আমি আর নহিক' ইহার ;
সকল হাসির মাঝে আমি দেখিতেছি রাজে
আজ শুধু কঙ্কালের হার !
আমি শুধু ছায়া গণি' শুনি' নিজ পদধ্বনি
খুঁজে ফিরি বিশ্বের দুয়ার,
চড়ায় ঠেকেছে তরী,— আমি শুধু ভেবে মরি,
ফিরিল না এখনো জুয়ার !
দুই পারে আনাগোনা দুই পারে যায় শোনা
আনন্দের মৃদু কোলাহল,
আমি হেথা কর্মহীন ব'সে আছি দীর্ঘ দিন,—
দীর্ঘ দিন বেদনা-বিহ্বল !
দুনিয়ার দুই পিঠে মরা বাঁচা দুই মিঠে,
তিক্ত শুধু ম'রে বেঁচে থাকা ;
পুতুলের প্রাণ ধ'রে খেলাঘরে বাস ক'রে
কলের টিপনে ডাক ডাকা।
আর না, আর না খেলা, ডেকে লও এই বেলা,
লীলাময়, আর কেন, হায় !
মরণ-সিন্ধুর নীরে তুফান তুলিয়া, ধীরে
ডুবাইয়া লও করুণায়।

সুদূরের যাত্রী

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
চ'লে যাই, ভাই,
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ,
দেখিবে সে নাই।

তোমরা খুঁজিবে কিনা জানি না ; সকলে
চাহিয়াছি আমি ;
খেলায় দিয়েছি যোগ, আমি তোমাদের
ছিনু অনুগামী।
তোমাদের মাঝে এসে অনেক ঘটেছে
কলহ বিবাদ,
আজ ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা কর ভাই
মোর অপরাধ।
আমার একান্ত ইচ্ছা ভাল-মন্দ সবে
তুষ্ট রাখিবার,
সে চেষ্টা বিফল হয়ে গেছে বহুবার
অদৃষ্টে আমার।
আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি,
আজ ক্ষমা চাই ;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,—
আমি জানি, ভাই !
তোমাদের কাছে যাহা পেয়েছি সে মোর
চির জনমের,
উঠাতে চাহিলে আর উঠিবে না কভু
চিহ্ন মরমের।
খেলাধূলা কতমত, অশ্রুভরা স্মৃতি
সারা জীবনের,
মেলামেশা, ভালবাসা, কোলাহল, গীতি,
আনন্দ মনের,—
যেমন রয়েছে আঁকা মরমে আমার
রবে সে তেমনি,
যা কিছু প্রাণের মাঝে করেছি সঞ্চিত
অমূল্য সে গণি।

মনে থাকে মনে কোরো, আমি তোমাদের
ভুলিব না, হায়!
তোমাদের সঙ্গ-হারা সঙ্গী তোমাদেরি
বিদায়! বিদায়!

আবার

যেদিন আবার ফুটবে মুকুল
সেদিন আমায় দেখতে পাবে;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাকব দূরে কোন্ হিসাবে
আসব আমি স্বপন ভরে,
গভীর রাতে ভুবন 'পরে;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে!
তোমরা যখন কইবে কথা
শুনব আমি শুনব গো তা',
আমার কথা হরষ-ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে!

পুনর্নব

আমার প্রাণের গানটি নিয়ে
গাইলে কে গো আমার কানে?
বন্ধ হ'ল কণ্ঠ আমার
উথলে-ওঠা অশ্রু-বানে।
আমারি বাসন্তী গীতি—
আমারি সে কণ্ঠ নিয়ে,
আজি এ ঘুমন্ত রাতে
কে যায় গো ওই গেয়ে গেয়ে!

যে গান আমার কণ্ঠে ছিল
ফুটল সে আজ কাহার তানে ;
হারা দিনের লুপ্ত ধারা
জাগল সে কি নূতন প্রাণে ?

প্রভাতের নিবেদন

প্রভাতে বিমল করেছ যেমন
অমনি বিমল কর মন,
অমনি শান্ত শীতল, অমনি
হরষের রসে নিমগন।
বেদনার কিবা উদ্বেজনার
চিহ্ন না থাকে কোনোখানে আর,
ছেয়ে যায় যেন আলোয় পরান,
বয়ে যায় মৃদু সুপবন।

পরীক্ষা

আমারে আজিকে ফেলেছিলে, প্রভু,
বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় ;
নব জীবনের দুয়ার যে সেই,—
আমি তো আগে তা' বুঝিনি, হায় !

উচ্চারি' মোর মুকতি-মন্ত্র,—
মোর অজ্ঞাত আমারি বল,
করি' প্রবুদ্ধ করিলে শুদ্ধ,
হৃদয় করিলে সুনির্মল।

সহসা পড়িল বজ্রের শিখা
নিরালায় মোর পরান 'পরে,
জ্বলে গেল যত গ্লানি জঞ্জাল,
গেল জ্বলে গেল ধুধু ধু ক'রে।

সে যে উর্বর করে দিয়ে যাবে
সে কথা জানিতে পারেনি আগে,
আমি ভেবেছিনু মূর্তিমন্ত
মরণ আজিকে আমারে ডাকে!

একেবারে শত লেলিহ রসনা
লেহন করিতে লাগিল দেহ,
বিশুষ্ক তালু-লগন জিহ্বা,
ফুকারি' ডাকিতে নাহিক' কেহ।

রোম-কণ্টকে ভরিল শরীর
মূর্ছা হাসিল মদির হাসি,
তখনো জানিনি তুমি সে নিভৃতে
করিছ শিথিল মোহের ফাঁসি।

চপল মনের শেষ নির্ভর
অন্তরযামী জানিতে একা,
আগুনে পোড়ায়ে করি' পবিত্র
চিত্তে আবার দিলে হে দেখা।

যত পণ করি আপনার মনে
বারবার তাহা টুটিয়া পড়ে,
তাই করুণায় কঠোর হয়েছ
শক্তি প্রেরণা করিতে জড়ে।

শ্যামিকায় তুমি শুদ্ধ করেছ,
উজল করেছ, করেছ খাঁটি,
দুঃসহ তাপে তপ্ত করেছ,
তাই তো ঝরেছে মলা ও মাটি।

রুদ্র-মূরতি! তোমার আরতি
করিতে আজিকে শিখেছি, প্রভু!
বারে বারে মোরে কোরো পরীক্ষা,
দুর্বলে ভুলে থেক না, কভু।

পথের পঙ্কে

পথের পঙ্কে পড়েছে যে ফুল,
ওগো, তারো পানে ফিরিয়া চাও!
তার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মুখ
তুমি স্নেহভরে মুছায়ে দাও!
এখনো যে তার মৃদু-সৌরভ
নীরবে জানায় তারি গৌরব,
তারে পায়ে দ'লে যেয়ো না গো চ'লে,
বেদনা তাহার তুমি ঘুচাও!
পরুষ পরশে তারে ছুঁয়ো নাক'—
পাপড়ি পড়িবে টুটিয়া,
নব বেদনায় ব্যথিত সে, হায়,
কাঁদিবে লুটিয়া লুটিয়া;—
শুধু ভালবেসে নাও যদি তুলে
গ্লানি কলঙ্ক সব যাবে ভুলে,
মরিবার আগে নব অনুরাগে
মনোপ্রাণ তার যদি জুড়াও!

যথার্থ সার্থকতা

আমার কামনা বিফল করিয়া
আমারে সফল কর, নাথ !
আবিল হৃদয়ে আঁখিজলে ধুয়ে
প্রভু ! তুমি ধীরে ধর হাত !
কোন্ পথে যাব তুমি শুধু জান,—
কোথা আছে মম ঠাঁই,
ভাঙা বাঁশী আর কি কাজে লাগিবে
আমি শুধু ভাবি তাই !
সাধ ক'রে শুধু ঘটেছে বিষাদ
আর করিব না কোনো সাধ,
হীন এ হৃদয়ে দীনতা শিখাও,
চরণে করি হে প্রণিপাত।

পিপাসী

তোমারি চরণ-কমলের মধু-
পিপাসায় প্রাণ কাঁদে !
চিত্ত-চকোর মত্ত হয়েছে,
ছুঁইতে ছুটেছে চাঁদে !
স্বপন-বরষা নেমেছে সহসা
নীরবে ভুবনময় !—
ফুলগুলি কথা কয় !
বাতাস কোথায় নিয়ে যেতে চায়
উদাসীন উনমাদে !
মরম-বীণায় ছিঁড়ে গেছে তার
তাই আছি ম্রিয়মাণ,
থেমে আছে তাই গান

তুমি তারে তারে দাও নব প্রাণ,
জাগাও নূতন তান!
আঁখিজলে মোরে করি' নিরমল
ফোটাও তরুণ হাসি,—
শারদ শেফালিরাশি;
দুঃখের ধূপে সুরভি কর গো
মিলনের আহ্লাদে!

সফল অশ্রু

নয়নের জল সফল হয়েছে
প্রভু হে তোমার চরণ ছুঁয়ে;
বর্ষা-যামিনী কেঁদেছিল, তাই
মলিনতা তার গিয়েছে ধুয়ে!
সূর্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না,
বজ্র জ্বালিয়া করিলে আলো,
শুষ্ক আমার শূন্য হৃদয়
অশ্রু-সলিলে ভরিলে ভালো।
অবিরল ধার করুণা তোমার
প্রভু হে দিয়েছ লুটায়ে ভুঁয়ে,
ভাবনার আজি অন্ত পেয়েছি
পরানের ভার চরণে থুয়ে।

প্রার্থনা

ধরম ব'লে যা' মরম জেনেছে
সেই সে করম করিতে দাও,
পরম শরণ! অভয় চরণ
কম্পিত করে ধরিতে দাও।

হৃদয়ে আমার জ্বালো প্রভু জ্বালো
তোমার করুণ নয়নেরি আলো,
তোমারি প্রসাদ জনমে মরণে
নিত্য নিয়ত বরিতে দাও।
স্তব্ধ করিয়া দাও হে আমার
লুব্ধ মনের চির হাহাকার,
শান্তি-শীতল তব পারাবারে
শূন্য জীবন ভরিতে দাও।
সূর্য না ওঠে তুমি জেগে রবে,—
বন্ধু না জোটে তুমি ডেকে লবে,—
এই আশা-বাণী অন্তরে মানি'
অকূল পাথারে তরিতে দাও।

ভিক্ষা

জাগিয়ে রেখো একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখো আমার 'পরে,-
চোখে যখন দেখতে না পাই ভালো
দু'চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—
গহন আঁধার, অকূল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা,—
জ্বালিয়ে রেখো তোমার প্রেমের শিখা।

বিপুল জগৎ ক্ষুদ্র হয়ে এলে
ঠাঁই যেন পাই তোমার ছায়ায় প্রভু!
নীল আকাশে ক্লান্ত আঁখি মেলে
শান্তি যেন পাই পরানে, তবু!
চক্ষে ধারা, বাইরে আঁধার—দ্বিগুণ কুজ্ঝটিকা,
জাগিয়ে রাখো অমর প্রেমের শিখা।

বাইরে যখন লজ্জাতে শির নত,—
নিষ্ফলতার নিঃস্ব নিশাস প্রাণে,
অন্তরেতে অপমানের ক্ষত
রসাতলের পথে যখন টানে,—
বুকে যখন জ্বলে সঘন সর্বনাশী চিতা,
দয়া রেখো পিতা! আমার পিতা!

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখো আমার যাত্রা-পথে,
ঘিরবে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো
ফিরতে যেদিন হবে নীরব রথে,
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তন্তু তিতা;—
দয়া রেখো পিতা! আমার পিতা!

আকিঞ্চন

ভেঙে আমায় গড়তে হবে, প্রভু!
মনের মতন করতে হবে, মন!
অভাজনের এই নিবেদন, ওগো!
দুর্বলের এই প্রাণের আকিঞ্চন!
ক্ষণে ক্ষণে পড়ছি দেখ হেলে,—
ঢেউগুলো সব যাচ্ছে আমায় ঠেলে.
প্রাণের ভিতর শক্তি নাহি মেলে,
ঠাকুর আমার! আমার নিরঞ্জন!

লক্ষ ঠাঁয়ে নোয়াই মাথা, প্রভু!
দেখাদেখি ছোঁয়াই মাথা পায়ে,
চল্‌তে বাঁয়ে ডাইনে কেবল চাহি,
ডাইনে যেতে তাকাই ফিরে বাঁয়ে!

মনে মনে জান্‌ছি যেটা মেকী
পরের চোখে তারেই খাঁটি দেখি !
ভয় করি হায়,—বলবে শেষে কে কি ;—
আঁচড় কি আঁচ লাগ্‌তে না পায় গায়ে।

পঙ্গু হয়ে পড়ছি এম্‌নি ক'রে
সায় দিয়ে যে ফেলছি গো না বুঝে !
বিকিয়ে গেল মগজ-মহাল-খানা
সই দিয়ে হায় চক্ষু দুটি বুজে ;
জীর্ণ ঢাকা অভ্যাসেরি রথে
চলছি, প্রভু, সর্বনাশের পথে,
খুলছেনাকো দৃষ্টি কোনো মতে,
দিগ্বিদিকের ঠিক নাহি পাই খুঁজে।

সামনে বিপদ চক্ষে নাহি দেখি,
দারুণ আঁধার নাই গো আমার সাথী ;
বাঁচাও তুমি বাঁচাও মোরে, প্রভু !
জাগাও প্রাণে তোমার অমল ভাতি।
মনকে আমার মনের মতন কর,
ওগো প্রভু ! ভেঙে আমায় গড়,
সৃষ্টি তুমি কর নূতনতর,
ফোটাও ফুলে বজ্র-অনল-পাঁতি !

—সে ক্রমে হচ্ছে নিষ্করুণা—
রক্ষা কর, রক্ষা কর স্বামী !
কুণ্ঠা, গ্লানি দগ্ধ তুমি কর
হে বজ্রধর ! মর্মে এস নামি' ;

পণ্ড শত পূর্ব প্রতিজ্ঞা সে
স্মৃতির হ্রদে শবের মত ভাসে,
টানছে আমায় সর্বনাশের গ্রাসে,
বাঁচব তবু তোমার কৃপায় আমি।

দয়া আমায় করতে তোমায় হবে
মনের মতন করতে হবে মন,
নূতন কথা নয়কো এ তো প্রভু!
এ যে তোমার বিধান সনাতন;
গড়তে ব'সে খেলছ ভাঙন-খেলা,—
জগৎ জুড়ে চিহ্ন যে তার মেলা!
ভেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির ঢেলা
করলে মানুষ,—দিলে জ্ঞানাঞ্জন!

সৃজন-লীলার প্রথম হতে প্রভু!
ভাঙাগড়া চলছে অনুক্ষণ,
পাখী-জনম শাখী-জনম হতে
রাখ্‌ছ কথা—শুনছ নিবেদন;
আজ কি হঠাৎ নিঠুর তুমি হবে?
কান্না শুনে নীরব হয়ে রবে?
এমন কভু হয় না তোমার ভবে,
মনে মনে বলছে আমার মন!

আমায় তুমি পক্ষী-মাতার মত
যুগে যুগে করলে আচ্ছাদন,
আকাশ-ডানা দিগন্তে তাই নুয়ে
নীড়ের তৃণ করছে আলিঙ্গন!

সকল ধনে করলে আমায় ধনী,
পদ্ম-ফুলে রাখ্‌লে, প্রভু, মণি,
বুদ্ধি দিলে—যোগ্য আমায় গণি',
তবু আমার ভরল না, হায়, মন।

এবার আমায় করতে হবে খাঁটি,
ওগো আমার দীপ্ত হুতাশন!
পুড়িয়ে দেবে সকল মলামাটি,—
রাঙিয়ে আমায় নেবে নিরঞ্জন!
পাখী শাখী মানুষ হ'ল, তবু
মনের মতন মন হ'ল না কভু,
ভেঙে আমায় গড়তে হবে, প্রভু!
মনের মতন করতে হবে মন।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,
অহংকারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওংকার,
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার
আদরে ও অনাদরে,
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ংবরে,—

কৌস্তুভ আর-বনফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার,
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে-জন বুকে,
শমীতরু সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,
অনাগত কোন্ অমৃতের লাগি',
তাহারে নমস্কার।

নিশান্তে

আঁধার ঘরের বাহিরে কে ওই
হের দেখ ওগো চাহিয়া!
সমীর এনেছে কার সংবাদ
সুপ্তি-সাগর বাহিয়া!

রুদ্ধ দুয়ার খুলে দাও, আঁখি মেলে চাও,
কমল-কোরক ধ্যানে কি জানিল—জেনে নাও,
চঞ্চল হ'ল আহ্লাদে পাখী
উড়িছে-পড়িছে গাহিয়া ;
স্ফুরিছে আলোক ঝুরিছে গন্ধ
প্রেম-নীরে অবগাহিয়া।

দেব-দর্শন

অর্ধ-উদয় দেখেছি তোমায়
দেখেছি উদয়-সাগর-কূলে,
ওগো সুমহান্ ! ওগো শুভ ! মোর
আধেক বাঁধন গিয়েছে খুলে।

দেখেছি তোমার সহস্র বাহু
অযুত শীর্ষ দেখেছি চোখে,
যন্ত্রীর বেশ দেখেছি তোমার,—
সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।

অপ্রমত্ত অযুত হস্ত
দেখেছি,—দেখেছি তড়িৎ-আঁখি,
শুনেছি তোমার অভয় বচন,
অন্তরে ছবি গিয়েছে আঁকি।

একের মধ্যে দেখেছি অনেক,
বহুর মধ্যে দেখেছি একে ;
শঙ্কা-হরণ শঙ্কর তুমি,
বিমোহিত মন মূরতি দেখে।

বিজলী-ঝলকে দেখেছি পলকে
জীবনে কখনো দেখিনি যাহা,—
সংকেতে বাঁধ সাগরের ঢেউ,
ইঙ্গিতে গিরি হেলাও, আহা !

আঁধারে আলোকে দেখেছি পুলকে
আঁখির পলকে দেখেছি আধা,
উদ্যত তব সহস্র বাহু
নিয়মের রাখি-সূত্রে-বাঁধা !

সংযত তুমি, সংহত তুমি,
তুমি সুবিপুল শকতি-রাশি,
ওগো সুবিরাট ! ওগো সম্রাট !
অতুলন তব অভয় হাসি !

অর্ধ-উদয়ে দেখেছি তোমায়,
পূর্ণোদয়ের পেয়েছি আশা ;
ওগো প্রিয় ! ওগো কাঙ্ক্ষিত !—মোর
মরণ-জয়ের পড়েছে পাশা ।

নাট্য

এই নাটিকায় রাজবধূদের মাথায় স্বস্তি-মুকুট ; পরনে তিল-ফুল বুটিদার ও ভোম্‌রা বুটিদার ও ভাণ্ডীর বুটিদার জরির তেরছা ডুরে। কানে কর্ণিকা ; হাতে 'যবাঙ্কুরী' নামক উৎসর্পী কঙ্কণ ; গলায় মুক্তার শতাবলী হার ; কোমরে কাঞ্চী ; পায়ে 'ভ্রমরী' নূপুর।

প্রধান সহচরীদের মাথায় মুক্তার সীমন্তিকা ; পরনে জরির তেরছা ডুরে, বুটি নাই। কানে 'তালপত্রী' ; হাতে তালী কঙ্কণ ; পায়ে 'গুঞ্জরী' নূপুর।

তরুণীদের মাথায় মুক্তার একাবলী ; পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ী। কানে চাঁপা ; হাতে গুঞ্জাবলী কঙ্কণ ; পায়ে নূপুর ; গায়ে ফুলের গহনা।

বধূনাট্যের কারো মাথায় চাঁপাই চূড়ো, কারো জোড়-চামর-খোঁপা, কারো ত্রিধম্মিল্ল, কারো চতুঃশৃঙ্গ, কারো পঞ্চফণা।

বেত্রবতী ও যবনীদের গায়ে কঞ্চুক ; কানে কুণ্ডল।

নাট্যোক্ত চরিত্র

অযোধ্যার রাজবধূ

সীতা — উর্মিলা

মাণ্ডবী — শ্রুতকীর্তি

রাজবধূদের প্রধান প্রধান সহচরী

কুরঙ্গিকা — বিহঙ্গিকা

চঞ্চরীকা — নকুলিকা

সুমিত্রার দাসী

তন্দ্রাবুড়ী (ওরফে চন্দ্রাবলী)

প্রতিহারিণী

বেত্রবতী

পুরবাসিনী তরুণী

তরঙ্গিকা — নিপুণিকা

বল্লরীকা — মুকুলিকা

পতঙ্গিকা — সুপর্ণিকা

কপোতিকা — সাগরিকা

আরাত্রিকা — মদনিকা

মালিনী, শবরী, ভাণমতী, যবনী সাত্রী, দাসী, মালী, চামরধারিণী, করঙ্কবাহিনী, সখীর দল, বধূনাট্যের দল, যবনীর দল, ইত্যাদি ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ, শ্রুতকীর্তির আরাম-ঘর। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে অর্ধশয়ান মুক্তকেশী শ্রুতকীর্তি : প্রধান সহচরী নকুলিকা তাঁর মুক্তকেশে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে। সখীর দল ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে ; এদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে পদ্মপাতা ; কারো বা ধূপদানী, আবার কারো বা মৃণালের মালা।]

সখীর দল ॥ (গাইছে)

গায়ে সই সইবে না রোদ
শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে !
জোছনা নিছিয়ে-নেওয়া
নিছনি তোর মুখখানিতে !
দুপুরে দারুণ রোদে
সারীশুক নয়ন মোদে,
হরিণী হারায় দিশা
মরীচিকার হাত-ছানিতে !

ঝাঁঝি সব ঝাঁঝিয়ে গেছে
সায়রে জলের মাঝে,
ঝাঁঝা রোদ মাথার 'পরে
মগজে ঝাঁজর বাজে !
ধেয়ে যায় হল্‌কা হাওয়া
হ'ল দায় আরাম পাওয়া
বসুধার বুকের সুধা
ফুরায় রোদের বালাই নিতে !

পলাশের চক্ষু রাঙা
ভ্রমরী ভিরমি গেছে,
দুনিয়ার শুকনো পাতায়
খামোকাই ঘুর লেগেছে !
সারঙের সুর নেমে যায়,
পাপিয়ার তান থেমে যায়,
আকাশের শান্ ঘেমে যায়
চাতক পাখীর কাতরানিতে !

উশীরের গুচ্ছ কোথা ?
মৃণালের কই রে মালা ?
ঘিরে দে পদ্মপাতায়,—
বাতাসে বিষের জ্বালা।
দিনে রাত ঘনিয়ে আনো,—
ঘরে আজ চুল শুকানো.—
চামরে ঢুলিয়ে নয়ন
ধূপের ধোঁয়ার আমদানীতে ॥

শ্রুতকীর্তি ॥ (চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে) তোর ধূপদানী সরিয়ে-নে, নকুলিকা,…কত ধোঁয়া কল্লি দেখ্ দেখি, মাথা ধ'রে গেল।

নকুলিকা ॥ চুল কিন্তু ভিজে রয়েছে…

শ্রুতকীর্তি ॥ তা' থাক্, তুই ধূপদানী সরিয়ে-নে,…ধোঁয়া করেছে দেখ না, যেন গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিয়েছে।

নকুলিকা ॥ সাঁজ না হতেই সাঁজাল,…কসুর হয়েছে !

শ্রুতকীর্তি ॥ দেখ্ নকুলিকা !

নকুলিকা ॥ এরা সব যে হুকাহুয়ার দোহার্‌কী শুরু করেছে…আমি বলি সন্ধ্যেই বা হ'ল,…অযোধ্যায় আজকাল দিন-দুপুরে শেয়াল-রাগিণী শোনা যাচ্ছে !…সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে অবধি এমনি অরাজকই হয়েছে বটে !

শ্রুতকীর্তি ॥ নকুলিকা !…সব সময়ে নকল ভালো লাগে না।

নকুলিকা ॥ আসল মানুষকে ডাকব নাকি ?

শ্রুতকীর্তি ॥ আবার !···

নকুলিকা ॥ আবার কই ?···এই তো প্রথম বার।···না, না, খুড়ি, ভুল হয়েছে···দ্বিতীয় বার। তা' আমার উপর চোখ পাকালে কি হবে ? আমি আর কি করব বল ? দুপুর রোদ্দুরে, তিন মোড়ি পার হয়ে, চিঠি নিয়ে দৌড়-পাড়াপাড়ি কল্লুম,—তোমার তাঁকে বল্লুম,—চিঠি জরুরী, জবাব চাই। তিনি তখন নিজের তৈরী শত্রুঞ্জয় খেলার ছক পেতে বসেছেন, খেলাতেই মত্ত, ঘাড় না তুলেই বলা হ'ল, 'তুমি যখন পত্রবাহক তখন চিঠি যে জরুর-ই, তা বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু জবাব'—এই পর্যন্ত বলেই ভুরু কুঁচ্‌কে বাতাসের গায়ে আলপনা দিতে লাগলেন। আমি প্রহর খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলুম।

শ্রুতকীর্তি ॥ উঃ, পুরুষ মানুষ কি হৃদয়হীন !—কি স্বার্থপর ! খেলায় মত্ত—চিঠির জবাব দেবার অবসর নেই !—একটু দায়িত্বজ্ঞানও কি নেই ? সম্রাট নগরের বাইরে, ধূমকেতুর দোষদৃষ্টি কাটাবার জন্যে কুলগুরুর আশ্রমে স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত,—এদিকে এরা চার ভায়ে পাঁচ-পরের ভরসায় দুর্গ ছেড়ে কোথায় যে চলেছেন, তা তাঁরাই জানেন, আর ধর্মই জানেন।

নকুলিকা ॥ (ছোটো গলায়) মন্দ কি ? নতুনতর বন্দোবস্ত, রাজা অমঙ্গলকে রাজ্য থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন !—রাজপুত্তুররা তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আনছেন ! অমঙ্গল-বেচারারই মুশকিল ! কার কথা রাখে বল দেখি !

শ্রুতকীর্তি ॥ সঙ্গে নিয়ে যেতে বল্লুম, তা' তো হ'লই না ; এমন কি কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে তাও বলা হ'ল না ; লুকোনো হ'ল।

নকুলিকা ॥ কোথাও লড়াই বাধ্‌ল না তো ?

শ্রুতকীর্তি ॥ উহুঁ, লড়াই বাধ্‌লে সে কথা চাপা থাকত না,—চারদিকে সাজ-সাজ প'ড়ে যেত।

নকুলিকা ॥ তবে ? মৃগয়া ?

শ্রুতকীর্তি ॥ উহুঁ, সে কথা ঢেকে রাখত না···

নকুলিকা ॥ তবে ? আবার বিয়ে নাকি ?

শ্রুতকীর্তি ॥ বিচিত্র কি ?

নকুলিকা ॥ চার ভায়ের এক সঙ্গে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ হতে পারে,—আমাদের বেলা কি হয়েছিল ?

নকুলিকা ॥ না, না, তা'ও কখনো হয়, এত প্রণয়।

শ্রুতকীর্তি ॥ খুব হয় নকুলিকা, তুই পুরুষ মানুষকে চিনিস-নি, ওরা সাপের সঙ্গেও ভাব রাখে, আবার ব্যাঙের সঙ্গেও ভাব রাখে। তলায়ও কুড়োয়, গাছেরও পাড়ে।

নকুলিকা ॥ আমার তো তা মনে হয় না।

শ্রুতকীর্তি ॥ আচ্ছা তোর কি মনে হয় ঠিক কোরে বল দেখি।

নকুলিকা ॥ আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মন গানের কলির মতন, কখনো ফাঁকের দিকে গড়ায়, কখনো বা সমের দিকে ঝোঁকে। ভয়ের কোনো কারণ নেই,···ফাঁকের ঘর থেকে দ্বিগুণ ঝোঁকে সমের ঘরেই ফিরে আসবে।··· পুরুষ মানুষ···একটু ফাঁকা ভালোবাসে,···মাঝে মাঝে একটু ফাঁকে না যেতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা পাখীর জাত···হক্-না-হক্ উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে।

শ্রুতকীর্তি ॥ হু, পুরুষ মানুষ পাখীর জাত, ওদের সব ফুর্তির প্রাণ, আর মেয়ে মানুষ কুনো বেড়াল, কোণ থেকে নড়তে নেই। (পরিক্রমণ)

নকুলিকা ॥ (ছোট গলায়) না, মাথা বিগড়েছে দেখছি, গোড়ে গোড় দিয়ে দেখা যাক।

শ্রুতকীর্তি ॥ আমাদের যেন প্রাণ হাঁপায় না, আমাদের ফাঁকায় যাবার দরকার হয় না, যত জোয়ার-ভাঁটা ওঁদের প্রাণে, আমাদের একটানা গঙ্গা, কেবল ঘর আর ঘর।

নকুলিকা ॥ যা বলেছ আমাদের খালি আরসুলা, টিকটিকি আর মাকোসার সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি কোরে ঐ ঘর কামড়েই থাকতে হয়।···

শ্রুতকীর্তি ॥ আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই···

নকুলিকা ॥ ফুর্তি নেই···

শ্রুতকীর্তি ॥ ফুর্তি শুধু ওঁদের,—

নকুলিকা ॥ আর আমরা কেবল ছারপোকার মতন বাড়ি কামড়ে প'ড়ে থাকতে জন্মেছি।

(গান)

নকুলিকা ॥ তফাত করিয়া খাসা ওঁরা দূরে চলে যান,
সখীর দল ॥ আমরা বসিয়া থাকি আল্‌তো !
নকুলিকা ॥ দুনিয়াতে ওঁদেরি যা ফুর্তির প্রাণ, সই,
আমরা এসেছি ভেসে, ফাল্‌তো !

সখীর দল ॥ মিছাই পরেছি পায়ে আলতা,
নকুলিকা ॥ মিছাই রেঁধেছি গুড়-চালতা !
সখীর দল ॥ নাল্‌তে ভিজায়ে রাতে,
মিছে ছেঁকে দিই প্রাতে,
নকুলিকা ॥ পৌঁছে নাকো তবু আজ কাল তো

সখীর দল ॥ ওঁরা সব মর্দ—ফুর্তির ফর্দ লম্বা,
নকুলিকা ॥ আমাদের বেলা শুধু রম্ভা।
সখীর দল ॥ অথচ না হ'লে নারী
দিন চলা হ'ত ভারী,
নকুলিকা ॥ হেঁশেলেতে কে উনুন জাল্‌তো ?

সখীর দল ॥ অবলা বলিয়া সই সই রে,
এত অপমান জ্বালা সই রে !
নকুলিকা ॥ নাহি বাঁচি নাহি মরি,
জাঁকড়ে জীবন ধরি,
কি হবে উপায় হায় বল্‌ তা,

সখীর দল ॥ সাথে যেতে কর যদি বায়না,
আরজিটা কানে পৌঁছায় না,
ভালোবাসা ছিল মিঠে
গোড়াতে পায়েস পিঠে,
নকুলিকা ॥ শেষে কিনা আথুথুথু ! পল্‌তা !

সখীর দল ॥ আরসুলা-টিকটিকি রঙ্গে,
কোণ নিয়ে থাকো নারী সঙ্গে,
অশ্বমেধের ঘোড়া
বাইরে ফেরেন ওঁরা,

নকুলিকা ॥ হাঁত্‌ড়ে না মেলে হালচাল্‌ তো !

সখীর দল ॥ চ'লে যায় পায় পায় পায় রে !
হায় সখী হায় হায় হায় রে !
অবাক্‌ নয়নে চাই,
ছায়া কায়া ঠাঁই ঠাঁই,
(যেন) খ'সে পড়ে নারকেল-বাল্‌তো !

শ্রুতকীর্তি ॥ নাঃ, কিছুই ভালো লাগছে না।···নকুলিকা, পাল্কী তৈরী করতে বল্‌···দিদির মহলে যাব।

নকুলিকা ॥ রোসো, রোসো, মেলাই পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কারা আস্‌ছে !··· (এগিয়ে)···আর পাল্কী ব'লে কি হবে ? তিনি নিজেই আসছেন।

(সীতা, ঊর্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ)

শ্রুতকীর্তি ॥ বা !···দিদি !···তুমি···তোমরা !···এস, এস,···বেশ !··· এই আমি তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলুম।

সীতা ॥ কেন, শ্রুতি, মন টিঁকছে না বুঝি ?···এরি মধ্যে ঘর ফাঁকা ঠেকছে ? ··তুই হাসালি বোন, এখনো যে ওরা দুর্গের বাইরেও যায়নি।

শ্রুতকীর্তি ॥ না দিদি ঠিক তা নয়···

সীতা ॥ তবে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শো আছে,···আচ্ছা, দিনে দিনে এ সব কি ঘটছে ?···এগুলো কি সব উচিত হচ্ছে ?

সীতা ॥ কী গুলো ?

শ্রুতকীর্তি ॥ এই যে আমাদের কাছে লুকিয়ে কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে···

সীতা ॥ তা' গেলই বা···ঘুরে আসুক, চার ভাইয়ে তো প্রায় একঠাঁই হবার সুযোগ হয় না,···আশ মিটিয়ে বেড়িয়ে নিক,···আমরাও চার বোনে

মনের আশ মিটিয়ে গল্প-গুজব ক'রে নিই, কবে আবার নন্দীগ্রামে চ'লে যাবি। ...আবার কবে দেখা-শুনো হবে তার ঠিক কি? যে ক'দিন আছিস সে ক'টা দিন চার বোনে মিলে আযোধ্যাকে মিথিলা ক'রে তোলা যাবে, কি বলিস্?

(শ্রুতকীর্তি নিরুত্তর)

চুপ ক'রে রইলি যে?...ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব, আর আমাদের বোনে বোনে বুঝি আড়ি?

শ্রুতকীর্তি॥ না দিদি, আমার এ লুকোচুরি ভালো ঠেক্‌ছে না,...দশ বচ্ছর হোলো বিয়ে হয়েছে, এমন ভাব তো কখনো দেখিনি, আগে তো এ রকম ছিল না।

মাণ্ডবী॥ ধূমকেতু লো ধূমকেতু, এ-সব ধূমকেতু ওঠার ফল,—এই মধুমাসে অসহ্য গ্রীষ্ম,...

উর্মিলা॥ আর এই মধুর দাম্পত্য-জীবনে তার চেয়েও অসহ্য সংশয়ের গুমোট্...

মাণ্ডবী॥ 'রাহৌ গোমেদকং ধার্যং কেতৌ মরকতং তথা'...শ্রুতি, ভালো চাস তো একটা মরকত-মণি ধারণ কর, ও কেতুও যে ধূমকেতুও সে।

উর্মিলা॥ অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করলেও হয়, আস্তাবলের বাগান থেকে আনিয়ে-নে না।

মাণ্ডবী॥ আস্তাবলের বাগান কেন?

উর্মিলা॥ আস্তাবল নইলে অশ্বগন্ধা পাবে কোথায়?

সীতা॥ ক্ষ্যাপাকে আর ক্ষ্যাপাস্-নি বোন, ক্ষমা দে।

শ্রুতকীর্তি॥ না দিদি ক্ষ্যাপা নয়,...আমি স্পষ্ট কথা চাই,...সঙ্গে নিয়ে না যায় বেশ, নিয়ে যেতে হবে না,...চাইনি যেতে; কিন্তু, কোথায় যাওয়া হবে, তা' বল্‌বে না কেন?

সীতা॥ তুই কি সন্দেহ করিস্, শ্রুতি?...আমি করিনি,...করলে বাঁচতুম না।

শ্রুতকীর্তি॥ না, ঠিক সন্দেহ নয়।...তবে কি জানো,...এ কি-রকম জানো,...এ যেন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।...আচ্ছা, ব'লে গেলে কি হয়?...আমরা কি যাওয়া কেড়ে নেব?

সীতা ॥ রাজবংশের মেয়ে হয়ে তুই এই কথাটা বললি, শ্রুতি ?···জানিস-নে ?···রাজবংশে যাদের জন্ম তাদের কত বিষয়ে সাবধান হয়ে চলতে হয় ?··· দু'দিন পরে রাজ্যের ভার যাদের মাথায় নিতে হবে, মন্ত্রগুপ্তি তাদের সাধনার সামগ্রী···সব কথা জানিয়েই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ আমি অতশত বুঝতে চাইনে,···স্ত্রী তো স্বামীর ছায়া,···হাঁ কি না, স্ত্রী সর্বদা ছায়ার মতন স্বামীর অনুগামিনী হবে, আমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন ?···তুমিই বলো,···হয় বলো শাস্ত্রের এ কথা ভুয়ো, নয় তো···

মাণ্ডবী ॥ নয় তো, আর কি ? চল, সবাই মিলে ওদের রথের অনুগমন করি অর্থাৎ কিনা পিছন পিছন ধাওয়া করি···

উর্মিলা ॥ যদি ওরা ঘোড়ায় চ'ড়ে যাত্রা করে ?···

মাণ্ডবী ॥ তবে ঘোড়ার ল্যাজ ধ'রে সটান ঝুলে পড়ি,···অনুগমন তো করতে হবে !···

শ্রুতকীর্তি ॥ যাওঃ,···আমি সে কথা বল্‌ছি-নে।

সীতা ॥ তবে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ কোথায় যাওয়া হচ্ছে, অন্তত, সেইটে জানতে হবে···

সীতা ॥ কি ক'রে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ ফের চিঠি লিখে।

সীতা ॥ বেশ, লেখো।

শ্রুতকীর্তি ॥ সবাই মিলে,···চার বোনে।

সীতা ॥ আমার অত কৌতূহল নেই, তোমরা লেখো।···

উর্মিলা ॥ দিদি না লিখলে আমিও লিখব না।

মাণ্ডবী ॥ আমিও না।

শ্রুতকীর্তি ॥ এই দেখো, দিদি, তুমি না লিখলে কিচ্ছু হবে না···নারীর ন্যায্য অধিকার দাবী করবার লোকের অভাবে মাঠে মারা যাবে !

সীতা ॥ তুই জ্বালালি···কি লিখতে হবে, শুনি ?

শ্রুতকীর্তি ॥ লিখে দাও না যা' ভাল হয়, তুমি তো বেশ গুছিয়ে লিখতে পারো, লিখে দাও না দু'কলম।

সীতা ॥ না, না, তুই বল্।

শ্রুতকীর্তি ॥ ঐ···ঐ কথা···সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল না,···কোথায় যাওয়া হচ্ছে তাও বলা হ'ল না। অতএব···

মাণ্ডবী ॥ অতএব···

তোমাদের সঙ্গে আড়ি!
আমরা রইলুম বাড়ি!
আমরা রাঁধব, আমরা বাড়ব,
আমরা খাব পায়েস।
চব্বিশ ঘণ্টার চোদ্দ ঘণ্টা
ঘুমিয়ে করব আয়েশ!

শ্রুতকীর্তি ॥ নাঃ, তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তোমরা খালি ঠাট্টাই শিখেছ। আমি চললুম আর্যা সুমিত্রার কাছে।

সীতা ॥ না, না, তাঁকে আর জ্বালাস নে। আমার মহলে চল, সেইখানে গিয়ে চিঠি চাপাটি যা মন চায় তাই হবে।

মাণ্ডবী ও উর্মিলা ॥ আমি চাপাটি চাই,···চিঠি চাই-নে,···আমি চাপাটির দলে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মেয়ে-মহলের দেউড়ি; চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড ফটক ভেজানো রয়েছে, ফটকের গায়ে নক্সার সূর্যমুখী ফুলগুলির ঠিক মাঝে মাঝে মানানসই লোহার গুলো; কাটা দরজাটা ঈষৎ খোলা। বেত হাতে বেত্রবতী পায়চারি করছে।

বেত্রবতী ॥ (খসখসের চৌকো পাখার বাতাস খেতে খেতে) দেড় ঘটি আঁব-পোড়ার সরবৎ, আড়াই ঘটি মিছরির পানা, আর ঘড়াটাক সরযুর জল!··· উদরস্থ হ'ল কি জিবে ঠেকে উবে গেল, তা' ঠিক ধরতে পারলুম না!···কষ্ট ক'রে মুখে ঢাললুম এইটুকুই মনে আছে,···হুঁ, আর মনে আছে ঢক-ঢক বক-বক শব্দ!···উঃ আগুন!···বিধাতা-পুরুষ পবনদেবকে বরখাস্ত কোরে তার

জায়গায় অগ্নিদেবকে বাহাল করলেন নাকি!···বসন্তোৎসবের আগেই এমন দুরন্ত গরম তো জন্মে কখনো দেখিনি? ··যে দিন থেকে ঝাঁটা-কাঁটা ধূমকেতুটা উঠেছে সেইদিন থেকেই এই অগ্নিবৃষ্টি সুরু হয়েছে!···সূর্য্যি গ'লে আগুনের পানা তৈরী হচ্ছে, উঃ আগুন!

(হাতে চোখ ঢেকে উপবেশন ও তন্দ্রাবেশ)

নেপথ্যে ॥ হা-আ,···বেম্মোতলায় আগুন লেগেছে!···পায়ের তেলোয় ফোস্কা!···ম'রে গেলুম মা,···সারা হয়ে গেলুম!

[কাটা দরজার ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে তন্দ্রাবুড়ীর প্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আ-আঃ, ঠাঁইটে বেশ ঠাণ্ডা রে, অন্ধকার কিনা, শ্যাঁতা,··· একটু জিরিয়ে নিই মা, জুড়িয়ে নিই,···আহা-হা-হা কাঁকাল···দরদ··· (বেত্রবতীর স্কন্ধে উপবেশন)

বেত্রবতী ॥ (চম্‌কে উঠে) কি এ?···অ্যা···কে এ?···রাম, রাম, নেবে বস না,···ঘাড়ের উপর বসবার জায়গা?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ অ!···মা অন্ধকারে দেখতে পাইনি,···আমি বলি মোড়াটা! ···কে? অ!···মা! বেতন্ত দিদি!

বেত্রবতী ॥ আর বেতন্ত দিদি,···দুরন্ত গরমের চোটে নিতান্ত কাহিল অবস্থায় এক পাশে প'ড়ে আছি আয়ী!—বলি যাওয়া হয়েছিল কোথা?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আর কোথা?···ঐ নকৃখনের হোতায়;···খেয়ে উঠে সবে পানটি মুখে দিইছি,···সুমিত্তিরে রানীর হুকুম হ'ল···যা, রাম-নকৃখনকে নিম্মাল্যি দিয়ে আয়, দিয়ে এলুম,···যাত্রা ক'রে বেরিয়েছে, আর তো ঘর ঢুকবে না, দিয়ে এলুম,···এসে সবে গা গড়াবার গোছ করিছি, আবার ডাক পড়ল···কি সমাচার? না, হাঁতির দাঁতের গাছ-কৌটোয় ভূজ্জিপাতার লেখন আছে,···যা, রাম-নকৃখনকে দিয়ে আয়···পঞ্চাশটে দাসী রয়েছে,···তা' আর কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না,···আমাকেই নিয়ে যেতে হবে,···তা কি করব?···রাজার রানী···মুখ ফুটে বললে,···ঠেল্‌তে পারিনে।···কৌটো বার করলুম,···খুলে দেখি অ-মা দু'খানা লেখন,—কোন্‌খানা নিই—কোন্‌খানা থুই, বিষম ফাঁপর,···শুধুতে গেলুম,···তা' রানী তখন পুজোয় বসেছে,···কারে শুধুই কি করি?···তা কৌটোসুদ্ধই নিয়ে গেলুম।

বেত্রবতী ॥ তা বেশ করেছ···বুদ্ধির কাজই করেছ।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তা' আর বলতে! নইলে কি আবার টানা-পোড়েন করব নাকি···সাতমহল মাড়িয়ে?···এই রোদ্দুরে?

বেত্রবতী ॥ তা বই কি, তাতে এই বুড়ো বয়েস···

তন্দ্রাবুড়ী ॥ (গলা খাঁকার দিয়ে) না বেতন্ত দিদি, আমি বুড়ো হইনি, আমায় রোগে এমন করেছে। তা' যা বলছিলুম···তেতেপুড়ে কৌটোসুদ্ধ নকখনকে তো দিলুম,···সে আবার কৌটো খুলে দু'খানা চিঠিই রামকে দিলে ···দু'জনে বিড়বিড় ক'রে পড়লে···তারপর কি বলাবলি করলে, ক'রে ট'রে অ-মা! শেষে আমার উপর তম্বি! তা' বাছা তম্বি করলে কি হবে?··· বলে—

কোন্ হাঁড়ির কি বৃত্তান্ত।
আমি কি জানি তপ্ত পান্ত॥

তা' যা বলছিলুম, মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে, একখান লেখন কৌটোয় ভ'রে নকখন কৌটোটা ফেরত পাঠালে,···তাই নিয়ে যাচ্ছি।

বেত্রবতী ॥ তা নিয়ে যাবে বইকি,···নিয়ে যাবে না তো কি ফেলে দেবে,···গরীব লোক, গায়ের রাগ গায়েই মারতে হবে।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ ঐ গায়ের রাগ গায়ে মেরেই তো চুলগুলো সব অসময়ে শোণের নুড়ি হয়ে গেল,···তা যা বলছিলুম মা,···দোষ কল্লে সুমিত্তিরে রানী, আমি খেলুম চোখ-রাঙানি।···তোমরা রাজার রানী রাজার ঝি লেখাপড়া জানো, লেখন চিনে আমায় হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে পুজোয় বসলেই তো হ'ত,···অ্যাঁ···আবার তাও বলি বাছা,···সুমিত্তিরেরই বা অপরাধ কি?···ওর কি আর মাথার ঠিক আছে না মনের ঠিক আছে?···রাজা গেলেন দেশ ভেব্‌মনে, সঙ্গে গেলেন কে না পাটরানী কৌশল্যে,···তা যা পাটরানী, যাবে না, যাক।···আর গেলেন কে না নাটের রানী কেকই, নইলে যে তিনি গোঁসা ঘরে ঢুকবেন।···তিন রানীর মধ্যে দু'জন গেলেন রাজার সঙ্গে,···কেন, আরেক জন কি যেতে জানে না?···সুমিত্তিরে নেহাত ভালোমানুষ···মুখ ফুটে কোনো কিছুই বল্লে না, তাই যত হেনস্তা তাকে;···সে একলাটি প'ড়ে রইল; নইলে বাড়ি আগলাবে কে? বউদের সব চরাবে কে? ঘরে সন্ধ্যে দেবে

কে ?···বলি এতে কি আর মানুষের মনের ঠিক থাকে ? রাজা আমাদের বুড়ো হতে বসেছেন, কিন্তু একচোখোমি ঘুচল না।

বেত্রবতী ॥ রাজা-রাজড়ার কাণ্ড !···আমাদের ও-সব কথায় কাজ কি আয়ী।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ না, তাই বলছি,···বলি নকুখন আমার ওপর রাগ করলে কিনা।···আমি ওরে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছি,···ওর মা সুমিত্তিরে, তারে হতে দেখলুম,···মানুষ করলুম,···আমার ওপর তম্বি করলে,···তা করুক্ !

বেত্রবতী ॥ তুমি রাগ করনি তো ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তা কি পারি বেতন্ত দিদি ? ওদের অকল্যেণ হবে যে ? সুমিত্তিরের ক্ষুদ-কুঁড়ো নকুখন, শিবরাত্তিরের সোলতে, আঁধার ঘরের মানিক, ওদের দু'টিকে নিয়ে সুমিত্তিরে সংসারী হয়েছে, ওদের ওপর আমি রাগ করব ? (গালে মুখে চড়াতে চড়াতে) আরে আমার কপাল ! আরে আমার কপাল !

বেত্রবতী ॥ না, না, আমিও তো তাই বলছিলুম, তুমি কি রাগতে পার !···বলি হ্যাঁ আয়ী, তোমার গামছায় কি ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ অ-মা ! ও সেই কৌটোটা আর ক'টা কাঁচা বেল,···বড় দেউড়ির দারোয়ানেরা পাড়ছিল কিনা,···তাই—চেয়ে আনলুম···কাঁচা বেল,···পুড়িয়ে খাব।

বেত্রবতী ॥ তা' বেশ করেছ ; এখন আমাদের বেল-পোড়াই আহার, আর তামাক-পোড়াই বাহার।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ (আপন মনে) দেখলুম ঠাউরে ঠাউরে গোটাকতক বেল পেকেছে, তা'···

[নকুলিকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ পেকেছে তো পেকেছে, বেল পাকলে কাগের কি ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ কে লা ?···নকুলি বুঝি,···তুই বড় নকুলে,···তা' হ্যাঁলো, আমি কি কাগ ?

নকুলিকা ॥ ষাট্ ! তুমি কাগ হতে যাবে কেন ? তুমি হচ্ছ "কাগভুষণ্ডির কাকী, কাকাতুয়া পাখী !"···তন্দ্রা আয়ী, কই, আজকে আমায় পান দিলে না ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ ওলো আমার নাম তন্দরা নয়, তন্দরা নয়, আমার নাম চন্দরা, আকাশের চাঁদ···বুঝেছিস ?

নকুলিকা ॥ তবে যে সবাই তন্দ্রাবুড়ী বলে ?

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তা' বুঝি জানিস-নে—

(সুরে)

এই, বয়স যখন তিনকুড়ি সাত
ফোকলা দাঁতের কল্যাণে,
তখন, চন্দ্রাবলীই তন্দ্রাবুড়ী

নকুলিকা ॥ গঙ্গাপ্রাপ্তি সজ্ঞানে !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ যখন, সদাই ঢোলে দু'চক্ষু

নকুলিকা ॥ ভুঁয়ে, না গড়াতেই ঘড়র ফুঃ !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তখন, নতুন নতুন আখ্যা নিতুই
নাতনী-নাতির ব্যাখ্যানে।

নকুলিকা ॥ তা বাপু, নাতনী-নাতির দোষ কি ?···সব বয়সে মানায়, সকল বয়সে মানে হয়, তাকেই তো বলি নাম। বাপ-মায়ে সে রকম নাম রাখে না কেন ? তা রাখা হয় না ; নাম কি ? না কুসুমিকা, অরুণিকা; মদনমোহিনী। কুসুমিকা যখন বোঁটাসারিকা তখনো কুসুমিকা ! অরুণিকা যখন আম্‌সী-গালিকা তখনো অরুণিকা ! মদনমোহিনী যখন যমদূতেরও মন মোহন করতে পারেন কিনা সন্দেহ, তখনো নাম জিজ্ঞেস করলে বলতে বাধ্য হবেন সেই মদনমোহিনী !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ এত রঙ্গও জানিস্ তুই !

নকুলিকা ॥ রঙ্গ ?···কই, ঠোঁটে একটুও রঙ নেই,···তুমি পান দিলে না, তন্দ্রাবুড়ী !

কুরঙ্গিকা ॥ খবরদার আয়ী ! ওকে দিয়ো না, তোমায় বুড়ী বলেছে।

নকুলিকা ॥ থুড়ি, তন্দ্রাবুড়ী নয়, তন্দ্রা আয়ী,···না, না, চন্দ্রা আয়ী,··· এইবার দাও।

তন্দ্রাবুড়ী ॥ তুই সেই পানের গানটা বল্, নইলে দেব না।

নকুলিকা ॥ তুমি দাও আগে···

তন্দ্রাবুড়ি ॥ তুমি গাও আগে···

নকুলিকা ॥ (হাত পাতিয়া) আচ্ছা ডান হাত বাঁ হাত···

কুরঙ্গিকা ॥ আচ্ছা, আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি ; তুমি তান ছাড়, আর তুমি পান ছাড়, হাঁ !···এইবার বিচারকের বেতন···হাঁ !

নকুলিকা ॥ (পানের খিলি হাতে নিয়ে)

(গান)

পাহাড়ে ছিল এলাচ, লঙ্গ পার-ঘাটে !
কুরঙ্গিকা ॥ লালচে রাঙা ঠোঁটের জুটল এক হাটে !
নকুলিকা ॥ ছিল যে চুন ভাঁটিতে,—
কুরঙ্গিকা ॥ খয়েরের বাগানটিতে,—
উভয়ে ॥ সুপারির সঙ্গে তারাও ফন্দী কি আঁটে !
নকুলিকা ॥ মিলে শেষ পান-খিলিতে,—
কুরঙ্গিকা ॥ রূপসীর বালাই নিতে,—
উভয়ে ॥ লিখে দেয় রঙীন লেখা হাসির কপাটে !
নকুলিকা ॥ মধুরে মধুর ক'রে
কুরঙ্গিকা ॥ সুবাসে দেয় রে ভ'রে
উভয়ে ॥ মিঠে-ঝাল কি মন্তরে নাচায় একনাটে !

কুরঙ্গিকা ॥ তুই যাবি, না, আয়ীর সঙ্গে সারাদিন রঙ্গ করবি ?···বেলা গড়িয়ে গেল···এর পর গেলে কুমারদের সঙ্গে দেখাও হবে না,···চিঠিও দেওয়া হবে না।···তিন দেউড়ি পার হয়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

নকুলিকা ॥ রোস না ভাই, একটু জিরোই,···আমার বড্ড গা চিসচিস করছে।

কুরঙ্গিকা ॥ অ ! বটে ! আমারও বড্ড হাত নিসপিস করছে। (কিল)

নকুলিকা ॥ যা না,···দেখ, রাগালে কিন্তু এখ্খুনি গালাগালি করব···

কুরঙ্গিকা ॥ গালাগালি ?···কি রকম গালাগালি ভাই !···যেমন হাতে হাতে হাতাহাতি, চুলে চুলে চুলোচুলি, গলায় গলায় গলাগলি,···তেমনি ধারা নাকি ?

নকুলিকা ॥ হুঁ হু !

কুরঙ্গিকা ॥ না, না,…খবরদার !…চালতার মতন গাল তোর,… খবরদার !

নকুলিকা ॥ তা' বই কি !

কুরঙ্গিকা ॥ খবরদার ! চালতা আমি মোটে ভালোবাসি না,…চালতার অম্বল অবধি ছুঁই না ;…খবরদার…চালতা গালে গালাগালি কোরো না, কিন্তু…ভালো হবে না, বলছি ; এই খবরদার, এই !…খবরদার ! এই…

[প্রস্থান

নকুলিকা ॥ (যেতে যেতে) বেত্রবতী ! আমাদের দেউড়িগুলো পার ক'রে দিয়ে যাও, আমরা রাজকুমারদের চিঠি দিতে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

বেত্রবতী ॥ নাঃ, আবার এই রোদ্দুরে ভোগালে।

[প্রস্থান

তন্দ্রাবুড়ী ॥ (গামছায় জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে) যাই আমিও যাই, একলাটি হেতায় কি করব।

[প্রস্থান

নেপথ্যে। আরে দূর,…আরে ছেই,…আরে দূর,…কোন্ দিক সামলাই,… দূর হ', দূর হ', দূর হ',…ঐ যাঃ !

[তন্দ্রাবুড়ীর পুনঃপ্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, মাথা খেলে আমার !…অ বাপু কিষ্কিন্ধেবাসী, অ হনুমান্ !…ও গাছ-মোণ্ডা নয়…ও হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটো…ও খাওয়া যায় না রে, খাওয়া যায় না,…দিয়ে যা,…কি আপদেই পড়লুম গা,…অ বেতস্ত দিদি !…মুখপোড়া বেল নিলে না, আমার মাথা খেতে কৌটো নিয়ে পালালো,…দিয়ে যা রে দিয়ে যা…বলি, অ হনুমান্ ..অ কিচকিন্ধে !…অ মুখপোড়া !

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[হাওয়া-মঞ্জিল, চারিদিকে শ্বেতপাথরের জালি ; একদিকে একটা মস্ত মালতী লতার গাছ লতিয়ে উঠে চাঁদোয়া রচনা করেছে। ছোটো মাটির কুণ্ডায় জুঁই ফুলের গাছ। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর সীতা, উর্মিলা ও মাণ্ডবী উপবিষ্টা, কাছে বিহঙ্গিকা।]

(গান)

বিহঙ্গিকা ॥ কুঁড়ি ওই পাখনা মেলে !—
পাপড়ি ব'লে ভুল করো না !
দেছে ভর্ পাখায় ভ্রমর,
তাই বুঝি ফুল উদাস-মনা !
বাঁধা যে আছে বোঁটায়,—
ভুলে যায়,—পরান লোটায় ;—
কেঁদে কয় বন্ধু ! আমায়
শেখাও দূরের আনাগোনা।
মিনতি হ'ল মিছে, চায় না পিছে, ভ্রমর মোটে,
করে ফুল আথাল্-পাথাল্ উতল হাওয়ায় মাথা কোটে !
খুলে যায় বোঁটার বাঁধন,—
বুঝি বা ঘুচল কাঁদন ;
না রে না,—হর্ষে বিষাদ,—
ধূলায় লোটায় চাঁদের কোণা

সীতা ॥ ফুলের দুঃখু তার সঙ্গী চ'লে গেল, সে সঙ্গে যেতে পেলে না, বেচারী সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হ'ল।…ভোমরা কি ভাবলে তা ভোমরাই জানে।… যারা দূরে যায় তারা পুরোনো হারিয়ে নতুন পায়।…কত নতুন ফুলের সৌরভ,…কত নতুন পাখীর কাকলি…কত নতুন চোখের বিদ্যুৎ…তাদের মন হরণ করবার জন্যে…বিজন বনেও মায়াপুরী নির্মাণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু, যারা চোখের জল সম্বল ক'রে পিছনে প'ড়ে রইল,…ম্লান হাসি হেসে, আপনার জনকে বিদায় দিয়ে, আঁধার মুখে ঘরের অন্ধকার কোণে ফিরে এল, তাদের সব শূন্য, সব খালি, সব ফাঁকা ! সেই পুরোনো ঘর-দুয়ার, সেই পুরোনো সাজ-সরঞ্জাম, সেই সমস্ত !…নতুনের মধ্যে ?…ভরা ঘরের মাঝখানে—দুর্ভর

ব্যাকুলতা, ঘরভরা কান্না,…বুকভরা হাহাকার!…চেনা মুখের হাসি চাইলেও দেখতে পাওয়া যায় না, স্মরণের সোনার কৌটোয় সাত রাজার ধন মানিক হয়ে বিরাজ করে।

উর্মিলা॥ দিদি!

সীতা॥ (আকাশের দিকে চেয়ে, অন্যমনস্কভাবে) পূবদিকের সাদা মেঘগুলো সোনার বর্ণ হয়ে উঠেছে,…আজ কি পূর্ণিমা?

উর্মিলা॥ আজ তো নয়…কাল…

সীতা॥ এটা না মধু-পূর্ণিমা?

উর্মিলা॥ হ্যাঁ, মধু-পূর্ণিমা…বসন্তোৎসব।

সীতা॥ এবার বসন্তোৎসব নিরানন্দে কাটাতে হবে,…এবার নিরুৎসব।

মাণ্ডবী॥ এটা কি এঁদের ভালো হ'ল?…শ্রুতিকে তখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি নানা রকমে বঞ্চিত হচ্ছি…চারিদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

উর্মিলা॥ এখন মনে হচ্ছে, শ্রুতি কিচ্ছু অন্যায় করেনি, ঠিকই করেছে…

সীতা॥ দেখো চিঠির কি জবাব আসে…

বিহঙ্গিকা॥ ঐ দেখো…ঐ…ধূমকেতু উদয় হয়েছে।…

মাণ্ডবী। কি প্রকাণ্ড ওর পুচ্ছ!…পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল,…চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

উর্মিলা॥ ওটা ধূমকেতু না কালকেতু…

বিহঙ্গিকা॥ না কপালকেতু?

মাণ্ডবী॥ শুনেছি, ওটার নাম তামসকীলক, আমাদের কপালে কালকেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উর্মিলা॥ কালও যেখানে উঠেছিল আজও ঠিক সেইখানে।…আজ চোদ্দ দিন ধ'রে ঐ একটা জায়গাতেই উদয় হচ্ছে।

মাণ্ডবী॥ শুনেছি নাকি ওটা যে দেশে যে ক'দিন দেখা যায়, সে দেশে তত বৎসর অমঙ্গল।

সীতা॥ অমঙ্গলের আর বাকী কি?…এরি মধ্যে তো মনের ভিতর সব গোলমাল সেঁধিয়েছে…সব যেন কেমন…

মাণ্ডবী ॥ আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হ'য়ে পড়ছে!

বিহঙ্গিকা ॥ তবু মহারাজ দস্তুরমত স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন।

মাণ্ডবী ॥ (অন্যমনস্কভাবে) তাই তো! নকুলিকার হ'ল কি? এখনো ফিরল না! কুরঙ্গিকাই বা কি করলে?

ঊর্মিলা ॥ কি জানি?…শ্রুতি তো ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে…

সীতা ॥ বিহঙ্গিকা দেখ্ তো এগিয়ে…নকুলিকা, কুরঙ্গিকা কেউ ফিরল কিনা?

[নকুলিকা, কুরঙ্গিকা ও শ্রুতকীর্তির প্রবেশ]

কুরঙ্গিকা ॥ ফিরেছি—জবাব এনেছি—চার-চারখানা জবাব এনেছি—শিরোপা চাই—পুরস্কার,—

নকুলিকা ॥ হুঁ,—শিরোপা চাই—

কুরঙ্গিকা ॥ তোর কিসের শিরোপা, র‍্যা?…তুই তো যেতে চাসনি…বলেছিলি জবাব দেবে না,…তারপর তন্দ্রাবুড়ীর ওখানে ফষ্টিনষ্টি ক'রে দেড়ঘণ্টা কাটালি,…শিরোপা দেবে না গলায় পা দেবে।

নকুলিকা ॥ দেখ, তুই কুরঙ্গিকা না ভুজঙ্গিকা?

কুরঙ্গিকা ॥ কেন বল্ তো…

বিহঙ্গিকা ॥ নইলে, নকুলিকার সঙ্গে অত লাগিস কেন?—ঠিক যেন সাপে-নেউলে—

নকুলিকা ॥ বল্ তো ভাই, বল্ তো…

শ্রুতকীর্তি ॥ নে, নে,…চিঠি দে…

নকুলিকা ॥ আগে বকশিশ…

(গান)

(আমায়) ক'রে চাপরাসী চিঠি রাশি রাশি
পাঠালে! হাঁটালে! খাটালে!

শ্রুতকীর্তি ॥ তাই বুঝি সারা বেলাটা বেবাক
বাহির-মহলে কাটালে?

নকুলিকা ॥ সে কসুর মোটে নয় আমাদেরি,
জবাব পেতে যে হয়ে গেল দেরি,

শ্রুতকীর্তি ॥ দে, দে, চিঠি, দেখি—

নকুলিকা ॥ —বকশিশ ?

শ্রুতকীর্তি ॥ —দেখ্—

ভাল হবে নাকো ঘাঁটালে, আমায় ঘাঁটালে।

নকুলিকা ॥ বেশী নাহি চাই কোরোনাকো কোপ,

পাগড়ি নাগরা দাড়ি আর গোঁফ,

(চাপরাশ চাপদাড়ি আর গোঁফ)

কুরঙ্গিকা ॥ চোপ চোপ, নিজে সব নিবি বুঝি ?……

ধর্মে সবে না ছাঁটালে, আমায় ছাঁটালে।

নকুলিকা ॥ গোঁফ নেই গোঁফে তেল দিবি কিরে ?…

ভারী লোভ দেখি কাঁটালে, গাছের কাঁটালে ॥

মাণ্ডবী ॥ আচ্ছা, পাগড়ি, নাগরা আমি দেব এখন,…আমায় দে…

(কুরঙ্গিকার তথাকরণ)

উর্মিলা ॥ চিঠি সব পড়বে কে…

মাণ্ডবী ॥ দিদি যাকে বলবে…

সীতা ॥ যে বড় সেই পড়বে…আমায় দাও…(পাঠ)

উর্মিলা,

তোমার আজকের পত্রের বচন-বিন্যাস মোটেই উর্মিমালার কলধ্বনির মতন নয়, এ একেবারে তরঙ্গভঙ্গ। সে যা' হোক্, আমরা চার ভাই-এ কোথায় যাচ্ছি তা' তোমায় বলতে পারলুম না, কেন যাচ্ছি তাও না। তুমি জানো কারো কাছে জবাবদিহি করা আমার স্বভাব নয়। এতে যদি অভিমান কর নাচার। ইতি—লক্ষ্মণ

উর্মিলা ॥ (অধোবদনে রইলেন)

শ্রুতকীর্তি ॥ (অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) উঃ!

সীতা ॥ (আর একখানা খুলে) এ খানা দেখছি আমার। (নীরবে পাঠ)

মাণ্ডবী ॥ কই ?…পড়!

সীতা ॥ কী আর পড়ব…ঐ একই কথা,…(আর একখানা খুলে পাঠ)

মাণ্ডবী,

তোমার চিঠি কোথায় 'মম শিরসি মণ্ডনম্' হবে,…তা না হয়ে একেবারে কোদণ্ড-টঙ্কার!…একেবারে যুদ্ধং দেহি!…চিঠিতে তোমার এই চণ্ডীমূর্তি দেখে, হে কোপনে! সত্যই আমাকে একটু গণ্ডগোলে পড়তে হয়েছে। কোথায় যাচ্ছি সে কথাটা তোমার কাছে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছ যে সজ্ঞানে সরযূ-লাভ হলেও এই আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করবে না! কি আশ্চর্য! তোমার মত প্রজ্ঞাবতী নারীর কি এই বিচার? ভালো, আমি…থুড়ি…আমরাও প্রতিজ্ঞা করছি, যে তোমরা না আহ্বান করলে আর ওমুখো হব না, এমন কি নগরেও ফিরব না; যে দিকে দুই চক্ষু যায়, আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে সেই পথেরই পথিক হব। অভিমান নামক সামগ্রীটি কেবল ভামিনী কুলেরই একচেটে নয়। ইতি—তোমার হতভম্ব ভর্তা—ভরত বর্মা

উর্মিলা॥ (মাণ্ডবীর মুখের দিকে চাইলেন।)

মাণ্ডবী॥ (গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন কি নিজের গালে নিজে চিমটি কেটে বিদ্রোহী হাসিটার বেয়াদবীর দণ্ডবিধান করলেন তা' ঠিক বুঝতে পারা গেল না।)

শ্রুতকীর্তি॥ (দাঁড়িয়ে উঠে। আবার ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে দুই হাতের মুঠো শক্ত ক'রে বসে পড়লেন।)

সীতা॥ শ্রুতি! এইবার তোর চিঠি,…(পাঠ)

শ্রুতকীর্তি,

তোমার আবার এ কি নূতন কীর্তি! দস্তুরমত নারীবিদ্রোহ পাকিয়ে তুলেছ দেখছি। তোমরা চারজনে একজোট হয়ে আমাদের চার ভাইকে দমিয়ে দেবে ভেবেছ? সেটি হচ্ছে না, আমরাও চারজনে এককাট্টা হলুম, জানবে। দেখি কারা হারে আর কারা জেতে। বিদায়ের আগে শুধু এইটুকু ব'লে রাখছি, যে তোমরা বিধিমতে সাধ্য-সাধনা না করলে সাধের অযোধ্যায় আর পদার্পণ করছি নি। ইতি—তোমার শত্রুঘ্ন—শত্রু

পুনশ্চ :—লিখেছ কথা না রাখলে আর চিঠি লিখবে না, এই তোমার প্রতিজ্ঞা। ভালো, আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাই নে। তবে স্বামীর কর্তব্য আমায় করতেই হবে। যদি কোনোদিন স্মরণ করবার আবশ্যক হয় তবে এইসঙ্গে যে অঙ্গুরী পাঠালুম, সেইটি পাঠিয়ে দিও। ইতি শ—

মাণ্ডবী ॥ তা' হলে ঠিকানা দিয়েছে।

সীতা ॥ কই না। (চিঠি উল্টেপাল্টে দেখলেন)

মাণ্ডবী ॥ কোথায় পাঠাতে হবে বলেনি ?···নকুলিকা !

নকুলিকা ॥ কই সে কথা আমাদের কিছু বলেন নি।

শ্রুতকীর্তি ॥ তা' বলতে যাবে কেন ?···আশা জাগিয়ে নিরাশ ক'রে অপমানের উপর অপমান করবার ও আর-একটা ফন্দী।

মাণ্ডবী ॥ দেখলে দিদি, চিঠির সব ছিরি দেখলে ?

উর্মিলা ॥ কি হবে, দিদি ?···অযোধ্যা যোদ্ধাশূন্য হয়ে রইল ; কি হবে ?

মাণ্ডবী ॥ কি আবার হবে,···ওঁরা নইলে সত্যিই কি অযোধ্যা অরণ্য হবে···

উর্মিলা ॥ আমাদের পক্ষে হবে বই কি···

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না, তুমি অমন দমে যেয়ো না···দমে গেলে চল্‌বে না··· আমাদের অভিমানের অপমান করেছে···আমাদের বিদ্রোহী বলেছে,···বেশ··· আমরা বিদ্রোহই ঘোষণা করলুম।

মাণ্ডবী ॥ আমরা রোগে পড়ি, মরে যাই,···কোনো খবর দেব না।

শ্রুতকীর্তি ॥ বিপদ হোক আপদ হোক···কোনো খবর দেব না,···কোশল দুর্গ শত্রু এসে ঘেরাও করলেও না।

সীতা ॥ ভগবান করুন, তেমন দিন যেন না হয়।

শ্রুতকীর্তি ॥ যদি হয়, মেয়েরাই এ দুর্গ রক্ষা করবে, পুরুষের শরণাপন্ন হবে না। জয় হয় ভালোই···হেরে যাই অগ্নিদেব আছেন।

সীতা ॥ শ্রুতি, তুই কি বকছিস ?···

মাণ্ডবী ॥ সব তাতেই কি বাড়াবাড়ি ?

শ্রুতকীর্তি ॥ না, দিদি, বাড়াবাড়ি নয়,···যারা অকারণে আমাদের মনে

আঘাত দিতে পারে, তাদের করুণা ভিক্ষা ভিন্ন, সত্যিই কি আমাদের কোনো উপায় নেই ?…তুমি দেখো, আমি দেখিয়ে দেব খুব উপায় আছে !…যারা অভিমানের মান রাখতে জানে না, তাদের পায়ে না ধরলে দিন চলবে না ?… খুব চলবে।…ছোটো ছোটো কাজের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দেব,…খুব চলবে। আজ থেকে আমার মহলের সমস্ত কাজ…সমস্ত কাজের ব্যবস্থা আমি মেয়েদের দিয়ে করাব। আর তাদের সবাইকে ব'লে দেব, যেন কোনো কাজে কোনো পুরুষের কোনো সাহায্য না নেওয়া হয়।

নকুলিকা ॥ তা'হলে তোমার মহলে সন্ধ্যা-সকালে সানাই বাজবে না ?

শ্রুতকীর্তি ॥ যদি মেয়ে বাজনদার পাওয়া যায় বাজবে…

নকুলিকা ॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ বাজবে না।

নকুলিকা ॥ হাঁড়ি চড়বে না ?

শ্রুতকীর্তি ॥ যদি মেয়ে-সূপকার পাওয়া যায় চড়বে…

নকুলিকা ॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ চড়বে না।

নকুলিকা ॥ তোমার শখের বাগানে গাছপালায় জল পড়বে না ?

শ্রুতকীর্তি ॥ যদি মেয়ে উদ্যান-পাল পাওয়া যায় পড়বে…

নকুলিকা ॥ নইলে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ পড়বে না।

নকুলিকা ॥ তা' হলে আর এক পা এগিয়ে গাছগুলি সব কেটে বাগানে শুধু লতা রাখলেই তো ভালো হয়। ব্যাকরণে বলেছে গাছগুলো সব পুরুষ…

শ্রুতকীর্তি ॥ হাসি নয়,—তাই হবে ; আমার বাগানের লতাদের আর গাছের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখব না। যা বলেছি তা' করব, যতদূর চালানো যায়, চালাব ; শেষ না দেখে ছাড়ব না।

ঊর্মিলা ॥ মনে থাকে যেন কাল মদন-মহোৎসব…কন্দর্প-মন্দিরে যাবি নে তো ?…কন্দর্প পুরুষ-দেবতা।

শ্রুতকীর্তি ॥ যাই-না-যাই দেখতেই পাবে—

মাণ্ডবী ॥ হ্যাঁ, যখন বিদ্রোহী বলেছে তখন বিদ্রোহ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেওয়া চাই।

নেপথ্যে ॥ স'রে যাও!···স'রে যাও!···হাওয়া-মঞ্জিলে হনুমান পড়েছে!··· সাবধান! স'রে যাও!

উর্মিলা ॥ (সভয়ে) স'রে এস দিদি, স'রে এস!

সীতা ॥ চল্ ভিতরে যাই।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্রুতকীর্তির মহল-সংলগ্ন 'শ্যামল-আরাম' নামক পুষ্পবাটিকা ; মাঝে মাঝে ইট-বাঁধানো পথ : পথের ইটগুলি কতকটা মৎস্যপঞ্জরের ছাঁদে সাজানো, মাঝে মাঝে আবার স্বস্তিকের ছাঁদে বসানো হয়েছে। স্বস্তিকের মাঝ থেকে কোথাও ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারা ছুটেছে, কোথাও রজনীগন্ধার পুষ্প-দণ্ড উঠেছে। ঝিলে—পদ্মবন, পদ্মবনের মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের পদ্মকলি। দূরে প্রাচীরের ধারে ধারে অশোক, বকুল, চাঁপা, নাগকেশর ও মুচুকুন্দের গাছ। তার কোলে গন্ধরাজ, টগর, রঙন, জুঁই, চামেলি প্রভৃতি। একটা ফুলকারি পাথরের বেদীর উপর একরাশ কৃষ্ণচূড়ার ফুল। নিপুণিকা, কপোতিকা, মুকুলিকা প্রভৃতি তরুণীর দল একটা বকুলগাছের ডালে দোলা বাঁধতে ব্যস্ত।]

তরুণীর দল ॥ (গান)

চারি চক্ষে যে চেনাচিনি, অয়ি কিশোরী !
তারে, জীয়াইয়ে রেখ মিনতি করি !
তোরি তরে ঝরোকারে রেখেছে রে খোলা !
সাড়া দাও, পায়জোরে আওয়াজে ভরি' !
তোরি তরে তরু 'পরে বেঁধেছে রে দোলা !
দুলে যাও, ভুলে চ'লে এস ভ্রমরী !
তোরি তরে সরোবরে ফুটায়েছে ফুল রে !
তুলে নাও, কোনো ছলে পথ বিসরি' !
তোরি তরে অন্তরে জুটায়েছে ভুল রে !
যদি চাও দাও ভেঙে সে ভুল ওরি !

মুকুলিকা ॥ কি সুন্দর, ভাই, দেখ, কি চমৎকার।

সকলে ॥ কি ? ভাই, কি ?

মুকুলিকা ॥ দেখে যা, দেখে যা, ফুলের ফোটা দেখে যা, সন্ধ্যামণির বন্ধ করা পাপড়ি দেখতে দেখতে খুলে যাচ্ছে !

সকলে ॥ ওরে আয় আয়, ফুলের ফোটা দেখবি আয় !

(গান)

'ফুলের ফোটা দেখবি কে !'
সাঁঝের পরী যায় ডেকে ।
যেই ইশারায় ঈষৎ শশী
হাস্‌ল নীলাকাশ থেকে !
সাঁঝের পরী যায় ডেকে !
আবছা আলোয় উস্‌খুসিয়ে
রসের বেদন উস্‌কে দিয়ে
বাতাস বিভোল,—কুঁড়ির প্রথম
পাপড়ি খোলার হাই লেগে ।
ঝুমকো-লতার ঝুরির ডোরায়
অবাক ঝিঁঝি ঝিমিয়ে চায় !
নয় যে কুঁড়ি নয় যে কুসুম
নিঝুম হয়ে দেখছে তায় !
পাপিয়া কোকিল উঠছে গেয়ে
ফুল-ফোয়ারার ছন্দ পেয়ে,
বলছে জোনাক আলোর বুলি
ভালোবাসার বোল্ ঢেকে ।

কপোতিকা ॥ সন্ধ্যা হয়ে এল, বা রে ! মালিনী কই ?

নিপুণিকা ॥ আমার ফুলের চোলিটার কি কল্লে কে জানে !

মুকুলিকা ॥ ভারী মজার লোক, যা হোক···

কপোতিকা ॥ কাল উৎসব, আজ কি আর তার মরবার ফুরসুত আছে ?

নেপথ্যে ॥ (গান)

খাস বাগানের ঠাস গোলাপে রাশ ক'রে !
বেঁধেছি পরিপাটি এই তোড়াটি বসন্তে উদাস ক'রে !

নিপুণিকা ॥ মরবে কি ?—অনেক কাল বাঁচবে—ঐ যে তার গলা পাচ্ছিস নি ?

[মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী ॥ (গান)

খাস-বাগানের ঠাস গোলাপে রাশ ক'রে !
বেঁধেছি পরিপাটি এই তোড়াটি মৌমাছি নিরাশ ক'রে।
এনেছি জুঁয়ের গোড়ে যত্নে গ'ড়ে
ফুলের তোড়ে মন্ত্রে বেঁধে,
এনেছি ফুলের চোলি কলি কলি
বেল-চামেলি ছন্দে গেঁথে,
গড়েছি ফুলের পাখা ফুল-পতাকা
মালঞ্চ উদাস ক'রে !
কেড়েছি পঞ্চশরের সব ক'টি শর
কিশোর হাসির দাস ক'রে !

কপোতিকা মালিনী, অ মালিনী !

নিপুণিকা ॥ ফুলের চোলি ? এনেছ তো—

মালিনী ॥ এনেছি বই কি, সব এনেছি···শুধু ফুলের চোলি ?—হুঁঃ ! কত রকম ফুলের গয়না এনেছি, তা তো দেখনি···আজ বসন্তোৎসবের সনযুৎ···এই আজ আর কাল···এই দু'দিন সোনার গয়না গায়ে ঠেকাতেই নেই, তা বুঝি জান না ?···

(গান)

আজ, ফাগুন-দিনে ফুল গহনা
সোনা না-মঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর !
ফুলের কাঁকন ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতন-চূড়
ফুলের নূপুর বাজবে নীরব
সৌরভে ভরপুর !

সকলে ॥ আমি নেব···ফুলের গয়না···আমি কিনব···

নিপুণিকা ॥ ক' স্যুট আছে ? কুলোবে তো ?

মুকুলিকা ॥ বেশ হ'ল ভাই আর স্যাকরার খোশামোদ করতে হবে না।

(গান)

সকলে ॥ আমরা, ডাকব না আর ডাকরাকে—
স্যাকরাকে !
আমাদের, গয়না হবে নিত্যি-নতুন
মালঞ্চে হাজার শাখে।
ওরা দেয়নাকো পান, দেয়নাকো বানি,
শুধু, দিয়েই খুশি প্রত্যাশী নয়, জানি খুব জানি ;
আর রইল না ভয় চোর-ডাকাতের
সোনায় যারা টাঁক রাখে !

নিপুণিকা ॥ তোর মালঞ্চ-স্যুটের গয়না কত ক'রে পড়বে, ভাই,···কি দিতে হবে ?

মালিনী ॥ তাড়াতাড়ি কি, তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না,···যা হয় দিয়ো না তখন,···রাজার মালঞ্চের ফুল, তার তো আর দাম লাগবে না,···আমার মজুরি,···যা হয় দিয়ো।

নিপুণিকা ॥ আমায় ফুলের চোলিটা ?···ওটার জন্যে কি দিতে হবে ?

(গান)

তরুণীর দল ॥ চামেলির এই কাঁচলি বেচবি কি দরে ?

মালিনী ॥ বুনেছি সোহাগ দিয়ে বেচব আদরে !

তরুণীর দল ॥ কি জিনিস চাস মালিনী ?

মালিনী ॥ সোহাগের সর খালি নিই !
নয়নের নিই আরতি ফুল্ল অধরে !

তরুণীর দল ॥ না, না, ভাই ঠিক বল না,

মালিনী ॥ তবে চাই কানের সোনা,
দরদী দর করো না কিন্‌তে সুন্দরে।

[ফুল নিয়ে তরুণীদের প্রস্থান

[শ্রুতকীর্তি ও নকুলিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ মালিনী! উদ্যান-পালিকে! দাঁড়াও! দাঁড়াও!

শ্রুতকীর্তি ॥ মালিনী! এদিকে এস!···শোনো,···আমার মহলে আমি পুরুষের সংস্রব রাখতে চাই নে···তুমি বাগানের সব কাজ করতে পারবে?

মালিনী ॥ (বিস্মিতভাবে) সব কাজ?

শ্রুতকীর্তি ॥ হ্যাঁ···সমস্ত কাজ,···ঘাস নিড়ানো, মাটি কোদলানো, কলম বাঁধা, সার দেওয়া···

নকুলিকা ॥ দরকার হলে গাছে ওঠা, ডাল ঝুড়ে দেওয়া, জঙ্গল কেটে ফেলা···

মালিনী ॥ কেন, মালী?

শ্রুতকীর্তি ॥ বল্লুম পুরুষের সংস্রব রাখব না···মালী ছাড়িয়ে দেওয়া হবে···

মালিনী ॥ গাছে উঠতে হবে?···গাছ কাটতে হবে?···

শ্রুতকীর্তি ॥ হাঁ, হবে···কতবার বলব—

মালিনী ॥ তা···আচ্ছা···আপনি যখন বলছেন···তখন যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখব,···তা সম্প্রতি কি করতে হবে?

শ্রুতকীর্তি ॥ সম্প্রতি বাগান থেকে সমস্ত গাছ কেটে উড়িয়ে দিতে হবে;···অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বৃক্ষ বলা যেতে পারে সেই সব গাছ কেটে ফেলতে হবে,···লতা গাছ কাটতে হবে না।

মালিনী ॥ বাগানে ঘোড়দৌড় হবে বুঝি?

নকুলিকা ॥ না, না, ঘোড়দৌড় হবে কেন···বুঝতে পারলে না, লতা গাছ মেয়ে জাতের গাছ কিনা, তাই ওদের কাটা হবে না, বাকী সব পুরুষ গাছ··· তাই সেগুলো সব বাগানের বার ক'রে দেওয়া হবে···তা সহজে তো বার করা যাবে না···তাই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে···কেটে উড়িয়ে দিতে হবে!

মালিনী ॥ (ঈষৎ একটু ঘোমটা টেনে) গাছ পুরুষ মানুষ? কি ক'রে জানলেন?

নকুলিকা ॥ ব্যাকরণ ব'লে এক শাস্তর আছে,···সেই শাস্তরে সব লেখা আছে···

মালিনী ॥ (প্রণাম ক'রে) শাস্তরে বলেছে ?···তা'হলে কাটতে হবে বই কি !···তা' এক কাজ করলে হয় না,···কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে হয় না··· মালীদের তো তাড়িয়ে দেবেন, তা মালীদের দিয়ে গাছগুলো কাটিয়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেই তো সকল দিকে সুবিধে হয়।

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না,···যা বলছি তাই কর।

মালিনী ॥ যে আজ্ঞা, তাই করব।···আচ্ছা, যে সব গাছের সঙ্গে লতাগুলো জড়িয়ে গেছে সে গাছগুলো কি বাদ রাখা যাবে !

শ্রুতকীর্তি ॥ লতার পাকগুলো আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে, তারপর কোপ লাগাবে।

মালিনী ॥ লতাগুলোতে বাঁশের ঠেক্‌নো দিতে পারি ?

নকুলিকা ॥ বাঁশ মেয়ে না পুরুষ ?···আচ্ছা, ব্যাকরণ দেখে পরে ব'লে পাঠাব,···এখন যেতে পার।

মালিনী ॥ (যেতে যেতে ফিরে এসে) কাল মদন-মহোৎসব, কালকের দিনে অশোক বকুল চাঁপা গাছগুলো সব কাটব ? না, কাল বাদে পরশু কাটলে চলবে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ না, কালই কাজ শুরু করা চাই, যাও।

মালিনী ॥ যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

শ্রুতকীর্তি ॥ নকুলিকা,···বধূনাট্যের দলে খবর পাঠানো হয়েছে ?

নকুলিকা ॥ হয়েছে···সন্ধ্যেবেলায় নৃত্যশালায় আসতে ব'লে দিইছি।··· কি পালা হবে তা তো ব'লে দেওয়া হ'ল না।

শ্রুতকীর্তি ॥ সে হবে এখন।

নেপথ্যে ॥ (গান)

তোমারে মারলে কে কোন্ বাণে হায় রে
ও বনের পায়রা মোর !

শ্রুতকীর্তি ॥ নকুলিকা ! কে গান গায় ? দেখ্ তো !

নকুলিকা ॥ (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে) ও একটা পাখ্‌মারাদের মেয়ে··· এই দিকেই আসছে···ঐ যে কুরঙ্গিকা ওর সঙ্গে···এই দিকেই আসছে।

[একজন শবরী ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ]

শবরী ॥ (গান)

তোমারে, মারলে কে ? কোন্ বাণে ? হায় রে !
ও বনের পায়রা মোর !
হায় ! হায় !
বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !
জনমের সাথী গো এ তো নয় রাতি !
কেন এই ঘুমের ঘোর !
হায় ! হায় !
বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !
কাকলি করব যে ঝরনার বোল ধরব
মিলায়ে পাখ্না পাখায় !
হায় ! হায় !
সঙ্গী ! আমার মেল আঁখি !
কেবলি, ডাকছি আর, চক্ষের জল মাখছি,
বাতাসে হুতাশ জাগায় !
হায় ! হায় !
বন্ধু ! আমার মেল আঁখি !

শ্রুতকীর্তি ॥ এ কে রে কুরঙ্গিকা !···কোথায় পেলি একে ?

কুরঙ্গিকা ॥ পাখী বেচতে এসেছে···দেউড়িতে বেত্রবতী আটকেছিল··· আমি অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে এলুম।

শবরী ॥ পাখী নেবে গা রানী ? পাখী ?

(কুরঙ্গিকা ও নকুলিকার পরস্পরে কানে কানে কথা)

শ্রুতকীর্তি ॥ কি পাখী ?···দেখি !···পায়রা ?···পায়রা কি হবে ? রাজপুরীতে পায়রার অভাব কি ?

শবরী ॥ এ পায়রার অনেক গুণ !

শ্রুতকীর্তি ॥ কি গুণ ?···চিঠি নিয়ে যেতে পারে ?···সে রকম পায়রাও এখানে ঢের আছে।

শবরী ॥ উঁহু···এ জুড়ি-ভাঙা পায়রা, জুড়িদারের কাছে চিঠি নিয়ে যায়,···যাকে মনে ক'রে চিঠি ছাড়্‌বে···তারি হাতে পৌঁছে দেবে।

শ্রুতকীর্তি ॥ বটে ?···বটে ?···এ পায়রা তুই কোথায় পেলি শবরী ?

শবরী ॥ আমাদের সর্দারের যে সর্দার তার কাছে পেয়েছি। তার নাম দুষমন-কাটারি।

কুরঙ্গিকা ॥ (চোখ টিপে মানা করলে) অত নাম-ধামের দরকার কি আমাদের···কি দাম চাস্ ? তাই বল না।

শবরী ॥ এই পায়রার ওজনে সোনা চাই।···সর্দার-রাজা ব'লে দিয়েছে··· তার কমে বেচতে মানা আছে···

শ্রুতকীর্তি ॥ আচ্ছা, তাই হবে,···নকুলিকা, পায়রার ওজনে যত সোনা হয় দিয়ে দিস। (প্রস্থানোদ্যত)

শবরী ॥ বাস ?···হয়ে গেল সওদা ?···আর কিছু চাই নে ? ···আমার ঘরে অনেক রকম জানোয়ার আছে···

শ্রুতকীর্তি ॥ (একটু ভেবে) আচ্ছা, আপাতত একটা মেয়ে-কোকিল, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-হরিণ এনে দিস্।

নকুলিকা ॥ কেন ?···তোমার হরিণ, ময়ূর সব কি হ'ল ?

শ্রুতকীর্তি ॥ কি আর হবে ?···তাড়িয়ে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি,··· পুরুষ-জন্তু পুষব না,···ওদের হৃদয় নেই।

নকুলিকা ॥ অ !···বুঝেছি···তা দেখ শবরী, তুই রানীজীর জন্যে একটা মেয়ে-হরিণ, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-কোকিল নিয়ে আসবি,··· বুঝেছিস্ তো ?

শবরী ॥ বুঝেছি।

শ্রুতকীর্তি ॥ নকুলিকা, তোর কিছু ফরমাস থাকে তো, অমনি বলে দে, মেয়ে-জন্তু হওয়া চাই কিন্তু,···আমি চললুম।

[প্রস্থান

নকুলিকা ॥ (একটু ভেবে) আমার জন্যে ?···মেয়ে জন্তু ?···নাঃ,···আচ্ছা, আনিস্ একটা মেয়ে-গরু।

শবরী ॥ যে হুকুম।

কুরঙ্গিকা ॥ দাঁড়িয়ে রইলি যে···পায়রার ওজনে সোনা নেবে ?···সোনা অত সস্তা নয়···যাও দুষমন-কাটারির কাছে···সেইখানে দু'শো মণ চারশো মণ যা চাইবে···তাই পাবে,···যাও।

নকুলিকা ॥ কে পায়রা পাঠিয়েছে ?···হাঃ হাঃ হাঃ···কে ?···কে ?··· ভুলে গেলুম !···কে ?

কুরঙ্গিকা ॥ দুষমন-কাটারি···চমৎকার নাম—

নকুলিকা ॥ বা নামের চমৎকার তর্জমা···

উভয়ে ॥ হিঃ হিঃ হিঃ !

[মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্নানাগারের সম্মুখ ; অসংখ্য ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ির মাথা থেকে পাতাল-ঘরে আলো এসে পড়েছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুর-মাখানো একটা মকরের পিঠে বরুণের মূর্তি, একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো ফুল আরেকটাতে একটা কৌটো। একজন যবনী শাস্ত্রী ধনুর্বাণ নিয়ে পায়চারি করছে। স্নানাগারের ভিতর থেকে দর্পণ, কাজললতা প্রভৃতি নিয়ে চঞ্চল-চরণে চঞ্চরীকার প্রবেশ।]

যবনী ॥ চিঞ্চিনাটি !

চঞ্চরীকা ॥ (মুখ ভেংচিয়ে) চিঞ্চিনাটি ! পিছনে ডাকছ কেন বাবুইহাটি ? পাথরের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে মরব ?

যবনী ॥ মরব ? না পর্ব,— কাল পর্বদিন ?

চঞ্চরীকা ॥ হ্যাঁ গো, কাল মদন-মহোৎসব,—ভালোবাসার পরব।

যবনী ॥ (আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে), ভালোবাসা ?···ঈরস···কি আফ্রোজিনি ?···মেয়ে কি মরদ ?

চঞ্চরীকা ॥ আমাদের ভালোবাসার ঠাকুর মেয়ে নয়, মরদ, তাঁর নাম কন্দর্প।

যবনী ॥ আমাদের যবন-মণ্ডলে ভালোবাসার ভারী দেবতা হচ্ছে মেয়ে

লোক···তার নাম আফ্রোজিনি···হাল্‌কা দেবতা ঈরস ধনুক নিয়ে বেড়ায়,··· আফ্রোজিনির বেটা।

চঞ্চরীকা ॥ ধনুক নিয়ে বেড়ায় ?···সে তো আমাদের কন্দর্প,···তোমরা তাকে কি বল ?

যবনী ॥ ঈরস।

চঞ্চরীকা ॥ কী রস ?

যবনী ॥ (চঞ্চরীকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) ঈরস।

চঞ্চরীকা ॥ ও-রসে আমাদের কাজ নেই, আমাদের কন্দর্পই ভালো।··· আবার ভালোবাসার মেয়ে-দেবতা ? তার নাম কি বললে ?

যবনী ॥ ওর দু' নাম,···কেউ বলছে আফ্রোজিনি,···কেউ বলছে আফ্রোদিতি।

চঞ্চরীকা ॥ যবনী, তোর কপাল খুলেছে।

যবনী ॥ (কপালে হাত বুলিয়ে দেখে) কই ?

চঞ্চরীকা ॥ হাত বুলিয়ে কি দেখছিস ?···তুই দেখতে পাবিনি ; আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।

যবনী ॥ (সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে বোকাটে হাসি হাসতে লাগল)

চঞ্চরীকা ॥ শোন, বলি···তোদের এই ভালোবাসায় মেয়ে-দেবতার কথা শ্রুতকীর্তি ঠাকরুনকে বলতে পারিস ?···বকশিশ পাবি।

যবনী ॥ ছোটো কর্ত্রী আমাদের দেবতা পূজবে ? আমরাও কাল পূজব,··· মিছিল বার হবে,···আফ্রোজিনির মিছিল···নৌকায় বার হবে।

চঞ্চরীকা ॥ কোথায় ? সরযূতে ?

যবনী ॥ না, ফুল-বাড়ীর ঝিলে ;···যত মেয়ে শাস্ত্রী মিলে চাঁদা তুলেছি। নৌকা সাজাব···গেছো পশমের ফুল দিয়ে, লাল-টকটক ফুল দিয়ে।

চঞ্চরীকা ॥ গেছো পশম ?···সে কি ?

যবনী ॥ ভারী বড় গাছ···ভারী লাল লাল ফুল !

চঞ্চরীকা ॥ (হেসে) অ ! শিমুল !

যবনী ॥ হুঁ, আমরা গেছো পশম বলি···আমার দেশে গাছে পশম হয় না,···তোমার দেশ ভারী মজার···গাছে পশম হয়।

চঞ্চরীকা ॥ তা তো হয় !···কিন্তু এত ফুল থাকতে শিমুল ফুল কেন ?

যবনী ॥ লাল···কলিজার মতন লাল···কি রঙ !

চঞ্চরীকা ॥ তোমরা রঙই সার জেনেছ,···গন্ধ ফুল ভালো লাগে না ?

যবনী ॥ গন্ধ ফুল ? ··হাঁচি হয়,···সর্দি !

চঞ্চরীকা ॥ শিমুল ফুল ধুয়ে খাও···চল্লুম।

[প্রস্থান

[স্নানাগারের ভিতর থেকে সীতা ও উর্মিলার প্রবেশ]

যবনী ॥ (গ্রীক ধরনে অভিবাদন ক'রে কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা নিয়ে সীতার সামনে ধ'রে) কৌটা !···

সীতা ॥ কৌটো ?···কিসের কৌটো ?···কোত্থেকে এল ?

যবনী ॥ কিপোস্ ফেলেছে···

সীতা ॥ কিপোস্ ?···কিপোস্ কে ?

যবনী ॥ (মাথা চুলকিয়ে) কিপোস্···কিপোস্···কপি।

উর্মিলা ॥ কপি ?···বাঁদর ?···বাঁদরে ফেলেছে ?···দেখি (কৌটো খুলে) ভিতরে ভূর্জপত্রে কি লেখা রয়েছে,···চিঠি,···গোড়াটা নেই, বাঁদরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে···

সীতা ॥ যতটুকু আছে তাই প'ড়ে দেখ্ না।···

উর্মিলা ॥ (পাঠ) পুরোহিত-পরিষদ্ এবং স্বয়ং মহর্ষির এই অভিমত। এই বায়সাকৃতি ধূমকেতুর উদয়ে শুধু রাজ্যেরই যে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা নহে, অপিচ শ্রীমান্‌দিগের সহিত শ্রীমতী বধূমাতাদিগের দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই উভয় অমঙ্গলের নিরাকরণ জন্য পুরোহিত-পরিষদ্ গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন মহর্ষি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, আগামী বসন্তোৎসবের পূর্বাহ্নে কোনো পক্ষকে কোনো কারণ না দর্শাইয়া পৃথক করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহর্ষি বলেন, বসন্তোৎসবের সময়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত আনন্দের পরিবর্তে আকস্মিক ভাবে তীব্র মানসিক দুঃখভোগ ঘটাইতে পারিলে গ্রহবৈগুণ্যের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমান্ বা শ্রীমতীদের মধ্যে কেহ ঘুণাক্ষরেও যেন জানিতে না পারেন। জানিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। ইতি—অঙ্গ-বঙ্গ-সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-কাশী-মগধাদি-সমস্ত-সামন্ত-

সঙ্ঘ-মৌলিমণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ-অষ্টোত্তর-শত-শ্রীযুক্ত মহারাজ উত্তর-কোশল-স্বামী···

সীতা ॥ আর পড়তে হবে না,···উর্মিলা !···

উর্মিলা ॥ (বিষণ্ণ মুখে) দিদি !···কেন পড়লুম···কেন জানলুম···কি হবে, দিদি !

সীতা ॥ মহর্ষির সমস্ত ইষ্ট-চেষ্টা পণ্ড হয়ে গেল···কিন্তু কাকে দোষ দেব ?···তোমায় ?···না যবনীকে ?···না, যে বাঁদর এই কৌটো ফেলেছে তাকে ?···কাউকে না,···দোষ অদৃষ্টের।

উর্মিলা ॥ কি হবে দিদি !

সীতা ॥ কি হবে ?···যা ভবিতব্য···যা বিধাতার ইচ্ছে।···তুই বিষণ্ণ হ'স্‌নি উর্মিলা ! মনের বল হারাস্‌ নি,···হয়তো ধূমকেতুর অমঙ্গল-সূচনা ধোঁয়াতেই অবসান হবে।···আর যদি তা না-ই হয়···তাই ব'লে···নৌকো ডুবতে পারে ব'লে,···কে কবে ঝড়ের আগে নৌকো ডুবোয় !

উর্মিলা ॥ (নিরুত্তর)

সীতা ॥ আর তা' ছাড়া আরেকটা কথা ভাববার আছে,···আমরা দু'বোনে যা' জেনেছি তার ফল চারজনকে যেন না ভুগতে হয়। সে সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। আমাদের বিষণ্ণ দেখলে, সেই বিষণ্ণতার কারণ জান্‌বার জন্যে সবারি কৌতূহল হবে, কাজেই ক্রমে···

[তন্দ্রাবুড়ীর প্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী ॥ অ !—মা ! তোমরা এখানে,···আর আমি খুঁজে খুঁজে আলা !···

উর্মিলা ॥ কেন আয়ী !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ এই ধূম-খেত্তরের দোষ কাটাবার জন্যে তোমার শাশুড়ী··· সুমিত্তিরের···মহলে স্বস্তেন হচ্ছে,···তাই হোমের ফোঁটা পরবার জন্যে তোমাদের ডাকছে।

সীতা ॥ চল যাই···সপ্তভূমক প্রাসাদে তো !

তন্দ্রাবুড়ী ॥ হ্যাঁ-গো ; আবার কোথা···(সহসা উর্মিলার হাতে কৌটো

দেখে) অ—মা ! কি আশ্চর্য্যি !···এ কৌটো তুমি কোথায় পেলে···হ্যাদে দেখো, হ্যাদে দেখো···কি আশ্চর্য্যি ।

সীতা ॥ বাঁদরে বুঝি ফেলেছিল···এই যবনী কুড়িয়ে পেয়েছে···এই মাত্র দিলে···

তন্দ্রাবুড়ী ॥ কই দেখি দেখি, হ্যাঁ এই তো···এই তো বটে। গায়ে তিন-থাক শঙ্খ-লতা···এ যে সুমিত্তিরের···এ যে তোমার শাশুড়ীর···আমায় রাখতে দিয়েছিল, দিদি, জিম্মে ক'রে দিয়েছিল,···তা' পোড়া বাঁদরের জ্বালায় কি কিছু রাখবার জো আছে গা' !···যদি খোঁজ পড়ে···আর খুঁজে না পায়··· তা'হলে এখুনি অন্নখ করবে। দাও দিদি দাও !···তা' দেখ, দিদি, বাঁদরে নিয়ে গিয়েছিল বোলো না যেন···

উর্মিলা ॥ ব'লে আর কি হবে।

[সীতা ও উর্মিলার প্রস্থান

তন্দ্রাবুড়ী ॥ আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে···চার চারটে বো'য়ের কারো কি ছেলে হতে নেই গা !···সুমিত্তিরেকে বলি যে রাজাকে ব'লে একটা পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি টগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি হয় না।···ভালো দেখায় কি গা ? চার-চারটে বো'য়ের কারো কোলে ছেলে নেই···রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়···ভালো দেখায় কি ? অ্যাঁ ? এই সুমিত্তিরেকে মানুষ করলুম···তার ছেলে নকৃথনকে মানুষ করলুম,···এখন নকৃথনের একটি ছেলে হ'লে মানুষ-মুনুষ ক'রে দিয়ে যাই। সত্যি কিছু ছেরকাল থাকব না। তাই বলি···বলি, তোমাদেরও তো ঐ পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি ক'রেই ছেলে হয়েছিল, তা বো'য়েদের বেলাও না হয় সেই যগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি নেই···রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়···ভালো দেখায় কি গা, অ্যাঁ ?

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[নৃত্যশালা, সারি সারি পিতলের দীপ-বৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বলছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারিদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতী বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ-লেখা। পিল্লের পিল্লের রাগ-রাগিণীর মূর্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন দণ্ড একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্ধিকা নামক আসনে শ্রুতকীর্তি ও মাণ্ডবী আসীন। পাশে দু'খানা আসন খালি রয়েছে। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্কবাহিনী। সামনে রক্ত-কম্বলাসনে বধূনাট্যের দল। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে।]

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না, না,···এবার বসন্তোৎসবে ও-রকম ধরনের গান-টান চলবে না। ও ভালোবাসার পালা শুনে-শুনে ঝালাপালা হওয়া গেছে, অন্য কোনো পালা-টালা থাকে তো বলো।

প্রথমা ॥ ভালোবাসার গান ভালো লাগছে না? প্রেমের পালা পছন্দ নয়? তবে তো মুশকিল! আমাদের এলাকায় প্রীতি ছাড়া যে গীতই নেই। বধূনাট্যের ভিত হ'ল ভালোবাসার গানে।

দ্বিতীয়া ॥ সেইজন্যেই তো সারস্বতমণ্ডলী থেকে আমাদের কাউকে উপাধি দিয়েছে প্রীতিতীর্থ, কাউকে দিয়েছে যত্ন-রত্ন, কাউকে দিয়েছে সোহাগ-ভূষণ।

তৃতীয়া ॥ রোসো, রোসো!···আচ্ছা দেখুন, আপনারা প্রেমের ছাড়া আর কোনো পালা যদি শুনতে চান, তবে আমার মামা মশায়ের তৈরি একটি নতুন পালা শোনাতে পারি। মামা মশাই আমার কবিও বটেন, আবার কবিরাজও বটেন। সেইজন্যে তিনি কবিত্বে এবং কবিরাজত্বে মিলিয়ে যে নাটকটি রচনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে 'আধি-ব্যাধি-ওষধি-চম্পূ'···তাতে গদ্যে-পদ্যে সমস্ত টোট্‌কা ওষুধের সঙ্গে আধি-ব্যাধির যুদ্ধের কথা পালার আকারে লেখা হয়েছে;···পালাটি জ্ঞাতব্য তথ্যে একেবারে টইটম্বুর···আজ্ঞে করেন তো···

মাণ্ডবী ॥ না, আমাদের ঘুঙ্‌ড়ি-কাশি হয় নি, অন্য কিছু থাকে তো বলো···

তৃতীয়া ॥ আজ্ঞে, বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায় এ পালা পড়ে খুব···

মাণ্ডবী ॥ তা হোক্ বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায়ের বুলিতে ভালুক নাচতে পারে, মানুষে নাচে না।

চতুর্থী ॥ আজ্ঞে আমাদের পাড়ার তর্কচর্কী মশায়ের তৈরি একটি মানুষের মতন পালা আমার মুখস্থ আছে; যদি শোনেন তো গাই···সেটি একটি দার্শনিক পালা···তার নাম হচ্ছে 'তত্ত্ব-তাণ্ডব' বা 'সর্বতত্ত্ব-সংঘট্ট-ঘটোৎ-কচ্‌কচি'···এতে সর্বতত্ত্বের সারমর্ম নাট্যাকারে গ্রথিত করা হয়েছে। এতে বিশ্বতত্ত্ব, নিঃস্বতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, অলংকারতত্ত্ব, স্বর্ণকারতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব, অশ্বতত্ত্ব, ডিম্বতত্ত্ব···

মাণ্ডবী ॥ ব্যস, ব্যস···তত্ত্বের গর্তে জ্যান্তে কবর হয়ে গেল দেখছি! থামো, থামো···

পঞ্চমী ॥ ওগো থামো না, জানি তোমার পালা পছন্দ হবে না! (এগিয়ে এসে) আচ্ছা, দেখুন, আপনাদের সদুপদেশপূর্ণ উপাদেয় পালা শুনতে আপত্তি আছে কি?

মাণ্ডবী ॥ কত আর 'না, না' করা যায়···

শ্রুতকীর্তি ॥ আচ্ছা, শোনাও···(কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে পান নিলেন)

পঞ্চমী ॥ আমাদের এই পালাটির নাম "ভুবনের মাসী" বা "কর্মদোষে কর্ণ-কর্তন"; প্রস্তাবনাটা একটু শুনুন,—

(সুরে)

ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা, ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না—
সে মাসী সর্বনাশী!

ক্রমে, কলাচুরি মূলোচুরি ক'রে বাড়ে
ভুবনের আস্কারা,
চোর হতে পাকা ডাকাত হ'ল সে
ব্যাবসা-মানুষ-মারা!

শেষে, ধরা প'ড়ে গেল বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসী,
হাউ হাউ কেঁদে লাড়ু মুড়ি বেঁধে,
ছুটে এল তার মাসী।
তখন, মাসীরে ভুবন দেখে বলে, "শোন্
কথা আছে কানে কানে,
আহা! কাছে গেল মাসী বোনপোর মনে
কী আছে কিছু না জানে!
জগৎ স্তব্ধ সহসা শব্দ
হইল কটাস ক'রে,
কেটে নেছে কান মাসীর ভুবন
ডাকাতে-দাঁতের জোরে!
ফাঁসির কারণ মাসী কাঁদে, আর
উপদেশ পাই মোরা,
আস্কারা পেলে তস্কর হয়
রাস্কেল বোনপোরা!

মাণ্ডবী॥ দেখো বাপু, আমাদের চার বোনের মধ্যে কারো বোনপো নেই, এ উপদেশ নিয়ে আমরা কি করব? আচ্ছা এ কি তুমি নিজে লিখেছ?

পঞ্চমী॥ আজ্ঞে, না, মৌলিকতার দাবী করিনে, অন্যের রচনা নাট্যাকারে গ্রথিত করি।

মাণ্ডবী॥ ভবিষ্যতে আর পরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করো না, ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

শ্রুতকীর্তি॥ নাঃ, ভেবেছিলুম বধূনাট্যের দলটাকে চাঙ্গা ক'রে, মেয়েদের দিয়ে শিল্পসাধনায় একটা নতুন মৌচাক সৃষ্টি করব···কিন্তু ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়তে হচ্ছে···

ষষ্ঠী॥ না, না, হতাশ হয়ে পড়বেন না,···আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি। আচ্ছা আরেকটি জিনিস আপনাদের শোনাই,··· এ পালা শুনলে হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ পালায় আচারপরায়ণা

আচার্যানীদের একটি বিশেষ বাণী বিঘোষিত হয়েছে, এটি আমাদের গার্হস্থ্য পবিত্রতার সনাতন সংগীত,···পালাটির নাম হচ্ছে শ্রীশ্রীগোবর-মঙ্গল ! (অন্যান্য সভ্যাদের প্রতি) ধর্ না ভাই, সকলে মিলে শোনাই।

(গান)

জয় জয় শ্রীগোময় ! গোলোকে বসতি হয়,
শুচি তুমি শুচিতার সেতু !
বৈকুণ্ঠের গোবরাটে গোবরিয়া পোকা হাঁটে
গায়ে তার গোময় যেহেতু !

বধূনাট্যের দল ॥ হায় রে, গায়ে তার গোময় যেহেতু !

ষষ্ঠী ॥ সৃষ্টি আগে বৃষরূপে ধর্ম নাদিলেন চুপে
সেই নাদে সৃষ্টির পত্তন,
সংসার হইল তাই ষাঁড়ের গোবর ভাই
অকেজো অখদ্যে অকারণ !

বধূনাট্যের দল ॥ হায় রে, অকেজো অখদ্যে অকারণ !

ষষ্ঠী ॥ গোবর অমূল্য ধন ধরিলেন গোবরধন
নন্দের নন্দন নিজ করে ;
গোবরে যে ঘেন্না করে, গোভূতে তাহারে ধরে,
হয় সেই ল্যাজে ও গোবরে।

মাণ্ডবী ॥ বাস, বাস, আর গাইতে হবে না···থামো···এ যে দেখছি···
উপদেশ পুঁটুলির পুঁটিরাম কবি।
গড়েছে গোবর দিয়ে বাগ্দেবীর ছবি।

বধূনাট্যের দল ॥ (বিস্মিতভাবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল)

মাণ্ডবী ॥ এ সকড়ি-ঘরের পালা নাচঘরে কেন ?

শ্রুতকীর্তি ॥ নাঃ জমছে না, জমছে না (পিছন না ফিরে কাঁধের উপর দিয়ে পান নিয়ে)। কেন দিদি আজ জমছে না বল্ তো ?

মাণ্ডবী ॥ জমবে কি ?—
বচনের বীণ্কার বীণ্কারী কই তার ?
মরমের তরফের তার বাজে কই ?

গয়জের বাজনা এ, খোঁজে শুধু খাজনা এ,
ভালুকের নাচ্‌না এ, এতে রাজী নই।

শ্রুতকীর্তি ॥ নাঃ জমছে না, অন্য কোনো ভালো পালা নেই ?

প্রথমা ॥ আছে বই কি, ভালো ভালো পুরোনো পালা আছে, যেমন লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর, সমুদ্র-মন্থন, মাতৃকা-মঙ্গল বা কার্তিকের জন্ম, রুরুর জয় বা পুরুষ-সাবিত্রী।

শ্রুতকীর্তি ॥ এমন পালা নেই যাতে সব স্ত্রীলোক,···পুরুষের নাম-গন্ধ নেই ?

দ্বিতীয়া ॥ আজ্ঞে,···অভিনয় যারা করবে···তারা সবাই স্ত্রীলোক,···কিন্তু পালাতে পুরুষ আছে বই কি ; তবে, সে সব ভূমিকাও আমরাই গ্রহণ করব। মেয়েরা পুরুষ সাজবে।

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না, আমি ও-রকম চাইছিনে,···ও-রকম চাইনে,···নাঃ জমছে না, জমছে না।

[নকুলিকার প্রবেশ]

শ্রুতকীর্তি ॥ কই ? দিদি এলেন না ?

নকুলিকা ॥ না, তাঁর শরীর একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তিনি আসতে পারবেন না।

শ্রুতকীর্তি ॥ শরীর অসুস্থ নয়,···মনে সুখ নেই,···তাই এলেন না,··· আমি বুঝেছি।

মাণ্ডবী ॥ উর্মিলার কি হ'ল ?

নকুলিকা ॥ সীতাদেবী একলাটি আছেন, সেই জন্যে তিনি তাঁর কাছে রয়েছেন।

শ্রুতকীর্তি ॥ নাঃ, আজকে আর জমবে না,···সব মাটি···সকল রকমে মাটি···সব মাটি !

[প্রস্থান

মাণ্ডবী ॥ (ছোটো গলায়) নকুলিকা, শ্রুতির অবস্থা দেখলি ?···ও বাইরে কারুকে জানতে দিচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর মন কাঁদতে সুরু করেছে।

নকুলিকা ॥ ওঁর একলার নয়, অনেকেরই মন কাঁদতে সুরু করেছে। এই বসন্তকাল···চাঁদনী রাত···এমন রাতে একলাটি ;···এক রকম ভালো··· বসন্তে নিম্ব-ভোজন।

[মাণ্ডবী ও নকুলিকার প্রস্থান

প্রথমা ॥ আজ আমরা কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলুম, কে জানে, কারুকে খুশিও করতে পারলুম না, নিজেরাও খুশি হওয়া গেল না।

দ্বিতীয়া ॥ রাজবধূদের প্রসন্ন হাসিটুকুও আজ পাওয়া গেল না, প্রশংসা-ভিখারীর হাত পাতাই সার।···

তৃতীয়া ॥ সব ভিখারীরই এক দশা।

সকলে ॥ (গান)

(ও তুই) ব্যাকুল হয়ে বাড়ালি হাত দান পাবি বলি!
(দেখি) ফিরল যে তোর আপন বুকেই শূন্য অঞ্জলি!
(তোরে) বাজ্‌ল সারঙ বিফল গানে,
(হায়) ধরল না রঙ কারু প্রাণে,
(শেষে) চোখের জলের বন্যা প্রবল রইল কেবলি!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পুষ্পবাটীকার অপর অংশ, দূরে কন্দর্প-মন্দির দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের গায়ে চকাচকি, হংস-হংসী, ময়ূর-ময়ূরী, কপোত-কপোতীর আধ-খোদাই নক্সা। পাশে ঝিল, ঝিলে ফুল দিয়ে সাজানো একখানা নৌকো। এদিকে মাধবী-লতা-জড়ানো তমাল গাছে একটা ফুল দিয়ে সাজানো দোলা ঝুলছে। মুকুলিকার পিছন-পিছন বল্লরীকার প্রবেশ।)

বল্লরীকা ॥ স্বজনী! শোজ্‌নে কুঁড়ি!

মুকুলিকা ॥ কি সজনী বড়াই-বুড়ী!

বল্লরীকা ॥ দেব গায় ফাগের গুঁড়ি!

মুকুলিকা ॥ ফক্কুড়ি ফের? বটে?…বটে?

বল্লরীকা ॥ দিই না দু'টি আজ কি চটে?

মুকুলিকা ॥ দিস্‌'খুনি সেই সন্ধ্যেবেলা,
জমবে যখন লোকের মেলা।
বলি হ্যাঁলা! রকম কিলো?

বল্লরীকা ॥ রকম কি আর? দুঃসমাচার!
হুতুম-থুমোর হুম্‌কি এলো!

মুকুলিকা ॥ সে কি রকম?

বল্লরীকা ॥ বন্ধ এবার বকম-বকম।

মুকুলিকা ॥ হেঁয়ালি রাখ্‌…বল্‌ না খুলে!

বল্লরীকা ॥ দেখনা নিজের চক্ষু তুলে!
কুড়ুল নিয়ে আসছে কারা
অশোক বকুল শিরীষ পারুল
সব গাছেরই দফা সারা!

মুকুলিকা ॥ কাটবে না তো দোলা-সমেত তমালটাকে?

বল্লরীকা ॥ চল্‌ দেখিগে দাঁড়িয়ে ফাঁকে।

[অন্তরালে গমন

[মালিনী ও স্ত্রীবেশে মালীর প্রবেশ]

মালিনী ॥ শীগ্‌গির সেরে নাও, এখুনি ছোটো কর্ত্রী এসে পড়বে···মুশকিল হবে···এই গাছটা···এই গাছটা।

মালী ॥ তুইও তো আচ্ছা লোক দেখছি···আজ পুজোর দিনে···দেবতার চোখের সামনে···জ্যান্ত গাছটাকে প্রাণে মারব?···ছোটো কর্ত্রী তোকে বলেছে···তুই কাট্‌ না, আমার তো চাকরি এমনেও খসেছে, অমনেও খসেছে।

মালিনী ॥ হ্যাঁগা আমি কি পারি?···আমি হলুম নারী···যাতে জোরের দরকার সে কাজ কি আমাদের দিয়ে হয়?

মালী ॥ আ তোমার মুখে (জিভ কেটে) বেগুন!···ছোটো কর্ত্রীকে কাল সে কথা বলিস নি কেন?···ওঁর কথায় আমি দেবতার গাছ কাটি··· নিজের পায়ে কুড়ুল মারি,···বলি দেবতার কোপে পড়ে শেষে এই বুড়ো বয়সে কি আবার বিয়ে করব নাকি?

মালিনী ॥ তা'হলই বা, বলে, ভাগ্যিমানের···আমরা মরি!

মালী ॥ তুই কি আমায় ভাগ্যিমানি ঠাওরালি র‍্যা?

মালিনী ॥ পুরুষ মানুষ সবাই ভাগ্যিমান···ভাগ্যি ওদের ল্যাজে বাঁধা!

মালী ॥ না নাঃ, শেষে কি সত্যি তোকে হারাব? কেন তুই সঙ সাজিয়ে এখানে নিয়ে এলি?

মালিনী ॥ আহা, না কাটো, দুটো কোপ দিয়ে রাখ না, ছোটো কর্ত্রীর চোখে পড়ুক, কাজ দেখানো নিয়ে বিষয়।

মালী ॥ নাঃ, তোর সাহস থাকে তুই কাট্‌।

মালিনী ॥ আহা বড় কথাই বল্লেন, উনি দেবতার মন্দির ভয় রাখেন, আমি তো রাখিনি!···আর, তোমার কাজ আমাকে কখনো সাজে!

মালী ॥ কেন?···তোমার সাজটা আমায় দিব্যি সাজ্‌ল, আর আমার কাজটা তোমায় সাজ্‌বে না? না-হয় উড়ে-সুন্দরীদের মতন মালকোঁচা মারো!

মালিনী ॥ বচনের খোঁচা দিতে খুব মজবুত, কাজের বেলায় ঢু ঢু!

মালী ॥ ওরে! আর কোঁচাও দিতে হবে না, খোঁচাও খেতে হবে না, এইবার সিধে চোঁচা দিই চ'···কারা আসছে···

মালিনী ॥ তা এলই বা,…চোঁচা দিতে যাব কেন ?

মালী ॥ তা নইলে এই চোঁচের মতন মোচের বাহার দেখলেই হুড়ো জেলে এখনি বোঁচা ক'রে ছেড়ে দেবে,…দিই চোঁচা…আমা-হ'তে ও-কাজ আজ কিছুতেই হবে না।

মালিনী ॥ খবরদার, ঘোমটা টেনে দাও…পালিয়ো না।

[বল্লরীকা ও মুকুলিকার প্রবেশ]

বল্লরীকা ॥ মালিনী, এ আবার কে লো ?

মালিনী ॥ ও নতুন মালিনী।

মুকুলিকা ॥ বাস্ রে !…এ যে বোম্বাই মালিনী !

মালিনী ॥ বোম্বাই কি ?…ও আমার সম্পর্কে (ঢোক গিলে) বোন্ হয়, …দিদি।

বল্লরীকা ॥ দিদি কি লো,…মরদ মরদ ঠেক্‌ছে যে !

মালিনী ॥ তা মেয়েছেলেকে মরদের কাজ করতে হলে অমন একটু ঠেকবে বই কি ;…ছোটো কর্ত্রীর হুকুম তো জান না, তা মেনে চললে, ক্রমে আমাদেরও গোঁফ বেরুবে।

মুকুলিকা ॥ তা হ্যাঁ ভাই, তোর দিদিকে মরদের কাজ করতে হয় কেন ?

মালিনী ॥ অ-মা !…তা জান না ?…ওর যে হট্টমালার দেশে বিয়ে হয়েছে,…সেখানে গাই-বলদে চষে কিনা, তাই।

বল্লরীকা ॥ তা ভাই, আমরা মেয়েছেলে আমাদের দেখে তোর দিদি ঘোমটা দিচ্ছে কেন ?

মালিনী ॥ (নিরুত্তর)

মালী ॥ (সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী)

মুকুলিকা ॥ ভাই বোম্বাই মালিনী, ঘোমটা খোলো,…তোমায় দেখি,… ভাব করবে না ?…সে কি ভাই (ঘোমটায় টান দিয়ে)…ওঃ সাবাস্ ! বোম্বাই মালিনীর গোঁফ যে রে !

বল্লরীকা ॥ মেয়েছেলের গোঁফ কি লো ?…বলি হ্যাঁ মালিনী !

মালিনী ॥ চুপ্ ! চুপ্ !…গোল করে কি বোন ? দিদি আমার লজ্জা পাবে ;…তা জান না, দিদির ঐ তো রোগ ! কত কবরেজ কত বদ্দি দেখলে…

কিছুতেই কিছু হ'ল না।···তা সেদিন ওদের গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল, সে একটি মাদুলি দিয়ে গেছে,···মধুপূর্ণিমের দিন সরযূর জলে ডুব দিয়ে সেই মাদুলি ধারণ করলে নাকি ভালো হয়; তাইতো আমার এখানে এসেছে,··· নইলে ওদের কিসের দুঃখু,···বলে, গোয়াল-ভরা গাই, গোলা-ভরা ধান, গা-ভরা গয়না।—তা এখন চল্লুম ভাই,···আজ আবার ক' দণ্ডের পর বুঝি পূর্ণিমে ছেড়ে যাবে, তার আগে নাইয়ে নিয়ে আসিগে,···চল দিদি, চল, নাইবার যোগাড় দেখিগে।

[একদিকে মালী ও মালিনী আর অন্য দিকে মুকুলিকা ও বল্লরীকার প্রস্থান।

[সাজিতে ফুল নিয়ে জনকয়েক তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ চল্ ভাই, এইবেলা পুজো দিয়ে আসি।···এখনি ভিড় হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়া ॥ পুরুত এসেছে?

তৃতীয়া ॥ এ পুজোয় আবার পুরুত কি?···আমরাই পুরুত!

সকলে ॥ (গান)

আমায়, অশোক ফুলের রূপটি দাও!
মদন! সদয় নেত্রে চাও!
মল্লিকারি মনোহরণ
মন্ত্র শিখাও, কিশোর-শরণ!
নীলোৎপলের কাজল দিয়ে দৃষ্টি ছাও!
আমের মুকুল আকুল আশা
সফল কর ভালোবাসা
অরুণ অরবিন্দ হিয়ায় রস ঘনাও!
মদন! সদয়-নেত্রে চাও!

[মন্দিরের দিকে গমন

[একদিকে মুকুলিকা, বল্লরীকা আর অন্যদিকে নিপুণিকা ও তরঙ্গিকার প্রবেশ]

বল্লরীকা ॥ এই যে, লোক আসতে শুরু হয়েছে।

নিপুণিকা ॥ ওলো, এর গায়ে দে, এর গায়ে দে,···

মুকুলিকা ॥ আরে না, না, আমায় না···ছিঃ···দিলে? নেহাত দিলে··· দাও···আল্‌কাতরা-টাতরা দিয়ো না কিন্তু···

সকলে ॥ (গান)

যদি, নেহাত দেবে তবে না হয় বরং
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রঙ।
যদি ফাগুন লাগে
(প্রাণে ফাগুন লাগে)
তবে রঙীন ফাগে
সবে, রাঙাও সখী! প্রাণে বাজাও সারং!

মুকুলিকা ॥ আরে বাস্ বাস্,···হয়েছে···হয়েছে···সব রঙ এখনি খরচ ক'রে ফেলে যে···

তরঙ্গিকা ॥ রঙের অভাব কি?···রাজবাড়ীর দৌলতে কাজ্‌লা দীঘি আজ এতক্ষণ আবীরের ঠেলায় লালদীঘি হয়ে উঠল···

মুকুলিকা ॥ ঐ দেখো···ওরা আবার কারা···

[কপোতিকা ও সুপর্ণিকার প্রবেশ]

তরঙ্গিকা ॥ এমন দিনে ধব্‌ধবে কাপড় প'রে বেরিয়েছ?···তোমাদের সাহস তো কম নয়?···তোমরা কে গা?···

কপোতিকা ॥ আমরা কপোত, কপোতী···

মুকুলিকা ॥ তোমরা বোবা পায়রা নাকি?

কপোতিকা ॥ শুনবে—রকম্-রকম্?

(গান)

আমি তোরে খুব—খুব—
খুব ভালোবাসি লো বাসি!
দিয়ে তোরি রূপে ডুব,
অপরূপ স্বপনে ভাসি!
তনু হ'ল ঘুম্ ঘুম্,—
মনোভব-কুমকুম,—
অনুভবে রুম্‌ঝুম্ অধরে হাসি!

[উভয়ের মন্দিরের দিকে প্রস্থান

নিপুণিকা ॥ ওরে, ওদের গায়ে রঙ দেওয়া হ'ল না? চলে গেল যে···

তরুণিকা ॥ ওদের পর্ খারাপ হয়ে যাবে,···যাক গে···

নিপুণিকা ॥ আ-হা-হা-হা ফট্‌কা পায়রা ক'রে ছেড়ে দিতে হয়;···বাঃ! আবার কারা আসে রে···

[কুসুমিকা ও ফুল্লরিকার প্রবেশ]

গলা ধরাধরি ক'রে তোমরা আবার কেগো?

কুসুমিকা ॥ আমরা একবৃন্তে দু'টি ফুল···

গান)

আমরা দু'টি স্বর্গ লুটে মর্ত্য ভরেছি!
অনুরাগের পরাগ পরিবর্ত করেছি!
ফুটেছি এক বৃন্ত 'পরি,
বিভোল বাতাস উদাস করি,
পরিমলের আমরা পরী মূর্তি ধরেছি!
পরস্পরে পরশ করি'
পরশ-মণির ক্ষোভ পাশরি,
জীবন-মরণ প্রেমের সাধন শর্ত করেছি!

নিপুণিকা ॥ ওরে ওদের ছাড়িস-নি···দে, দে···রঙ দে···

কুসুমিকা ॥ ফুলের গায়ে আর রঙ দিয়ে কি হবে···আমরা অমনিতেই রঙীন···

গাইতে গাইতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান

নিপুণিকা ॥ ওঃ ধুম লেগে গেছে···আবার কারা আসছে···ওরে, মদনিকা মদন সেজেছে···হাতে ফুলের ধনুক···

[মদন-রতির বেশে মদনিকা ও আরাত্রিকার প্রবেশ]

তরঙ্গিকা ॥ মাথায় ফুলের মটুক···তোমরা কে গা?···যেন চেন চেন করছি···তোমরা কে ভাই?

মদনিকা ॥ যারা, কুসুম-শরে পাগল করে আমরা সেই···

আরাত্রিকা ॥ মোদের, সকল কথা ব্যক্ত হবে সংগীতেই···

উভয়ে ॥ (গান)

আমরা, কথা বলি শুধু বাঁশিতে !
করি কানাকানি মন-জানাজানি
মল্লিকা-ফুল-রাশিতে
অঙ্কুরে মোরা মুঞ্জরি,
নয়নে নয়নে গুঞ্জরি,
আমরা, নিখিল হিয়ায় হিন্দোলে দুলি
চির ভালোবাসা বাসিতে !
কুসুম ধনুর গুণ টেনে
মরণের বুকে বাণ হেনে
জীবনেরি জয় লিখে দিই নিতি
চামেলি চাঁদের হাসিতে !

নিপুণিকা ॥ রঙ দে···রঙ দে···

মদনিকা ॥ সাবধান···বাণ মারব !

তরঙ্গিকা ॥ মারো···আজ বাণ খেতেই তো বেরিয়েছি।

সকলে ॥ মারো বাণ, করো মানা, তা ব'লে কি রঙ দেব না।

[হুড়োহুড়ি করতে করতে সকলের মন্দিরের দিকে প্রস্থান

[প্রজাপতির বেশে পতঙ্গিকার প্রবেশ]

পতঙ্গিকা ॥ (গান)

আমি, গোপনে এসেছি স্বপনে ভেসে !
পশেছি না জেনে ফুলেরি দেশে !
হেথা, চামেলি মালতী চাঁপারে দেখে
শেষে যে অশোকে গিয়েছি ঠেকে,
এঁকে গেছে বুকে ছবি নিমেষে,
কেমনে রহি রে ভালো না বেসে !
নীরবে হুয়েছি ছুঁয়েছি চুপে
ডুবেছি ডুবেছি ডুবেছি রূপে
ডুবে ভেসে গেছি সুরেরি রেশে
প্রাণেরি গানেরি তানেরি শেষে !

[মন্দিরের দিকে প্রস্থান

[মদনিকা, আরাত্রিকা, নিপুণিকা প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ]

নিপুণিকা ॥ ওরে এইবারে দে রঙ···ওর পাকাটির বাণ ফুরিয়ে গেছে, তূণ খালি—

তরঙ্গিকা ॥ বাণ মেরে ভারী উত্তম-খুত্তম করা হয়েছে, না রোসো—এই যে—এই যে—

সকলে ॥ (গান)

ও যে, সকল হিয়া বেঁধে কুসুম-শরে—
ওরে, সবাই মারো সই কাঁকন-করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহুঃ পড়ুক ঝ'রে ঝ'রে ভুবন 'পরে।

[সকলের প্রস্থান

[শ্রুতকীর্তি ও নকুলিকার প্রবেশ]

শ্রুতকীর্তি ॥ আর বছর এই বসন্তোৎসবের দিনে, আকস্মিক আনন্দে, দিনের বেলাতেই অকাল-জ্যোৎস্নার ব্রত করেছিলুম···তিমিধ্বজের পৌত্র নক্রধ্বজকে পরাস্ত ক'রে সেদিন ওরা হঠাৎ নগরে ফিরল···ফেরবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না···আর এবার···

নকুলিকা ॥ এবার সবাই মিলে অকাল-বাদলের ব্রত করছি···হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেছে!···উৎসবটা একেবারে অপৌরুষেয় হয়ে উঠেছে··· পুরুষের নাম-গন্ধ নেই;···অর্ধেক সম্রাটের সঙ্গে তপোবনে···অর্ধেক কুমারদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ! একলা মেয়েরাই এবার এক হাতে উৎসবের তালি বাজাবার চেষ্টায় আছে।···ভালো কথা শবরী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে···ওর হরিণ কি রাখা হবে?

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না, ও হরিণ ফিরিয়ে দে,···ও আমার চাই নে,···ওর শিং নেই, কোনো বাহারই নেই···

নকুলিকা ॥ মেয়ে-হরিণ আনতে বলা হয়েছিল যে, মেয়ে-হরিণের শিং হয় বুঝি!···ময়ূরটা? রাখব?

শ্রুতকীর্তি ॥ না, না, ও পেখম ধরে না, ল্যাজা-বোঁচা,···বিশ্রী···

নকুলিকা ॥ মেয়ে-ময়ূর বুঝি পেখম ধরে ?···কোকিলটা ? ওটা থাক্···কি বল ?

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই যে বলছিস্ ও ডাকবে না,···না ডাকে তো পুষে কি হবে ?

নকুলিকা ॥ মেয়ে-কোকিল কোনো পুরুষেও ডাকবে না। কেবল ক্যার ক্যার করবে, কুহুধ্বনি ভুলেও করবে না।

শ্রুতকীর্তি ॥ তা তো আগে বলিস্-নি।

নকুলিকা ॥ তুমি যে কোনো পুরুষ জানোয়ার পুষবে না···তা হ'লে কি করব ?

শ্রুতকীর্তি ॥ যাকগে,···আচ্ছা তুই যে কি আনতে দিয়েছিলি···এনেছে ?

নকুলিকা ॥ হ্যাঁ, এনেছে। একটি মেয়ে-গরু আনতে দিয়েছিলুম, তা এনেছে,···তোমার মেয়ে-ময়ূর পেখম ধরবে না, মেয়ে-কোকিল গান করতে পারবে না, কিন্তু আমার মেয়ে-গরু দিব্যি দুধ দেবে !

শ্রুতকীর্তি ॥ যা তুই ! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ছি, ছি, ওদিকের গাছগুলো কেটে বাগানটা বড় বিশ্রী দেখতে হয়েছে !

নকুলিকা ॥ তা কি করবে বল !···ব্যাকরণে গাছকে যে পুরুষ বলেছে ;···

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই যা···আর জ্বালাস্-নে !

নেপথ্যে ॥ (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী !
জয় ! জয় ! জয় দেবী ! আক্রোজিনি !

নকুলিকা ॥ ঐ দেখ তোমার মনের মতন মিছিল বেরিয়েছে, যবনীরা ওদের মেয়ে কন্দর্পকে নৌকোয় নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে।···ঐ যে নৌকোখানার ঢাকনি প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতন একবার ফাঁক হচ্ছে আর একবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ; ঐ যে মেয়ে-কন্দর্প নৌকোর ভিতরে অঙ্গ ঢেলে আরাম করছেন।

শ্রুতকীর্তি ॥ আর মেয়ে-কন্দর্পে কাজ নেই,···চল, আমাদের চিরকেলে কন্দর্পকে ফুল দিয়ে আসি।

নকুলিকা ॥ দর্প তা'হলে টিকল না ! [প্রস্থান

[ঝিলে নৌকোয় গুণ টানতে টানতে যবনীদের প্রবেশ]

যবনীর দল ॥ (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী !
জয় ! জয় ! জয় দেবী আফ্রোজিনী ।
শুক্তির অঙ্কে সুপ্তিহরা !
তৃপ্তির গর্ভে তৃষ্ণা-ভরা !
যৌবন-ধাত্রী গো গৌরবিনী !
স্ফূর্তির যাত্রিনী আফ্রোজিনী !
দেবরাজ-পুত্রিকা মূর্তপ্রীতি !
সুন্দরী ! শুকতারা ! আফ্রোদিতি ।
চির-প্রেমপাত্রী গো সম্মোহিনী ।
মনোভব-মাতৃকা । আফ্রোজিনী । [প্রস্থান

[অন্য নৌকায় কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ এগিয়ে গেল···দাসীদের নৌকো এগিয়ে গেল ।···আস্পর্ধা !··· জোরে বাও···জোরে বাও ।

দ্বিতীয়া ॥ আজ উৎসবের দিন···কন্দর্পের দরবারে সবাই সমান···যাক্‌গে এগিয়ে···আভিজাত্যের দর্প আজ করতে নেই···চল না, দিব্যি আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে···বাইতে বাইতে যাওয়া যাবে,···আমোদ নিয়ে কথা ।

সকলে ॥ (গান)

যদি কুসুম শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
ও যে, ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা !
ও যে, দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল বায়ে
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা !

[বাইতে বাইতে প্রস্থান

[কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ]

প্রথমা ॥ এই, আজ দোল খেতে হবে···দোল খেতে হবে (দোলায় উঠে)···একটু দুলিয়ে দে না ভাই···আমি আবার তোর বেলায় দেব'খুনি ; নে, না।

দ্বিতীয়া ॥ আচ্ছা নে, গান ধর···

(গান)

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দুনিয়াতে আজ নতুন হাওয়া
দুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
শাখায় শাখায় আমের মুকুল,
পারুল, চাঁপা, অশোক, বকুল—
দুল্‌ছে দোদুল আকুল হাওয়ায়
ভোমরা ফেরে পায় সেধে !
(আজ) কোকিল ডাকে নতুন স্বরে,
নতুন ফোটে নতুন ঝরে,
নতুন ছবি আঁখির 'পরে
জাগ্‌ল মোহন ফাঁদ ফেঁদে !

[প্রস্থান

[নকুলিকা ও শ্রুতকীর্তির পুনঃপ্রবেশ]

নকুলিকা ॥ (এক হাতে তালি দেওয়ার ভঙ্গী ক'রে) বাঃ ! বাঃ ! বাঃ !

শ্রুতকীর্তি ॥ নকুলিকা ! ও আবার কি ? তোর কি সবই অদ্ভুত ?

নকুলিকা ॥ এক হাতে তালি দিয়ে একটু নতুন রকম ফুর্তির চেষ্টায় আছি !

শ্রুতকীর্তি ॥ তা কখনো হয় ?···সব বিটকেল···

নকুলিকা ॥ আজ কিন্তু দেখছি সবাই ঐ চেষ্টাই করছে !···এরা দেখেও শিখছে না···ঠেকেও শিখছে না···আমি এই ঠেকে শিখলুম···দেখলুম এক হাতে তালি-বাজানো সুবিধে হয় না।

(গান)

তালি বাজল না সই, এক হাতে কই বাজল না !
নাচতে গেলাম এক পায়ে, তাও সাজল না !

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই বড় বাড়িয়েছিস্ ।

নকুলিকা ॥ (সুরে)

বলছে সবাই বাড়াবাড়ি
শুক-শারীতে আড়াআড়ি,
তেল ঢেলে আর ফল কি, বলো, রাধাই যখন নাচল না ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাওয়া-মঞ্জিল, সময় অপরাহ্ণ, অন্যমনস্ক ভাবে উর্মিলার প্রবেশ]

নেপথ্যে ॥ (গান)

বইল না রে জীবন
এ আর বইল না !
যারি পরে ভরসা
শেষে সেই দেখি ভর সইল না !
না দেখি আর কূল পাথারে
শকতি যে নাই সাঁতারে,
ভেরে এল অঙ্গ
ভরা ডুবল বুঝি রইল না !

উর্মিলা ॥ বিহঙ্গিকা ! বিহঙ্গিকা !···এ সংগীত তুই কোথায় পেলি··· আমার কুণ্ঠিত অন্তরের অস্ফুট হাহাকার সুরের ইন্দ্রজালে কি করে ফুটিয়ে তুললি । বিহঙ্গিকা !···কই বিহঙ্গিকা তো এখানে নেই !···কে গাইলে ?··· বেলা প'ড়ে আসছে···পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝরা বকুলগুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে,··· আমার মনের ভিতরটাও অমনি শুকিয়ে যাচ্ছে···ঠিক অমনি কুঁকড়ে যাচ্ছে

…হুতাশের হাওয়া বইছে…আর যে পারছি না, আর যে সইছে না…কি কললুম,…কি হ'ল ; বিধাতা !…যে দুর্বল…তার পায়ে অপরাধ…পদে পদে আতঙ্ক…সে কেবল কাঁদতেই জন্মেছে।

চোক ঢেকে নীরবে ক্রন্দন)

[সীতার প্রবেশ]

সীতা ॥ উর্মিলা !…ছি বোন্…শুধু শুধু চোখের জল ফেলতে নেই…ওতে অমঙ্গলকে ডেকে আনা হয়।…দুর্দিন আসবার আগেই তুই আতঙ্কে শুকিয়ে যেতে বসেছিস,…কপালে দীর্ঘ বিচ্ছেদ থাকে…তা কি তুই চোখের জল দিয়ে রদ করতে পারবি ?

উর্মিলা ॥ না দিদি, আমি তো কাঁদিনি…কে গান গাইছিল,…সেই গান শুনে, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল ;…গানের সুর শুনলে আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে…চোখ ছলছলিয়ে আসে…ও কিছু নয় !

সীতা ॥ আমাকে ভোলাস নি, বোন…ধূমকেতুর ধোঁয়ায় এখনো তোর মনটা ঘোলাটে হয়ে রয়েছে ! প্রাণের ভিতর যার কান্নার মেঘ থমথমিয়ে আছে, গানের হাওয়ায় তারি বাদলা নামে। সহজ হয়ে নে…সহজ হয়ে নে ;…গ্রহ-তারা ফলের সূচক মাত্র…ধূমকেতু বলছে তোমার আমার চলবার পথে বিস্তর বিঘ্ন আছে !…কিন্তু সেই বিপদে যে ডুবব তা কে বললে ?…ধূমকেতু ব'লে গেল, বন্যা আসবে, বাঁধের মাটি আলগা, সাবধান ! এমন অবস্থায়, লোক বাঁধের গোঁড়ায় নতুন ক'রে মাটি দেয়, না চোখের জল ঢেলে বন্যার আগেই বাঁধ ধ্বসিয়ে দেয় ?…কি করে ?…বল দেখি !

উর্মিলা ॥ যার বাঁধ দেবার শক্তি আছে সে বাঁধ দেয়, যার নেই সে কাঁদতেই বসে।

সীতা ॥ তোর শক্তি নেই কি করে জান্‌লি ?

উর্মিলা ॥ নিজের শক্তি নিজে জানিনে ?

সীতা ॥ না, জানিসনে…তুই কেন,…কেউ জানে না,…ঘাড়ে বোঝা না চাপলে ঘাড়ের যে কতটা জোর তা পরীক্ষা হয় না ;…বিপদ ঘাড়ে এসে পড়লে মানুষ অসাধ্যসাধন করে ;…মানুষের শক্তির সীমা নেই !

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী ॥ ছোটো কর্ত্রী আপনাদের কাছে নিবেদন করছেন,…কামরূপ থেকে একজন ভাণমতী এসেছে।

সীতা ॥ কোথায়?

দাসী ॥ এই মেয়ে-মহলের অঙ্গনে।

সীতা ॥ চল্ ঊর্মিলা ভাণমতীর খেলা দেখিগে।

ঊর্মিলা ॥ চ—লো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[মেয়ে-মহলের অঙ্গন। দুয়ে দস্তুর প্রাচীর; চারিদিকে বেলেপাথরের ঘর; সোনার জাল-আঁটা ঝরোকা; নাগদন্তের ভরনায় জালির বারাণ্ডা। সখীর দল; সিংহ-পীঠিকায় মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি; পাদপীঠিকায় বিহঙ্গিকা, কুরঙ্গিকা; মাটিতে ভাণমতী। ভাণমতীর উবু খোঁপা, পরনে নীলাম্বরী, গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। এক হাতে আস্ত শাঁখের শাঁখা, এক হাতে একটা গাছের শিকড় কঙ্কণের আকারে জড়ানো। এক কানে কড়ি, আর-এক কানে আধ-কপালে সুপারি। হাতে ময়ূরপুচ্ছের চামর। সামনে একটা আধ-খোলা বেতের ঝাঁপি। একটা শূন্য খাঁচা ও একটা রঙীন হাঁড়ি।]

ভাণমতী ॥ লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্, জলে জ্বালাই আগ্, লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্! লাগ্ লাগ্ লাগ্!

(গান)

আসমানে শিকলি লট্‌কিয়ে দোল খাই
গাছ রুয়ে সাঁজো ফল ফলাই,
শুনো পিঁজরাতে পাপিয়া ময়নায়
সিরজিয়ে হরেক বোল্ বলাই!

মাণ্ডবী ॥ বটে! তবে তো খুব গুণিন্ দেখছি!…আর কিছু দেখাতে পারো?

ভাণমতী ॥ (গান)

কেউটিয়া গোখ্‌রো মুখ থেকে নিক্‌লাই,
ইশারায় হয় মোর ফুল বিষ্টি !
নখের আয়নাতে দুনিয়াটা উজ্‌লাই,
মস্তরে তারা চাঁদ ছিষ্টি !

মাণ্ডবী ॥ তুমি নখ-দর্পণ জানো ?

ভাণমতী ॥ জানি কিছু-মিছু !

শ্রুতকীর্তি ॥ আচ্ছা দেখাও।

[একদিক দিয়ে সীতা, উর্মিলা ও অন্যদিক দিয়ে নকুলিকার প্রবেশ]

মাণ্ডবী ॥ এই যে, দিদি,···এস,···এখানে নখ-দর্পণ হচ্ছে।

সীতা ॥ (বলতে বলতে) ভাণমতীকে ডাকালে কে ? শ্রুতি বুঝি ? মেয়েদের সব কেরামতি এক দিনেই দেখে ফেলতে হয় বুঝি ?

মাণ্ডবী ॥ না কেউ ডাকায়-নি,···আপনি জুটেছে !

ভাণমতী ॥ তিন তুড়ি তিন ফুঁক !
দিই কুক কাঁপে বুক
ধুকপুক···ধুকপুক !
ঝকঝক করে নখ !
এই দেখ কার মুখ !

নকুলিকা ॥ দেখি ! দেখি ! বাঃ আশ্চর্য !···যুবরাজ রামচন্দ্র !

ভাণমতী ॥ দিই ফুঁক কাঁপে বুক !
ঝকঝক করে নখ !
চেয়ে দেখ কার মুখ !

সীতা ॥ আশ্চর্য···দেবর লক্ষ্মণ !···বাঃ, চোখ না পালটাতেই বদলে গেল ! বাঃ···এ কে ?···বাঃ—এ যে দেবর ভরত !

উর্মিলা ॥ আবার বদলাচ্ছে···এবার শ্রুতি ভালো ক'রে দেখ ··কে !

মাণ্ডবী ॥ এ বর···শ্রুতকীর্তির !

সখীর দল ॥ দেখোগা !···হ্যাঁগা···ওগো···অ ভাণমতী !···বলি থামো না,···সবাই মিলে···ওগো !

মাণ্ডবী ॥ আহা সবাই মিলে কি কলরব হচ্ছে?···আচ্ছা ভাণমতী, নখদর্পণে যাঁদের দেখালে, তাঁরা এখন···এই মহূর্তে কোথায় আছেন, কি করছেন, তা তোমার বিদ্যার বলে দেখাতে পারো?

ভাণমতী ॥ (হেসে) পারি কিছু কিছু!···আয়, আয় চলে আয়, কে যায়, কে যায়? পুবদিকে কে যায়?···ঐরাবতে ইন্দির যায়···হাজার চক্ষে কটমট চায়, চোখে দেখিস, না, নখে দেখিস?···নখেও দেখি, চোখেও দেখি!···ঠিক বলছিস তো?···হাঁ গুরু হাঁ,···ঠিক বলছি,···হাঁ তাই বল,··· আর, না দেখিস তো চশমা নে,···মনের ছবি আসমানে!···ইন্দির যায়! ইন্দির যায়! পুব দিকে আর কে যায়?···বঙ্গ মগধের রাজা যায়···

'মাথাতে যায় বরুণছত্র, সমুদ্র যায় সেনা।
মীণাঙ্ক যায় ঝাণ্ডা নিশান, কড়ির লেনা দেনা॥'

সকলে ॥ চমৎকার! চমৎকার!

ভাণমতী ॥ নাঃ পুব দিকে নেই! পশ্চিম দিকে কে যায়? মকরবাহন বরুণ যায়! অথই জলে দিক ভোলায়! সাঁতার জলে ফুল ছড়ায়। পাথার জলে জাল জড়ায়। আর কে যায়···সিন্ধু-সুরাটের রাজা যায়···

'ঘোড়ায় চ'ড়ে হেলায় ভরে,
সিংহ হাতী শিকার করে।
শূলের আগায় হূনের মাথা
শকের সকল দর্প হরে॥'

চোখে দেখছি না নখে দেখছি?···নখের কল্যাণে চোখেই দেখছি!

সকলে ॥ আশ্চর্য! আশ্চর্য!

ভাণমতী ॥ নাঃ, এদিকেও নেই!···দক্ষিণ দিকে কে যায়?···মহিষবাহন যম যায়! যমের ভাই নিয়ম যায়···যমদূতেরা চোখ পাকায়!···আর কে যায়, লঙ্কার রাজা রাবণ যায়···

'বড়বা-মুখ যজ্ঞকুণ্ডে
শত্রুমুণ্ড দেয় আহুতি।
দশটা মাথা, বিশটা কন্দী,
লাখের উপর নাতি পুতি॥'

সকলে ॥ এই রাবণ !···ভয়ংকর মূর্তি !···কি ভীষণ !

ভাণমতী ॥ নাঃ এদিকেও নেই !···বাকী আছে উত্তর,···উত্তর দাও উত্তর দিক ! যা' দেখাবে ঠিক ঠিক ! উত্তর দিকে কে যায় ?···মানষের কাঁধে কুবের যায়, সোনার গুঁড়ো উড়িয়ে যায় ! ··সোনার কুমড়ো গড়িয়ে যায় !···আর কে যায়, সিদ্ধপুরের রাজা যায়,···

'সোনাপোকার পেট টিপে যে
বার ক'রে নেয় সোনা ।
ধ্বজাতে যার সপ্তচামর
হাওয়ায় আনাগোনা ॥'

নাঃ, এদিকেও নেই !

সকলে ॥ (সভয়ে) সে কি !···

মাণ্ডবী ॥ সেকি ?···কোথাও নেই কি ? ভালো ক'রে দেখ···ভালো ক'রে দেখ !

ভাণমতী ॥ নখেও দেখলুম, চোখেও দেখলুম, লোকেও দেখলে, আমিও দেখলুম, সিদ্ধপুরে নেই, যম-কোটিতে নেই, লঙ্কায় নেই, কোথাও নেই !··· বায়ুকোণে বায়ু বললেন ওড়াই নি,···অগ্নিকোণে অগ্নি বললেন পোড়াই নি ; ঈশানের জট খালি, নৈঋর্তের কোল খালি !

শ্রুতকীর্তি ॥ কী বকছ···ভালো ক'রে দেখ—

ভাণমতী ॥ ফের তুড়ি ফের ফুঁক !
ধুকপুক—ধুকপুক ॥
নয়, তিন, তিন এক ।
দূরে নেই কাছে দেখ ॥

পায়ের তলায় চাতাল দেখি, চাতালের তলে পাতাল দেখি !

পাতালে দেখি বাসুকি ।
সুধার ভাণ্ড কোলে ক'রে
নাগ বাসুকি অসুখী ॥

হাজার মাথা নেড়ে বলছেন, হেথায় নেই, হেথায় নেই, যেথায় নেই !··· তবে কোথায় ?

নয়ে তিন তিনে এক,
মাথার উপর চেয়ে দেখ ;

মাথার উপর কি দেখি? অরুণ-রথে সূর্য্যিকে দেখি।—সূর্য্যি মামা, সূর্য্যি মামা, মাথা খাও! সূর্য্যি বংশের চুড়ো দেখাও?

সূর্য্যি বললেন ইশারায়,
ইশারায় দিশা পাই!
কি দেখিরে কি দেখি,

সূর্য্যি-বংশের চার-চুড়ো-চার ভাইকে দেখি!—সরযূর তীরে সব্বাইকে দেখি,—কিন্তু—

চার জনকেই ঘেরাও ক'রে,
দিচ্ছে হাঁকার বুনোর দল!
কোশল রাজ্য উঠছে কেঁপে,
এমনি বিষম কোলাহল।

মাণ্ডবী॥ ভাণমতী! এ তোমার কী ভাণ?

ভাণমতী॥ (নিজের মনে) চোখে দেখিস?…না নখে দেখিস?…গুরুর দয়ায় চোখেও দেখি, নখেও দেখি,…ঠিক দেখছিস? হাঁ গুরু—হাঁ! গুরু বলছেন, না দেখিস তো চশমা নে…মনের ছবি আস্‌মানে।

শ্রুতকীর্তি॥ একে ছেড়ো না!…নকুলিকা!…যবনী শাস্ত্রীকে ডাক,… এ বোধ হয়…বুনোদের চর,…শত্রুর চর, আমি আসছি…ছেড়ো না!…

ভাণমতী॥ (অট্টহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[হাসির ধমকে সকলে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল; সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, এই সুযোগে ভাণমতীর প্রস্থান।

[প্রাসাদ শিখর; শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরা-গুম্বজ; চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলস। শবরীর দেওয়া পায়রা বুকের ভিতর ক'রে নিয়ে শ্রুতকীর্তির প্রবেশ।]

শ্রুতকীর্তি॥ হাজার হাজার পাহাড়ী নগরের দিকে আসছে,…সরযূর জল তোলপাড় ক'রে আসছে,…কী সর্বনাশ!…নগরে সৈন্য নেই,…সেনাপতি যুবরাজদের সঙ্গে,…কী করব?…মন্ত্রী-পরিষদে খবর দেব? তারা কি খবর পায়নি?…চরেরা খবর দেয়নি?…কী করব?…সর্বনাশ হ'ল!…দুর্গ-রক্ষার

কোনো আয়োজন নেই,···কোনো বন্দোবস্ত নেই,···যবনী-শাস্ত্রীদের খবর দেব ?···দুর্গে চার-পাঁচ শো মেয়ে আছে···তাদের সবাইকে হাতিয়ার দেব ?··· দুর্গের দরজা বন্ধ ক'রে লড়াই করব ?···কিন্তু এঁদের চার ভাইকে যে পাহাড়ীরা ঘেরাও করেছে ! হয়তো বন্দী করেছে ;···যুদ্ধ করলে এঁদের যদি অনিষ্ট করে ? বর্বরগুলো যদি প্রাণের হানি ঘটায় ?···কী করব ?···আর ভাবতে পারি-নে···ভাববার সময় নেই···আংটি বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দিই !··· পায়রা ঠিক পৌঁছোবে তো ! পায়রা পরখ ক'রে নিইনি,···শবরী ঠকায় নি তো ?···ভাববার সময় নেই···

(পায়রা উড়িয়ে দিলেন)

যাচ্ছে···যাচ্ছে···ঐদিকেই যাচ্ছে !

(ব্যগ্রভাবে পায়রার গতি নিরীক্ষণ)

[নকুলিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ বাঃ ! সাবাস !···পায়রা পাঠানো হচ্ছে ?···এই বুঝি প্রতিজ্ঞা ?

শ্রুতকীর্তি ॥ থাম তুই নকুলিকা !···বিপদের সময় বিদ্রূপ ভালো লাগে না।

নকুলিকা ॥ বিপদ !···কিসের বিপদ !

শ্রুতকীর্তি ॥ দেখছিস-নে ?·····পঙ্গপালের মতন আসছে,·····নগর অরক্ষিত,···দেখছিস-নে ?

নকুলিকা ॥ তুমি পাগল !···সে ভাবনা তোমার কেন ? যারা রাজ্যের কর্ণধার, তারা কি ভাবছ, সত্যিই স্ত্রীলোকের হাতে দুর্গ সঁপে নিশ্চিন্ত আছে ?···কঞ্চুকের জায়গায় কঞ্চুলিকা বাহাল করেছে ?···তুমি ভুল বুঝেছ ;··· রজ্জুতে তোমার সর্পভ্রম হয়েছে ;···পাহাড়ীরা দুর্গ লুঠ করতে আসছে না,··· তুষার-প্লাবনে গরীবদের সর্বস্ব গেছে···তাই আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে ওরা দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে,···পথে যুবরাজদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,···তাঁদের কাছে দুঃখ জানাতে···আশ্রয় দেবেন ব'লে আশ্বাস দিয়ে, তাঁরাই ওদের সঙ্গে নিয়ে আসছেন। ঐ দেখো, সূর্যবংশের চার চূড়োর চারখানা রথের চূড়োতেই সগৌরবে নিশান উড়ছে।···

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই এত খবর কোথায় পেলি ?

মাথার উপর কি দেখি? অরুণ-রথে সূর্য্যিকে দেখি।—সূর্য্যি মামা, সূর্য্যি মামা, মাথা খাও! সূর্য্যি বংশের চূড়ো দেখাও?

সূর্য্যি বললেন ইশারায়,
ইশারায় দিশা পাই!
কি দেখিরে কি দেখি,

সূর্য্যি-বংশের চার-চূড়ো চার ভাইকে দেখি!—সরযূর তীরে সব্বাইকে দেখি,—কিন্তু—

চার জনকেই ঘেরাও ক'রে,
দিচ্ছে হাঁকার বুনোর দল!
কোশল রাজ্য উঠছে কেঁপে,
এমনি বিষম কোলাহল।

মাণ্ডবী॥ ভাণমতী! এ তোমার কী ভাণ?

ভাণমতী॥ (নিজের মনে) চোখে দেখিস?…না নখে দেখিস?…গুরুর দয়ায় চোখেও দেখি, নখেও দেখি,…ঠিক দেখছিস? হাঁ গুরু—হাঁ! গুরু বলছেন, না দেখিস তো চশমা নে…মনের ছবি আস্‌মানে।

শ্রুতকীর্তি॥ একে ছেড়ো না!…নকুলিকা!…যবনী শাস্ত্রীকে ডাক,… এ বোধ হয়…বুনোদের চর,…শত্রুর চর, আমি আসছি…ছেড়ো না!…

ভাণমতী॥ (অট্টহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[হাসির ধমকে সকলে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল; সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, এই সুযোগে ভাণমতীর প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রাসাদ শিখর; শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরা-গুম্বজ; চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলস। শবরীর দেওয়া পায়রা বুকের ভিতর ক'রে নিয়ে শ্রুতকীর্তির প্রবেশ।]

শ্রুতকীর্তি॥ হাজার হাজার পাহাড়ী নগরের দিকে আসছে,…সরযূর জল তোলপাড় ক'রে আসছে,…কী সর্বনাশ!…নগরে সৈন্য নেই,…সেনাপতি যুবরাজদের সঙ্গে,…কী করব?…মন্ত্রী-পরিষদে খবর দেব? তারা কি খবর পায়নি?…চরেরা খবর দেয়নি?…কী করব?…সর্বনাশ হ'ল!…দুর্গ-রক্ষার

কোনো আয়োজন নেই,···কোনো বন্দোবস্ত নেই,···যবনী-শাস্ত্রীদের খবর দেব ?···দুর্গে চার-পাঁচ শো মেয়ে আছে···তাদের সবাইকে হাতিয়ার দেব ?··· দুর্গের দরজা বন্ধ ক'রে লড়াই করব ?···কিন্তু এঁদের চার ভাইকে যে পাহাড়ীরা ঘেরাও করেছে ! হয়তো বন্দী করেছে ;···যুদ্ধ করলে এঁদের যদি অনিষ্ট করে ? বর্বরগুলো যদি প্রাণের হানি ঘটায় ?···কী করব ?···আর ভাবতে পারি-নে···ভাববার সময় নেই···আংটি বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দিই !··· পায়রা ঠিক পৌঁছোবে তো ! পায়রা পথ ক'রে নিইনি,···শবরী ঠকায় নি তো ?···ভাববার সময় নেই···

(পায়রা উড়িয়ে দিলেন)

যাচ্ছে···যাচ্ছে···ঐদিকেই যাচ্ছে !

(ব্যগ্রভাবে পায়রার গতি নিরীক্ষণ)

[নকুলিকার প্রবেশ]

নকুলিকা ॥ বাঃ ! সাবাস !···পায়রা পাঠানো হচ্ছে ?···এই বুঝি প্রতিজ্ঞা ?

শ্রুতকীর্তি ॥ থাম তুই নকুলিকা !···বিপদের সময় বিদ্রূপ ভালো লাগে না।

নকুলিকা ॥ বিপদ !···কিসের বিপদ !

শ্রুতকীর্তি ॥ দেখছিস-নে ?·····পঙ্গপালের মতন আসছে,·····নগর অরক্ষিত,···দেখছিস-নে ?

নকুলিকা ॥ তুমি পাগল !···সে ভাবনা তোমার কেন ? যারা রাজ্যের কর্ণধার, তারা কি ভাবছ, সত্যিই স্ত্রীলোকের হাতে দুর্গ সঁপে নিশ্চিন্ত আছে ?···কঞ্চুকের জায়গায় কঞ্চুলিকা বাহাল করেছে ?···তুমি ভুল বুঝেছ ;··· রজ্জুতে তোমার সর্পভ্রম হয়েছে ;···পাহাড়ীরা দুর্গ লুঠ করতে আসছে না,··· তুষার-প্লাবনে গরীবদের সর্বস্ব গেছে···তাই আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে ওরা দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে,···পথে যুবরাজদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,···তাঁদের কাছে দুঃখ জানাতে···আশ্রয় দেবেন ব'লে আশ্বাস দিয়ে, তাঁরাই ওদের সঙ্গে নিয়ে আসছেন। ঐ দেখো, সূর্যবংশের চার চূড়োর চারখানা রথের চূড়োতেই সগৌরবে নিশান উড়ছে।···

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই এত খবর কোথায় পেলি ?

নকুলিকা ॥ নগরের দরজায় পাহাড়ীর দঙ্গল দেখে পাছে নগরের লোক ভয় পায়, তাই তাদের আতঙ্ক নিবারণের জন্য মন্ত্রী-পরিষদ্ এইমাত্র ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন ;···সেই খবরই তোমায় দিতে আসছিলুম ; আসতে আসতে দেখি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ-যন্ত্রণা সইতে না পেরে···কাব্যের নায়িকার মতন, সখী আমাদের কপোত-দূত প্রেরণে ব্যস্ত !

শ্রুতকীর্তি ॥ আমি কি পায়রা পাঠাতুম্···ভাণমতীর ভড়ুঙে কথায় আর বর্বরদের ভিড় দেখে মনে হ'ল,···হয়তো ওরা বিপদে পড়েছে !···তা ওরা সোজাসুজি দুর্গে না এসে সরযূর তীরে কি করছে ?

নকুলিকা ॥ তোমরা না ডাকলে ওঁরা দুর্গে ফিরবেন না, বলেছিলেন, বোধ হয়, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা হচ্ছে।···এইবার আসবেন···তোমার কপোত-দূত পৌছলেই আসবেন।

শ্রুতকীর্তি ॥ হার হ'ল নকুলিকা, আমাদেরি হার হ'ল !

নকুলিকা ॥ (হেসে) হারটাকে যদি জিত ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি ?···কি উপহার দেবে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ (সাগ্রহে) যা চাস্ !

নকুলিকা ॥ আচ্ছা, এই কথা তো ?···তবে শোনো···একে একে সব বলি : প্রথম কথা, তোমার পায়রা যে রাজকুমারের কাছে ঠিক পৌছবে··· তা কি ক'রে তুমি জানলে ?···শবরী যদি ঠকিয়ে থাকে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ আমিও একটু আগে সে কথা ভাবছিলুম।

নকুলিকা ॥ ভেবে কি ঠাওরালে ?

শ্রুতকীর্তি ॥ কিছু নাঃ।

নকুলিকা ॥ পায়রা পৌছবে।···

শ্রুতকীর্তি ॥ বলিস্ কি ?···তা'হলে···

নকুলিকা ॥ পৌছবে,···তার কারণ, তুমি পায়রা যাঁর কাছে পাঠিয়েছ, শবরীর মারফতে পায়রাটি তিনিই পাঠিয়েছিলেন।···ও চিঠি-বাজ পায়রা, ঠিক পৌছবে !···আরও খবর আছে, ভাণমতীও তাঁরই চর।

শ্রুতকীর্তি ॥ সব বুঝেছি,···তা'হলে কৌশলে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছে, ছলে হার মানিয়েছে !

নকুলিকা ॥ অবলা ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে বলপ্রকাশ করেনি, কৌশলে হার মানিয়েছে,···তুমি এ পরাজয়কে পরাজয় বলে স্বীকার কর ?

শ্রুতকীর্তি ॥ না !

নকুলিকা ॥ (হাত পেতে) বকশিশ !···প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।···যা বলেছিলুম প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রুতকীর্তি ॥ তুই সব জানতিস ?

নকুলিকা ॥ না, ঠিক জানতুম না,···খানিকটা আন্দাজ···খানিকটা জানা···

শ্রুতকীর্তি ॥ অথচ আমায় বলিস নি,···উপহার দেব তোমায় ? উপহার দেব না প্রহার দেব···

[সীতা, উর্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ]

সীতা ॥ শ্রুতি, খবর পেয়েছিস ?

শ্রুতকীর্তি ॥ পেয়েছি।

মাণ্ডবী ॥ শুধু মন্ত্রী-পরিষদের ঘোষণা নয়, আরো খবর আছে···

সীতা ॥ মহাদেবী সুমিত্রার কাছে এইমাত্র পত্র এসেছে···সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রম থেকে নগরের দিকে যাত্রা করেছেন,···আজই রাত্রে পৌছবেন।

শ্রুতকীর্তি ॥ অ !

মাণ্ডবী ॥ অ !···খবরটায় পেট ভরল না···তবে দেখ,···সম্রাটের চিঠি··· (চিঠি দিলেন)···এইখানটা পড়ে দেখ···

শ্রুতকীর্তি ॥ (পাঠ) পরে মহর্ষি বলিলেন যে, যে পাপের জন্ম বাল্মীকি নিষাদকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপের ভাগী হইতে বসিয়াছি। সময় থাকিতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অতএব শ্রীমান্ ও শ্রীমতী বধূ-মাতাদের গ্রহশান্তির জন্ম পূর্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, মদন-মহোৎসবের রাত্রে তাহা রহিত করিতে চাই। বিরহ-দুঃখ উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর ভোগ করিয়াছেন। অলম্ অতি বিস্তরেণ। ফল হইবার হয় উহাতেই হইবে। ইতি···

মাণ্ডবী ॥ ওঃ ! একটা দিনের মধ্যে···কত কাণ্ড, কত বিভ্রাট,···কী তুলকাম !···কিন্তু শ্রুতি !···তুই মাঝে থেকে কি কাণ্ড করলি বল দেখি !

সীতা ॥ সে কথা আর তুলিস নি বোন,···

উর্মিলা ॥ যেতে দাও···যেতে দাও···ছেলেমানুষ···

নকুলিকা ॥ ও কিছু নয়,···একে এই দারুণ গরম···তার ওপর নতুন বিরহ,···তার ওপর ধূপের ধোঁয়া···একেবারে তেরস্পর্শ!···এতে মাথাটা একটু বেঠিক হবারই কথা। ঠিক থাকাই বিচিত্র।

সকলে ॥ ও কিছু নয়···ও কিছু নয়···

[নীচের তলায় শঙ্খ, ঝারি, চন্দন-মালা প্রভৃতি
নিয়ে সখীর দলের প্রবেশ]

সখীর দল ॥ (গান)

কিছু নয়, ধূপের ধোঁয়ায় হঠাৎ কেমন
মাথাটা গেছল ধ'রে!
মনে হয়, স্বপ্ন যেন চক্ষু মেলে
দেখেছি দিন দু'পরে!
কলহ দম্পতীর এই, দোষ কিছু নেই,
সবারি ঘটে এমন,
বিরহ বিদ্রোহী হয়, জ্বলে হৃদয়,
গোপনে গলে নয়ন!
খেয়ালে দেয়াল তুলে মনের ভুলে
মিছে রই মুখ ফিরায়ে,
শেষে ঠিক মেঘ কেটে যায়, চাঁদ হেসে চায়
নীরবে মন ভিজায়ে!
শারীতক পুরুষ নারী দুই দোঁহারি
আড়াআড়ি মোহের ঘোরে,
হয়ে রয় হাসির কথা দ্বন্দ্ব-ব্যথা
চোখের জলে মুক্তা কোরে॥

যবনিকা

প্রবন্ধ

ছন্দ-সরস্বতী

প্রথম প্রকাশ

[আদ্যাশ্রী-মূর্তি—মকরাঙ্গী ডিঙ্গা বাহন—গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি]

বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন। তার ফলে, বিকেলে, স্কুল থেকে এসেই, পিতামহের পরিত্যক্ত, অনেক দিনের পুরোনো, নীলরঙের একখানা বাতিল ব্যাঙ্ক-বই আমার নিজস্ব ডেস্ক থেকে বার করে, তার রুল্-টানা পাতায় সযত্নে লিখলুম—

"কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার॥"

এমনিধারা গোটা-আষ্টেক-দশ লাইন লিখতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

লেখবার এবং লেখা লাইনগুলো ফিরে ফিরে পড়বার ঝোঁকে এমনি মশগুল ছিলুম, যে, পিছনে যে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। হঠাৎ—"বাঃ! বেশ হয়েছে।"—শুনে চমকে ফিরে দেখি মাস্টারমশাই।

তিনি বললেন—"তুমি তো বেশ পদ্য লিখতে পারো, কোথাও ছন্দ-পতন হয়নি দেখছি।"

আমি বল্লুম—"হয়নি নাকি? ছন্দ-পতন কাকে বলে? ছন্দের নিয়মই বা কি? আমায় শিখিয়ে দেবেন?"

মাস্টারমশাই বললেন—"ছন্দের নিয়ম জানতে চাও? তা আমি তো ভাল জানিনে; তবে, মোটামুটি দু'চারটে যা জানা আছে তা বলছি। প্রথম কথা—ছন্দ নানারকম, এই ধর, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"পয়ার কি?"

তিনি বললেন—"পয়ার জান না? তুমি যে ছন্দে লিখেছ, একেই বলে পয়ার। এর প্রতি লাইনে চোদ্দটি অক্ষর থাকে, জোড়া-জোড়া লাইনে মিল। প্রতি পঙ্‌ক্তির অক্ষরগুলো সাজাবার একটু কায়দা আছে। পরে পরে এমনি সব কথা বসাতে হয় যাতে আট অক্ষর আর চোদ্দ অক্ষরের পর একটু দম নেওয়া যায়। সাধারণতঃ বিজোড়-হরফ-ওয়ালা শব্দের পর বিজোড় হরফ-ওয়ালা শব্দই বসাতে হয়,—জোড়ের পর জোড়; তা'তে রচনা শ্রুতিমধুর হয়।"

আমি বললুম—"তা'হলে তো আমার ভুল হয়েছে ; এই দেখুন, 'কি দিয়া পূজিব', 'কি' হ'ল বিজোড়, ওর পর বিজোড় বসানো উচিত, কিন্তু তা না বসিয়ে, জোড় বসানো হয়েছে,—'দিয়া' দু'অক্ষরের শব্দ।"

মাস্টারমশাই একটু মাথা চুলকে বললেন—"এখানে 'কি দিয়া' একসঙ্গে তিন অক্ষর ধরতে হবে, তারপর 'পূজিব' তিন অক্ষর, তা'হলে বিজোড়ের পর বিজোড়ই হ'ল। এক অক্ষরের শব্দ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পরেকার শব্দের সঙ্গে ওকে যোগ ক'রে নিয়ে, জোড় কি বিজোড় ঠিক করতে হয় ; তারপর—

"বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি॥
ঠাঁই বুঝে গুণ টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।
যুক্তাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড়॥"

এই গেল পয়ারের নিয়ম। ছন্দকার বলেন—

"আট-ছয় আট ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয়,
ছয়-ছয়-আট ত্রিপদীর।
লঘু ছন্দে এনে বসে দীর্ঘ আট-আট দশে,
রচনা করিবে তুমি ধীর॥"

ছন্দের কথা এইখানে শেষ ক'রে, অঙ্ক-ভূগোল-ব্যাকরণের নিত্য-কর্মপদ্ধতি আমাকে দিয়ে পালন করিয়ে মাস্টারমশাই যথাসময়ে বিদায় হলেন, কিন্তু ছন্দ-সরস্বতী ঘাড় থেকে নাবতে চাইলেন না। যতক্ষণ জেগে রইলুম ছন্দের কথাই মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল ; ঘুমিয়েও নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখলুম, যেন, কাগজের নৌকো তৈরী ক'রে ভাসাব ব'লে চৌবাচ্চার দিকে গিয়েছি, গিয়ে দেখি চৌবাচ্চা শুকনো খট্‌খটে! নিরাশ হয়ে জলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে, হঠাৎ দেখি সামনে একটি ছোট্ট নদী ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে চলেছে, নদীর—

"পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল জঞ্জাল।
জলময় শৈবাল,—পান্নার টাঁকশাল॥"

জলে নাব্‌বো বলে ঘাট খুঁজলুম, পেলুম না ; শেষে পায়ের দাগ খুঁজছি এমন সময় হঠাৎ কে বলে উঠলো—

"কাঅ নাবড়ি খান্টি মন কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল।"

মাথা তুলে এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। তারপর নদীর দিকে চোখ পড়তে, দেখলুম, যার আওয়াজ পাওয়া গেছে সেই লোকটি নিজের কায়াকে নৌকো করে নদী পার হয়ে চলেছে,—তার নৌকো কাঠেরও নয়, কাগজেরও নয়। ফের যেই নাবতে সুরু করেছি অম্‌নি কে বলে উঠল—

"কে সিরজিল গঙ্গা, কে সিরজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ আঙ্গুল শঙ্খ॥"

উদ্‌গ্রীব হয়ে সাম্‌নেকার বন-ধুতরোর ডালপালা সরিয়ে দেখি কে একজন হাঁটুজলে হেঁটে চলেছে। লোকটির একহাতে একটি শ্বেতপদ্মের কুঁড়ির মতন শাঁখ, আর এক-হাতে নৌকোর রশি ; গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখি একখানা নৌকো তার পিছনে ; লোকটা তারি গুণ টেনে চলেছে, আর মাঝে মাঝে হাতের শাঁখটার উপর চোখ রেখে থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে।

গাঙের ধার-দিয়ে ধার-দিয়ে নৌকোখানা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। নৌকোর চেহারা অনেকটা মকরের মতন ; মকরের পুচ্ছে চাঁদমালা, শুঁড়ে শোলার সিঁথী-মো'র। মাঝিরা দাঁড় বন্ধ রেখে গান ধরেছে—

"দহে পৈসু বড়ায়ি, তিরীর জীবন।
বৈরী হআঁ লাগিল এ রূপ জৌবন॥"

নৌকো আরো এগিয়ে এলে দেখলুম, মাঝি অনেক, কিন্তু আরোহী একজন মাত্র মেয়ে ; তার গলায় কুঁদফুলের মালা, হাতে শ্বেতপদ্ম, কানে বকফুলের কর্ণিকা। দেখেই কেমন মনে হ'ল, ইনিই গঙ্গাদেবী। যেমন মনে হওয়া অমনি পাঠশালের পোড়োদের মতন সুর ক'রে জোর গলায় বলতে সুরু করলুম—

"বন্দো মাতা সুরধুনী,
পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী!"

আমি গঙ্গাবন্দনার দ্বিতীয় পদটায় না পৌঁছতেই নৌকো আমার সামনে এসে পড়ল। দেখলুম দেবী হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তাঁর ডাকা সত্ত্বেও আমি জলে নাবতে ইতস্ততঃ করছি, দেখে, একজন মাঝি আরেক-জনকে সম্বোধন ক'রে বললে—"ওহে মুরারি ওঝার নাতি, ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস না ভাই! ও বোধ হয় জল দেখে ডরাচ্ছে।"

বল্‌বামাত্র মুরারি ওঝার নাতি এসে আমার হাত ধরে বললেন—"চলে এস, ভয় কি? হাঁটু জল।"

নৌকোয় পা দিতেই দেবী বললেন,—"তুমি আমার মকরাঙ্গী ডিঙ্গা দেখে, বোধ হয়, আমায় মকরবাহিনী গঙ্গা ঠাউরেছ। আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দ-সরস্বতী। আজ প্রায় হাজার বছর ধ'রে এমনি ক'রে এই ডিঙ্গায় চড়ে গৌড় বাংলার নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন জানো? মরালের সন্ধানে। অনেক দিন মানস-সরোবরে যাওয়া হয়নি তাই, এদের বললুম আমার বাহন খুঁজে দিতে, তা এরা আমায় এই মন্থরগতি মকরাঙ্গী ডিঙ্গা এনে দিলে।—

"ভালো আর নাহি লাগে সদা সর্বক্ষণ।
মকরাঙ্গী ডিঙ্গা চড়ি গাঙ্গিনী তরণ॥"

অন্যমনস্কভাবে পায়ে ক'রে একরাশ টগর আর শ্বেত-শিউলি জলে ফেলে দিয়ে দেবী বললেন—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

আমি বললুম—"যাব।"

কি আশ্চর্য! বলবা মাত্র দেখি নৌকো চলতে আরম্ভ করেছে! দুইধারে সপ্তপর্ণী আর পঞ্চমুখী জবার জঙ্গল নিরিবিলি সাত-পাতা আর পাঁচ-পাপড়ির পয়ার-পাঁচালি রচনায় ব্যস্ত। গাঙের জলে রাশ রাশ বিল্বপত্র ত্রিপদীর অর্ঘ্য বহন ক'রে চলেছে। মেয়েরা গা ধুয়ে কলসীতে জল ভরতে ভরতে গুন্‌-গুনিয়ে গাইছে—

"বাঁশী বাজাইল যবে কাহ্নে,
কোকিল কৈল পালি গানে;
আগুনি জ্বালিল, দেহে তখন, দক্ষিণ পবনে।"

তারা সব—

"উপর কর্ণে চাকি পরে নাম্বা কর্ণে ঢেঁড়ি।
তাহার মধ্যে শোভা করে হীরা মঙ্গল কড়ি॥"

তাদের—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।"

এমনি কত স্নানের ঘাট কত আঘাটা পিছনে ফেলে নৌকো চলেছে, একদিকে—

"মুকুলিল আম্ব-সাহারে।
মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে॥"

অন্যদিকে—

"মাদলের বাজনে রাউত নাচ্যা যায়।
কাহন কুঞ্জরে সাজে রাজরূপ রায়॥"

একদিকে ধনী বেনেদের মস্ত মস্ত বাড়ি, তার—

"পাষাণ দেয়াল ঘরের, লোহার কবাট।
হীরার বাঁধুনি, নাই পীপিড়ার বাট॥"

অন্যদিকে বিজন বন, সেখানে—

"খোঁড়া বাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তবু মোর তিনখানি পা।
গণ্ডার লুকায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্বত সমান হয় গা॥"

একদিকে মূর্চাবন্দী গড়, তার—

"বাহির মহলে বসেছে বীর
ধরণী উপরে ধনুক তীর।"

অন্যদিকে, লতা-বিতানে ঘেরা স্বপ্নপুরীর পইঠায়—

"সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।"

একদিকে স্তবের গুঞ্জন,—

"নমস্তে সর্বানী ঈশানী ইন্দ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।"

অন্যদিকে সুরের ক্রন্দন—

"কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনী, ভরিয়া ডালা।"

একদিকে পল্টন চলেছে—

"কত, নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর
কামান গরগর গাজে।"

অন্যদিকে—

"কপোত দুটি ডাকে, বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে ;
কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরু-লতা গহনে॥"

ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ আপনার মনে ছন্দময়ী বলে উঠলেন—

"বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা॥"

আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইতেই বললেন—"পেয়েছি, আমার মরালের সন্ধান পেয়েছি। সে যুক্ত-ডানা মুক্ত ক'রে আমার দিকে উড়ে আসছে।" হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর যেতেই বললেন—"তোমার হাতে ও কি? কাগজের নৌকো? ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও, এতক্ষণ ভাসাওনি কেন?···আচ্ছা তুমি কাগজের হাঁস তৈরী করতে জান?··· জান না?···বাড়ি থেকে কাগজ নিয়ে এস, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।"

কাগজের জন্যে বাড়ি ফেরাটা কিন্তু মোটেই মনঃপূত হ'ল না। প্রথমে পকেটটা হাতড়ে দেখলুম, তারপর কি ভেবে জানি না—বোধ হয় কাগজের বদলে তালপাত চলে, এই কথাটা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে—যেমন একটা

হেলে-পড়া তালগাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার জন্যে টান দেব অম্‌নি নৌকোখানা সরে গেল, আমি শূন্যে ঝুলতে লাগলুম। তারপর সমস্ত কেমন গুলিয়ে গেল। খালি মনে পড়ে নৌকোখানা অদৃশ্য হওয়া মাত্র, তার গুণ-টানা দড়িগুলো অজগরের মতন হয়ে আমার পায়ে যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, এবং সেই চীৎকারের চেষ্টাতেই ঘুমটাও ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি বন্ধ জানালার ছিদ্র দিয়ে তবক্‌-মোড়া মোটা মোটা গুণ-টানা দড়ির মতন সূর্যের কিরণ বিছানায় এসে পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রকাশ

[হংসাশ্রী-মূর্তি,—মঞ্জুমরাল বাহন— গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতি]

তিনটে বছর অক্ষর গুণে কেটে গেল। এই সময়ে একদিন ইস্কুলের পথে, আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের হাতে একখানি লাল মলাটের বই দেখলুম। জিজ্ঞেস করে জানলুম সেটি কবিতার বই। লোভ সামলে ইস্কুলেই যাওয়া গেল, কিন্তু মনটা পড়ে রইল সেই বইটার উপর। পণ্ডিতের ঘণ্টায় ছেলেরা যখন হট্টগোল জুড়ে দিয়েছিল আমি তখন টেবিলে মাথা দিয়ে সেই বইটার কথাই ভাবছিলুম। হঠাৎ দেখি ছন্দময়ী আমার সাম্‌নে উপস্থিত! এবার নতুন মূর্তিতে,—মরাল বাহনে, বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে। ভোরের আলোয় শুকতারার মতন তাঁর চোখ দুটি, আধ্‌-ফোটা বেলফুলের কুঁড়ির মতন তাঁর মুখখানি,—প্রসন্ন প্রফুল্ল অথচ প্রশান্ত। তাঁর হাতের পুস্তকটিকে প্রথমে টালি ব'লে ভুল করেছিলুম কিন্তু ক্রমশ জান্‌লুম, সে টালিও নয় পাটালিও নয়, সেটি হচ্ছে, আমার ইস্কুলের পথের মায়ামৃগ—সেই লাল মলাটের কাব্যগ্রন্থাবলী।

ছন্দময়ী বললেন—"দেখ, দেখ—

বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি যেন
রক্ত কমল ফুটে!
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে!"

ছন্দময়ী যখন আবৃত্তি করছিলেন, আমি তখন বইটার পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল—

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই?"

আমার অক্ষর-গোনা বিদ্যায় এই নতুন ছন্দের কোন হদিস না পেয়ে দেবীকে বললুম—"একি রকম পদ্য? এ যে পড়াই যায় না, অক্ষর সব কম-বেশী।"

ছন্দময়ী হেসে বললেন—"এই আমার মঞ্জু-ময়াল, এর কণ্ঠে কলধ্বনি, চরণে নৃত্য, গতিতে বৈচিত্র্য অথচ সুষমা। এতদিন বাঙালী ছন্দবিদ্যায় প্রায় ওড়িয়া [শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে] আর আসামীর সামিল ছিল, এই বারে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।"

আমি বললুম—"আমি কিন্তু এর বিশেষত্ব ধরতে পারলুম না।"

ছন্দময়ী বললেন—"পঙক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর, প্রকৃতপক্ষে যে এক-জোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐকার আর ঔকার হচ্ছে, স্বর-সংকর অর্থাৎ একজোড়া ভিন্নজাতের স্বরবর্ণের তৈরী—ইংরেজীতে যাকে বলে dipthong; এই দুটো কথা মনে রেখে, এই নতুন ছন্দ পড়তে কি লিখতে চেষ্টা করলে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। এখন আর বাংলা ভাষা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর, যুক্ত অক্ষরের হর্তুকি-বয়ড়া আর হসন্তের জুঁইফুল পচিয়ে মহাসুগন্ধি ত্রিফলার জল তৈরী করছে না; এখন এ 'বহতা পানী নির্মলা!'…আমার গাঙ্গিনী-তরণের মকরাঙ্গী ডিঙা সোনার তরীতে পরিণত হয়েছে। যা এতদিন সিংহল যাত্রায় বেরিয়ে ক্রমাগত খালের জলেই ঘুরে মরছিল, তা এবার গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতিতে পাড়ি দিয়ে সাগর-সংগম ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় অগ্রসর। সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে এখন এর উল্লাস। যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে হসন্ত-তকারের কলমীদাম দাঁড়ের আগায় ছেঁচতে ছেঁচতে, অন্যান্য হসন্ত-অক্ষরের শুশুক-পৃষ্ঠে

লগি লাগাবার দুশ্চেষ্টা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। বাংলা কথায় ওড়িয়া উচ্চারণ আর সহ্য হয় না। বাঙালী কবির—

"স্ত্রীর নাহি অন্য গতি সৃজিল বিধাতা।
মৈলেহ অধিক নাহি স্বামীর ব্যগ্রতা॥"

আর ওড়িয়া কবির—

"নির্মল' ক্রুষ্টিরে 'নাথ' মোকে ন চাঁহুছ।
বেনিভুজে আলিঙ্গন কিম্পা ন করুছ॥"

ছন্দ উভয়েরই সমান; তফাত এই যে, ওড়িয়া পয়ারটির 'নির্মল' 'নাথ' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে অকারান্ত; অপর পক্ষে বাংলা পয়ারটির 'অধিক' 'স্বামীর' প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর হসন্ত, অথচ শুধু ছন্দের খাতিরে অকারান্ত ক'রে পড়তে হয় অর্থাৎ ওড়িয়া-পন্থী হতে হয়। মাত্রা-বিচার-শূন্য অক্ষর-গোনা-ছন্দ, এখন, ওড়িয়া কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালী কবির দ্বারা আর ও কাজ চলবে না। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাত হয়ে গেছে। উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বদলছে যে পুরোনো ছন্দ পুরোনো কাপড়ের মতন ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জা নিবারণ হবে না, এখন—

"হরী হু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ
সূক্তেন বচসা নবেন।"

এখন দেবতার রথে নূতন ছন্দের তরুণ অশ্ব-যোজনা করতে হবে।

"স প্রত্নবন্ নব্যসে বিশ্ববার
সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ॥"

তা'হলে, দেবতাও সেই পূজা গ্রহণ ক'রে, ভাবের ভুবনে তোমাদের নূতন নূতন পথ খুলে দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দবিদ্যায় বাঙালী আর পাঠশালের পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন হয়েছে। সে আর আসামী কবির—

"দুধ পিউ দুধ পিউ বোলেরে যশোবা।
দুধ না খাঞা গোপাল কান্দে ওবাঁ ওবাঁ॥"

ছন্দে ভুলছে না; কারণ তার ছন্দ বুদ্ধি এখন বোধিসত্ত্ব, সে আর স্তনন্ধয় শিশু নয়। মঞ্জু-মরালের পায়ে সোনার মঞ্জীর বেজে উঠেছে। এ আর গাঙ্গিনী-

তরণ-পদ্ধতির মকরাঙ্গী ডিঙ্গা নয়; এতে 'ঙ্গ'-এর দু'-রকম বাটখারায় ওজন চলবে না। ছন্দ-ব্যাবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের ষাট তোলা, স্বরান্তের আশি এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—ছন্দেশ্বরীর টাটে ব'সে—তিনরকম বাটখারায় মিশিয়ে, ইচ্ছামত ওজন দিয়ে—চুক্তি-ভুক্তন্ করতে পারবেন না। ঐ দেখ শান্ত জলেও আজ ঢেউ উঠেছে—

"কলস ঘায়ে উর্মি টুটে,
রশ্মি-রাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর চুম্বি যায় কভু।"

আমি এইবার জিজ্ঞাসা করলুম—"ছন্দ পাটির অনুসারে এই পদটি কি পাটিয়ে দেখতে পারি?"

দেবী হেসে বললেন—"দেখো।"

পাটিয়ে এই রকম দাঁড়াল—

কলস ঘায়ে। উর্‌মি টুটে।
রশ্‌শি রাশি। চূর্‌ণি উঠে।

শান্‌ত বায়ু। প্রান্‌ত নীর। চুম্‌বি যায়। কভু।

ছন্দময়ী দেখে বললেন—"ঠিক হয়েছে, প্রতি পঙক্তি-পর্বে পাঁচ। এ আমার পাঁচ-কড়াই পাঁইজোর।"

এই ব'লে একটু চুপ করে থেকে, আবার আপনার মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বলতে লাগলেন—

"গঙ্গা-যমুনা-সংগম-জলে
মেলিয়া যুক্ত ডানা,
মঞ্জুমরাল বিহর হরষে
সংগীত গাও নানা।
ওগো বিচিত্র! বঙ্গবাণীর
নবীন বাহন তুমি,
মধুর তোমার কলগুঞ্জনে
মোহিত বঙ্গভূমি।"

ছন্দময়ী নীরব হলে আমি বললুম—"এই নতুন ছন্দে লিখতে চেষ্টা করব কি ?"

দেবী বললেন—"এখন না।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন ?"

তিনি বললেন—"খবর্দার ! ভয়ানক মার খাবে।"

ছন্দ-সরস্বতীর এই আকস্মিক রূঢ়তায় বিস্মিত হয়ে, তাঁর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে চোখ-দুটো একটু বেশী মাত্রায় বিস্ফারিত হয়ে গেল এবং দেখলুম—সে মুখ ছন্দ-সরস্বতীর নয়—আমাদের ক্লাসের পণ্ডিতমশাইয়ের। আমাকে তাঁর ঘণ্টায় ঘুমুতে দেখে তর্জনী তুলে প্রচণ্ড রকম তর্জন সুরু করেছেন।

তৃতীয় প্রকাশ

[চিত্রশ্রী-মূর্তি—মত্ত ময়ূর বাহন—ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতি]

মঞ্জু-মরালের নৃত্যের তালে কান তৈরি হওয়ার বছর পাঁচেক পরে আবার একদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে খেয়ালী মেয়ে ছন্দময়ী এসে হাজির। বাইরে তখন ঝর্ণার মতন ঝংকার করে বৃষ্টি ঝরছে, বাদলা হাওয়ায় জুঁইফুলের গন্ধ, জানলা দিয়ে এসে, আস্তে আস্তে চোখের উপর ঘুমের চামর ঢোলাচ্ছে। চোখ একেবারে ঝাম্‌রে আসছে। দেখতে দেখতে সেই জুঁইফুলের ঘুম-ঘুম-গন্ধ থিতিয়ে গিয়ে জুঁইফুলের মতন হাল্‌কা এবং জুঁইফুলেরই মতন ফুটফুটে একটি মেয়ের চেহারা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি জড়ানো আওয়াজে বললুম—"কে গা ?"

মেয়েটি বললে—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।'

"আজ এই তিন কন্যের তৃতীয় কন্যাটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ব'লে, এলুম।"

আমি সসম্ভ্রমে উঠে বসে বললুম—"দেবী, আজ তোমার এ আবার কি মূর্তি ?—

"ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ-শুভ্র-নীল-পদ্ম-বিভূষণা !
হংসারূঢ় ! ময়ূর-আসনা !"

আজকে মেঘাড়ম্বর দেখে মত্ত ময়ূরকে ধ'রে বুঝি বাহন করেছ ? হাতে নীলপদ্মের কুঁড়ির মতন ওটি কি ?"

ছন্দময়ী বেশ একটি নাম বললেন ; নামটি সংস্কৃত-গোছের, তার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাড়াতাড়ি সেই অপূর্ব-নাম-বিশিষ্ট নীলপদ্মটিকে হাতে নিতে গিয়ে দেখলুম, সেটি পদ্ম নয়, হাতের পোঁছার মতন ছোট্টো একটুখানি মেঘের টুকরো, তাতে বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে। আমি স্পর্শ করবার আগেই সে হাত-ফস্‌কে অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে, বিদ্যুৎ-হাসি হাসতে লাগল।

ছন্দময়ী বললেন—"ওকে অত সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না। ও হ'ল বাংলাভাষার প্রাণপাখী। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গরাণীর স্বরূপ-মূর্তি সে প্রত্যক্ষ করবে, বাংলা সংগীতের মর্মের কথা তার কাছে রূপ ধ'রে ফুটে উঠবে। দেখতে ছোট বটে, কিন্তু সহজে তুমি ওকে হাত-করতে পারবে না। আচ্ছা, রোসো, আমিই ওকে ধরে দিচ্ছি।"

এই ব'লে ছন্দময়ী বীণার তারে আঙুল সঞ্চালন করতে লাগলেন। বীণা ব'লে উঠল—

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।"

ছন্দটি নতুন অথচ চিরপরিচিত মনে হ'ল—বাড়ির মেয়েকে পূজোবাড়িতে দেখার মতন। তাড়াতাড়ি খড়ি পেতে ছন্দলিপি নিতে গেলুম, কিন্তু, একি !

তোমার আমার। মাঝখানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান সে।
শোনায় নির-। বধি।

—যুক্তাক্ষরের বালাই নেই, অথচ—ছয়, পাঁচ, পাঁচ, দুই ; পাঁচ, ছয়, পাঁচ, দুই—পঙ্‌ক্তি পর্বের কোনোটায় ছ' অক্ষর, কোনোটায় পাঁচ! এ কি-রকম ?

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে, আমার ছন্দলিপির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"এ ছন্দে হসন্ত বা ভাঙ্‌টা অক্ষর ছাঁটাই ক'রে, খালি স্বরান্ত বা গোটা অক্ষর গুণতে হয়। শব্দের যে-যে অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।"

আমি আবার ছন্দপাটি ধরলুম—

তোমার্ আমার্। মাঝ্‌খানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান্ সে।
শোনায়্ নির-। বধি।

পঙ্‌ক্তি পর্বগুলো পরীক্ষা ক'রে বললুম—"সকল পর্বেই চার পাচ্ছি ; খালি দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথম পর্বে পাচ্ছি পাঁচ। দু-ই-ত-টে-রে, তবেই পাঁচ হ'ল। এইখানে ছন্দ পতন হয়েছে।"

দেবী বললেন—"দাঁড়াও, অত শীগ্‌গির ছন্দ পতন হয়েছে ব'ল না। দুই-শব্দের ইকার পুরো উচ্চারণ হচ্ছে না, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল ; যদি স্বরবর্ণ ব'লে ওকে হসন্ত বলতে ইচ্ছা না হয়, ওকে আধ্‌লা বা ভাঙ্‌টা বলতে পার, পুরো, বা গোটা বলতে পার না। বাংলায় হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ বা হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঊ নেই ; আছে গোটা ই ; ভাঙ্‌টা ই্ ; গোটা উ, ভাঙ্‌টা উ্ ;—এমন কি গোটা ও ভাঙ্‌টা ও্ ; গোটা এ ভাঙ্‌টা এ্ পর্যন্ত আছে। 'বাইশ' আর 'বাইজী' শব্দ, 'বাউল' আর 'আউলে' শব্দ, 'বাঁওড়' আর 'কেওড়া' শব্দ, মনসামঙ্গলের 'গাএন' আর 'পাএ্‌রা' শব্দ, পরস্পর তুলনা ক'রে দেখলেই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে। এই সমস্ত জোড়া জোড়া উদাহরণের গোড়ার-গুলিতে গোটা এবং শেষেরগুলিতে ভাঙ্‌টা স্বর রয়েছে। বাংলায় সমস্ত স্বরই এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যঞ্জন তো স্বভাবতই আধ্‌লা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই পুরো হয়। কাজেই কি স্বর, কি ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণেরই এই দুই মূর্তি—গোটা আর ভাঙ্‌টা পুরো, আর আধ্‌লা।

আগেকার কবিরাও নিজেদের রচনায় বাংলার এই বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, ওই শোন, মুরারি ওঝার নাতি কি বলছেন—

"বঙ্গদেশে প্রমাদ হই্ল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই্লা গঙ্গাতীর॥"

তোমাদের ভাগবতকার কি বলছেন শোনো—

"হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি।
তাল্ খাইবারে শিশুর সঙ্গে চলে চক্রপাণি॥"

রামায়ণে আর ভাগবতে ভাঙ্টা স্বরের নমুনা দেখলে? এখন মহাভারত-কার কাশীদাস কি বলেন শোনো—

"নির্দ্রারিদ্র্য হই্ল ক্ষিতি পাই্য়া মহাদান।"

সেকালের উচ্চারণে হসন্ত বা ভাঙ্টা স্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই ছিল; নইলে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যে যাঁরা রাজপূজা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা পদে পদে এ সমস্ত ব্যাভার করে স্বেচ্ছায় নিজের রচনাকে বিড়ম্বিত করতেন না।"

আমি বললুম—"তা যেন হ'ল—স্বরের পুরো ও ঝুরো মূর্তি যেন স্বীকার করা গেল—কিন্তু এ ছন্দে লিখে আর বাহাদুরী কি? এ তো আমাদের পুরোনো তেরকেলে ছড়ার ছন্দ—নিরক্ষর চাষার ছন্দ, সাপের মন্তরের ছন্দ।"

ছন্দময়ী বললেন—"হ্যাঁ, এ নিরক্ষরের ছন্দ; সংস্কৃতের উল্কিতে এর চেহারা বদলে যায়নি; সেইজন্য ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে তাই বাইরে থেকেই বোঝা যায়, এর বুকের ভিতর—

"কত ঢেউয়ের টল্মলানি
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হতে
কত পাগল বান।"

"এর অর্ধোচ্চারিত বর্ণ-বিন্যাসে যেন রঙিন ছবির ছায়া-সুষমা; এর চোখের পাতায়, ঠোঁটের কোণে, এর ভাঁজে ভাঁজে, পরতে-পরতে—

"কত আভাস আসা-যাওয়ার
ঝরঝরাণি হঠাৎ হাওয়ার!"

"ওজন-বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্তি করবার দিকে যাঁদের বেশী ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ায়ের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্য-যুগের ফার্সীনবিশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখা-দেখি বাংলার 'যাইবে' 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দিষ্ট বা ভাঙটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনে সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি, পয়ায়ের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা প'ড়ে, একেবারে বেঁকেচুরে আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ বলতেও কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না। এ সমস্তই বাইরে থেকে ফার্সী অলংকারের একটা অবান্তর সূত্রের অনুসরণ করার ফল। 'জরূরৎ-ই-শা'য়্‌র' বা ছন্দের খাতিরে বয়েতের ভিতর প্রচুর পরিমাণে ই-কারের আমদানী করা ইরানী কবিদের একটা মহৎ ব্যায়রাম; যেমন—

"নিশস্ত্‌ (ই) সর্‌-। বর্‌ (ই) আহল্‌ (ই)।
করম্‌ ব মজ্‌-। লিস্‌ (ই) খাস্‌।
দো খাঁ' সে খাঁ'। দো সে খাঁ' খাস্ত্‌।
(ই) খাঁ' চে খাঁ। কে ন' খাস্ত্‌।"

"ফার্সীর নজীরে এমনি করে মধ্যযুগের ছন্দকারেরা হসন্ত-শব্দকে খেয়াল-মাফিক স্বরান্ত বা হসন্ত করেছেন। কালিদাসের প্রাকৃতে—

"কিং বি হিঅএ করিঅ মস্তেধ"

ইত্যাদি পদের 'করিঅ' (কৃত্বা) শব্দের ই-কার যখন ঢুলে ঢুলে ক্রমশঃ ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়ল, তখনো কেতাবী ভাষায় কাতুকাতু দিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু এত করা সত্ত্বেও ভাষার স্বরূপ চাপা পড়েনি।"

ছন্দময়ী নীরব হলে আমি বললুম—"তা পড়েনি। এখন বেশ বুঝতে পারছি পুরানো কবিদের ভিতর চৌদ্দর নিয়ম এত শিথিল কেন। আগে ভাবতুম এঁরা বুঝি মিশরী কবিদের মতন ছন্দসৌকুমার্য রক্ষার চেয়ে বক্তব্য বিষয়টা স্পষ্ট করবার দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেন—তা' অক্ষর যতই বেড়ে যাক না কেন।

যেমন—

"ধেয়ানত হাড়ি গুরু ধেয়ান্ করি চায়।
ধেয়ানর্ মাঝত্ ষোল কাওন্ কড়ি ঝোলায়্ লাগাল্ পায়।"

"সেকালে গুন্তির হিসেব চলন থাকলে শেষের পঙ্‌ক্তিতে আটের ফারাক দাঁড়ায়; শব্দ-পাপড়ি বা syllable-এর হিসেবে তিনের ফারাক হয়। কাজেই শেষের নিয়মই প্রাচীনকালে বলবান ছিল, বলা সংগত। নইলে বলতে হয় বাঙালীরা ছন্দবিদ্যায় মিশরীদের নিকট জ্ঞাতি বা ভক্ত শিষ্য। কৃত্তিবাসও লিখেছেন—

"তারা মোকে নিষেধিল বিবিধ বিধানে।
তোমা হেন ধার্মিক্ চণ্ডালে প্রতীত্ গেলাঙ্ কেনে॥"

তারপর শূন্যপুরাণের—

"কুথা হইতে আইলেক্ কুর্ম কুথা তোহ্মার ঘর।"

কিংবা মানিকচন্দ্রের গানের—

"যখন আসিবে যম্ ভাড়ুয়া দৈত্য দানব হঞা।
তৈল পাঠের খাড়া দিঞা ফেলামু কাটিঞা॥"

অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের—

"তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি॥"

প্রভৃতি শত শত পদ, যা আমাদের পণ্ডিতমশাইয়া এতদিন প্রাচীন কবিদের ছন্দ-মূর্খতার উদাহরণ ব'লে ঘোষণা করে এসেছেন, তা' এই ছড়ার ছন্দের বা ঝর্ণা-ঝামরপদ্ধতির নিয়মে, syllable বা শব্দ-পাপড়ির সংখ্যার হিসাবে প্রায় নিখুঁৎ। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ভাষার যা ধাতুগত,—যা ছেলে-ভোলানো গানে, মেয়েলী ছড়ায়, ব্রতকথায়; যা সাপের ওঝা, ভূতের ওঝা, ডাইনের ওঝার বোলচালে; যা বাড়িবন্ধ, শরীরবন্ধ, জলপড়া, তেলপড়া, সর্ষেপড়ার মন্ত্রে; এক কথায় বাংলার অথর্ববেদে যা আত্মপ্রকাশ করেছে; অন্যদিকে যা পাঁচালি-তর্জায় ঝুমুরে-কবিতে যা ভেটেলের সুরে, বাউলের গানে, বৈরাগী-ফকিরের সাধন-সংগীতে, যা রামপ্রসাদের রচনায়, এক-কথায় বঙ্গের গীতিসাহিত্যে বা বাঙালীর সামবেদে,

নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তা' একদিন বাংলার সত্যিকার ঋগ্বেদে অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যেও সুব্যক্ত ছিল। সাক্ষী প্রাচীন কৃত্তিবাস (বটতলার নয়), সাক্ষী গোবিন্দচন্দ্রের গান, সাক্ষী শূন্যপুরাণ। মক্তবের মুন্সীদের দুর্মুশ-দলনে বা টোলের পণ্ডিতদের গোময়লেপনে তা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য এই, যে, এদিকে এতদিন কারো নজর পড়েনি!"

ছন্দময়ী হেসে বললেন—"লম্বকর্ণদের ছন্দের কান নেই, তারা ছন্দের ভিতরকার সুর ধরবে কি ক'রে? বহুদিন পরে বাংলায় একজন সত্যিকার কবিকে দেখতে পেয়েছি যে জগতের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—

'বেদানাম মাতরম পশ্য
মৎস্থম্ দেবীম্ সরস্বতীম্।'

তাকে পেয়ে আমার অনেক ক্ষোভ মিটেছে, অনেকদিনের অনেক আরজু সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বাংলার ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে এ পর্যন্ত অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করেছেন,—মিথিলার অনুকরণে, ঢেণ্ঢন, সরহ, কাহ্নপাদ, নসীর মামুদ, রায় বসন্ত, গোবিন্দদাস বাংলার ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘের কৌলীন্য প্রবর্তনের চেষ্টা পেয়েছেন। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াতের ভঙ্গীর হুবহু নকল করেছেন. কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দ সামনে পড়লেই, ভঙ্গ না দিন, পাশ কাটিয়েছেন। গুপ্তকবি 'আয় রোদ্দুর হেনে' বা 'ধিন-তা-ধিনা' প্রভৃতি ছন্দে খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধ'রে ফেলেছেন, বলা যেতে পারে; কিন্তু বেশী দূর এগোন নি। এঁর 'স্বেচ্ছাছন্দ' এখনকার 'মুক্তবন্ধ' বা Vers Libre-এরই অগ্রদূত। তারপর মধুসূদনের ব্রাত্যশ্রী-সম্পন্ন অমিত্রাক্ষর, তাতে গ্রীকছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ ধরা না পড়লেও, বাংলার পক্ষে বেশ একটু নতুন জিনিস। রমাই পণ্ডিতের—

"জমরাজা পড়িল ফাঁপরে
আসিয়া জমের মা জমকে দিল গালি
পুত্র আজ করিলি রে সর্বনাশ।"

প্রভৃতি হিব্রু-বৃত্তগন্ধী রচনাকে যদি অমিত্রাক্ষরই ধরা যায়, তা হ'লেও মেঘনাদের ছন্দ-বিশিষ্টতা কমে না। তারপর যিনি যাই করেছেন, তাতে আমাকে ক্রমাগতই বলতে হয়েছে—

"তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে।"

"এইযুগে আমি যখনই বীণার জন্যে হাত বাড়িয়েছি তখন হয় পেয়েছি শিঙে নয় পেয়েছি রামশিঙে। মনের কষ্টে দিন কেটেছে। আমার দুঃখে বোধ হয় বিধাতার টনক নড়েছে, তাই পেয়েছি এর সুরবাহার। ইরানীরা বলে এক বুলবুলে বসন্ত-সম্ভব হয় না, কিন্তু বাংলার শুভাদৃষ্টক্রমে এক বুলবুলেই এখানে ঋতুরাজ মূর্তিমান হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের মুক্তবেণীর গঙ্গাতীরে একজন মাত্র কবির প্রতিভাবলে, আজ ছন্দের তিন ধারা বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে যুক্তবেণীর সৃষ্টি করেছে। আজ—

"আকাশ জুড়ে ঢল নেমেছে, সূর্য্যি ঢলেছে,
চাঁচর চুলে জলের গুঁড়ি,—মুক্তো ফলেছে।
চাউনিতে কার আওয়াজ দিয়ে বিজুলি চম্‌কায়,
হাওয়ায় উড়ে কদম ফুলের কেশর লাগে গায়।
আলগোছে যা' গায় লাগে তা' গুণছে বল কে?
নৃত্য করে মত্ত ময়ূর বিদ্যুতালোকে।
সুপ্ত বীজের গোপন কথা অঙ্কুরে আজ ছায়,
ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতিতে ময়ূর নেচে যায়॥"

ছন্দময়ীর ছন্দ-গুঞ্জন শেষ হলে আমি বললুম—"আচ্ছা, এই অক্ষরগোনা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাগড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?"

ছন্দময়ী হেসে বললেন—"আমার নবীন বাহন মত্ত ময়ূর আমাকে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত করেছে, কাজেই আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। তামিল-আলংকারিক অমৃত-সাগরন্‌কে স্মরণ করছি, সেই এসে যা হয় বলবে।"

এই ব'লে ছন্দময়ী অন্তর্হিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজলধরকান্তি একজন পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে আমায় মধুর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি জানতে চাও?"

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলুম।

তিনি বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—"অলবড়ি।...অলবড়ি কাকে বলে জানো? যে সমস্ত পদ্য-পঙ্‌ক্তিতে চারটি ক'রে পঙ্‌ক্তি-পর্ব থাকে তাকে বলে

অলবড়ি! তোমাদের পয়ারেও তাই, লাচাড়ীতেও তাই; ছড়ার ছন্দেও তাই, পুঁথির ছন্দেও তাই; কাজেই মূলে দুইই এক। অলবড়ি শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে লাচাড়ী।"

হঠাৎ অমৃত-সাগরনের কথায় বাধা দিয়ে কে-একজন বলে উঠলেন—"কি হে? ভুল শেখাচ্ছ কেন?"

অমৃত-সাগরন বললেন—"কে হে! সৈফী মিঞা যে! তুমি এসে জুটেছ? তুমি কি বলতে চাও?"

কপালে রেশমী রুমাল বুলিয়ে মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন—"বলতে চাই যে লাচাড়ী শব্দ ফার্সী লাচার শব্দ থেকে এসেছে। লাচারেরা যে ছন্দে গান গেয়ে বা ছড়া ব'লে ভিক্ষে করে বেড়ায়, সেই হচ্ছে লাচাড়ী ছন্দ। যেমন লাচাড়ী তোড়ি মানে লাচার বা ভিখিরীদের মুখে মুখে তোড়ি রাগিণীর যে নতুন চেহারা দাঁড়িয়েছে, সেইটি। আর পয়ার হ'ল আরবী বয়েৎ শব্দের অপভ্রংশ।"

অমৃত-সাগরন অদ্ভুতভাবে ঘাড় নাড়লেন। সৈফী মিঞা বিরক্তির স্বরে বললেন—"কি? 'হাঁ' বলছ না 'না' বলছ? তোমার ও মাদ্রাজী ঘাড় নাড়ার কোনো হদিস পাইনে, ব্রাদার।"

"না বলছি,—নিশ্চয়ই না। বয়েৎ থেকে পয়ার! তুমি হাসালে দেখছি। পয়ার হয়েছে তামিল ছন্দ 'পারণী' থেকে।"

"হুঁঃ! তা'হলে আসামীরাও বলতে পারে যে লাচাড়ী হয়েছে তাদের লেচার শব্দ থেকে—যার মানে—চলার ঝোঁকে হাতের ঝাঁকি।"

"কি রকম?"

"রকম আবার কি?"

"বাংলায় তামিল আগে? না তুর্কী আগে?"

"বাংলায় ফার্সী কথা বেশী? না দ্রবিড় কথা বেশী?"

"দ্রবিড়!"

"কি রকম?"

"যেমন বহুবচনের 'গুলো' শব্দ; আমাদের 'মরম্-গল' বাংলায় হয়েছে 'গাছগুলো'।"

"বেশ ; কিন্তু অপর দিকটাও দেখছ না কেন ? বাংলার ক্রিয়ার ভিতরেও যে মুসলমানী ঢুকেছে,—আমাদের 'কম' থেকে যে কমানো হয়েছে তা জানো ? তোমাদের বেশী প্রভাব, না আমাদের ?"

"আমাদের !"

"আমাদের !"

"নিশ্চয়ই না !"

"নিশ্চয় ।"

তুমুল তর্কে তন্দ্রা ভেঙে গেল ! তখনও গোলমাল চলছে ; তর্কটা এখন কিন্তু ঘরের বাইরে। তাড়াতাড়ি উঠে জানলার ধারে গিয়ে দেখি রাস্তায় একজন কেয়াফুলওয়ালা কুল্‌ফি বরফ খেয়ে পয়সার বদলে বরফওয়ালাকে ফুল নিতে বলেছে, তারই গোলমাল।

চতুর্থ প্রকাশ

[দৃপ্তশ্রী-মূর্তি—গগন-গরুড় বাহন—বিমান-বিহার-পদ্ধতি]

কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এবং বাংলা-ছন্দের ত্রয়ী মোটামুটি আয়ত্ত করে একদিন কবিগুরুর মন্দিরে উপস্থিত হলুম। এবং প্রণাম করে আমার যৎসামান্য ছন্দের অর্ঘ্য তাঁর পায়ের কাছে রেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলুম।

কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন কথায় কথায় কবিগুরু বললেন—

"বাংলায় ছন্দবন্ধের অভাব নেই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ (rhythm) জিনিসটা তেমন ফুটতে পেলে না।"

আমি বললুম—"কেন আপনার—

'পৌষ প্রখর শীতে জর্জর
ঝিল্লি-মুখর রাতি।'

প্রভৃতি কবিতা তো ছন্দস্পন্দের চমৎকার উদাহরণ।"

কবি বললেন—"কিন্তু, আনাড়ির হাতে ঐ ছন্দই এমন ছন্ন-ছাড়া মূর্তিতে দেখা দেয় যে ওকে আর চিনবার জো থাকে না। বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘের তেমন স্পষ্ট প্রভেদ না থাকায়, সংস্কৃতের মতন বিচিত্র ধ্বনির পর্যায়-বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত

হতে পারছে না। কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটারের নকল করলে ঠিক চলবে না। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আনতে হবে। হরফের মাথায় খুশি-মতন ঘন ঘন কষি টেনে কাজ সারলে চলবে না। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না। আমার বিশ্বাস তুমি ঠিক পারবে।"

কুণ্ঠিত হয়ে বললুম—"ছন্দে নূতনত্ব বিধানের চেষ্টা আপনি ছাড়া আর সকলের পক্ষেই অনধিকার চর্চা।"

কবি বললেন—"ওই দেখ, তোমাদের এক কথা। আমি চিরকালই এই করব? খালি আমাকেই খাটাবে? তোমরা একটু খাটবে না? সে হচ্ছে না। তোমাকেই এ করতে হবে। মন্দাক্রান্তা নিয়ে সুরু কর।...করে দেখতে পাব, বল। কুড়েমি করলে চলবে না,...পরশু পারবে?...হয়ে উঠবে না।... আচ্ছা এক হপ্তা সময় রইল।"

আমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম।

বাড়ি এসে রাত্রে ছন্দময়ীর শরণাপন্ন হওয়া গেল।

ছন্দময়ী প্রসন্নমুখে বললেন—"তার আর কি? বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই বা থাকল? যুক্তাক্ষর তো আছে।—

'সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ-সংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থ বিকল্পেন চ ॥'

—যুক্তাক্ষরের পর্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি বৈচিত্র্যের গতিক্রম প্রবর্তিত কর।"

আমি বললুম—"তা'হলে ক্রমাগত সংস্কৃত অভিধান থেকে দুর্বোধ দুরুচ্চার্য শব্দের আমদানী করতে হবে; নইলে, বাংলায় সংযুক্তবহুল শব্দ তো আর বেশী নেই, কি করে কাজ চলবে?"

ছন্দময়ী বললেন—"পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমকে যুক্তাক্ষর নেই, অথচ তাতে কি করে ছন্দস্পন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল?...হ'ল মোটামুটি দু'রকমে:—দীর্ঘ স্বরের সাহায্যে, আর অক্ষর-সংঘাতের বিন্যাসে। অর্ধোচ্চারিত বা আল্‌গোছ অক্ষরের পর, পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বসলেই অক্ষর-সংঘাত হয়; সেই অক্ষর-সংঘাতের অব্যবহিতপূর্বে যে অক্ষর তাকে পার্শী, আরবী, গ্রীক,

রোমক ছন্দ-শাস্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয়, কেন না গায়ে গা জুড়ে না দিলেও, বস্তুত ও যুক্তাক্ষরেরই সামিল। কাজেই—'দীহো সংযুক্তপরো।'

—এই নিয়ম এখানেও অবাধে খাটে। বাংলায় কি স্বর, কি ব্যঞ্জন, স্থল-বিশেষে দুইই আল্‌গোছ বা গোছালো,—ভাঙ্‌টা বা গোটা,—ঝুরো বা পুরো হয়ে থাকে। কাজেই অক্ষর-সংঘাতের পর্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে—শুধু সংস্কৃত, তামিল, পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় মধুর-গম্ভীর ভাষায় ছন্দস্পন্দ আহরণ ক'রে বাংলা কবিতাকে অলংকৃত করা যেতে পারে। বাংলায় স্বভাব-গুরু নাই থাকল? অবস্থানের গুণে গুরু ঢের মিলবে। হিন্দীর—

'রাজত রাজ-সমাজ-মহঁ,
কোসল-রাজ-কিসোর।
সুন্দর সামল গোর তনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥'

কিংবা, মারাঠির—

'ঝালা যযাতি কবিচা জামাতা,
তীচ সৎকথা পরিসা।
যা চরিতামৃত পানেঁ, যা লোকাঁ সর্ব,
রসিক হো হরিসা॥'

অথবা গুজরাটির—

'রুখমনী তে কহে ছে তাতনে
শিশুপাল বর হুঁ নহি বরুঁ।
জাদব-বংশী ছে কৃষ্ণজী,
তেও বাঁহে হু ধরু॥'

প্রভৃতি পদে, দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার-ভাঁটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না। না হোক, যতটা হয় তাই বা ছাড়বে কেন? তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাও—মেঘের সংঘাতে যে গর্জন, যে বিদ্যুৎ অক্ষর-সংঘাতের সাহায্যে তারি সৃষ্টি কর!"

আমি ছন্দময়ীর ইঙ্গিতে যন্ত্র-চালিতের মতন লিখলুম—

"ভরপুর অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।
বক্ষের পঞ্জর। কাঁপিছে কলেবর।
চক্ষে দুঃখের। নীলাঞ্জন॥"

দেবী চোখ বুলিয়ে বললেন—"এই তো! ঠিক হয়েছে, মন্দাক্রান্তা।—

'কশ্চিৎ কান্তা। বিরহ-গুরুণা।
স্বাধিকার-। প্রমত্তঃ।
ভরপুর অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।'

ঠিক হয়েছে। বাংলার ধাত বজায় আছে, অথচ মন্দাক্রান্তা হয়েছে। আচ্ছা আরেকটা চেষ্টা কর, মালিনী—এই তার ছাঁদ —

'অসিত-গিরি-সমংস্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রম্।
সুর-তরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্বী'।"

আমি লিখলুম—

"উড়ে চলে গেছে বুলবুল, শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জন,
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।"

দেবী বললেন—"আচ্ছা এইবার সাতাশের ঘরানা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। ছাঁদ এই—

'হই হি। ভবতি। দণ্ডকা-। রণ্যদে-।
শে স্থিতিঃ।
পুণ্যভা-। জাং মুনী-। নাং মনো-। হারিণি।'

আমি লিখলুম—

"গগনে গগনে। নীল নিবিড়।
ভিড়্ মেঘের। ভিড় গো ভিড়।
শোন্ তাদের। শব্দ ভীম।
ডম্বরুর। দুন্দুভির॥"

দেবী বললেন—" 'পঞ্চচামর'—শিবতাণ্ডব স্তোত্রের ছন্দ।—
'গতিক্রম প্রবর্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডবঃ শিবঃ'।"

আমি বললুম—

"মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল।
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল॥"

দেবী বললেন—"এইবার বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী।
—'তৎস-। বিতুর-। বরেণ-। ইঅম্'।"

আমি বললুম—

"সূর্য মহান্ তাহার অধিক
সত্য মহান্, মহান্ বিবেক।
আদিম্ এ সাম্ প্রধান এ ঋক্!
মৃত্যু মহান্ তাহার অধিক
মুখ্য মহান্ প্রাণের নিষেক,
অভয় এ সাম্, অশোক এ ঋক্।"

ছন্দময়ী বললেন—"বাল্মীকির অনুষ্টুপ।—
'মা নিষাদ। প্রতিষ্ঠাং ত্ব-।
মগমঃ শা-। শ্বতী সমা'।"

আমি বললুম—

"আর্ত সংসার ব্যথায় কাঁদছে,
ওরে শোন্ তুই যে ন'স বধির;
ধৃষ্ট ধায় ধূমকেতুর দম্ভে,
বাড়ে কল্লোল রুধির নদীর!
নিব্‌ছে উৎসব মানুষ ডুবছে,
প্রাণে সংশয় দু'পায় শিকল,
অগ্নি-খড়্গের পিশাচ-হাস্যে
সারা সৃষ্টির মরম বিকল।

অন্ধ স্বার্থের রথের চক্রে
ওঠে ঘর্ঘর নিনাদ নিদান,
যুদ্ধ দুনিয়ার চরম যুক্তি !
কাটে সাত চোর বিধির বিধান।
উগ্র আত্মম্ভরীর ডঙ্কা
বাজে ওই শোন্ কপাল-মালায় !
চক্ষে গহ্বর বিকট মৃত্যু
সেজে পল্‌টন আগুন জ্বালায় !
নষ্ট ঘর পর সুহৃৎ শত্রু
ভেঙে যায় সব লুটায় ধূলায়,
কষ্ট বিশ্বের গভীর মর্মে
কাঁদে ক্রৌঞ্চীর হিয়ার কুলায়।
বিঁধল বাণ কার সাথীর বক্ষ
ধোঁয়া-শেষ নীড় মশাল-শিখায় !
রিক্ত রাজ্যের মালিক মস্ত
কিবা সুখ তোর রাজার টীকায় ?
শুষ্ক অন্তর হৃদয় শূন্য
কি বাজাও বুক অহং-মায়ায় ?
ভস্ম-নেত্রের নিজের দৃষ্টি,
জেন, দগ্ধায় নিজের কায়ায় ॥"

দেবী বললেন—"তোটক !—ছাঁদ জানো তো ?—
'রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্'।"

আমি বললুম—
"ওকি, ফুটল গো ফুটল দিগন্ত ভরি !
কারা, জাগল ধূসর ধূলি শয্যা'পরি !
একি ! ভাণ্ডারে লুট ক'রে ধন লোটানো !
একি ! চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো !"

দেবী ব'লে উঠলেন—"এই তো! এই তো!—

'এ যে, চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা,
এ যে, মূর্ছনা-ময় গীতি মৌনে সাধা।'

ঠিক হয়েছে, আমি এই ছন্দকে আমার বাহন করে নেব। এ আমার গুরু-লঘু-সমাজে অসংকোচ বিচরণে—কুণ্ঠাহীন বিমান-বিহারে—সহায় হবে, এর নাম রইল 'গগন-গরুড়'।"

আমি বললুম—"না, দেবী, তার চেয়ে নাম রাখুন—পুতুলনাচের জটাইপক্ষী।"

ছন্দময়ী বললেন—"কেন?"

আমি বললুম—"এখনো যথেষ্ট জড়তা রয়েছে।"

দেবী বললেন—"ও কিছু নয়, ও ঠিক হয়ে যাবে। আর ওকে কি জড়তা বলে?

'অট্টালক পরম রম্য শৃঙ্গাটক বিবদ হর্ম্য
দেব-দ্রুম দিব্য-কুসুম দেউল ফুলবাটি।'

কিংবা—

'তৃষার্ত সম্প্রাপ্ত সুধাব্ধি যত্নে
সমীক্ষি' সম্পূজ্য পদাব্জ রত্নে।
সুতৃপ্ত মচ্চিত্ত সুশান্ত অদ্য
সুধন্য সম্যক চতুরাস্য সদ্য॥'

প্রভৃতি পদ যখন সর্বাঙ্গে ভূর্জপত্রের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গুটিগুটি বাংলার সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, তখন তোমার আবার ভাবনা? তুমি মিছে ভয় করো না, এ পুতুলনাচের জটাইপক্ষী মোটেই নয়। এ গগন-গরুড়। এতকাল বিমান-বিহারের প্রয়োজন হলেই আমাকে মিথিলা থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া ভাড়া করে আনতে হ'ত; নয়ত কৌশাম্বী রাজের চিড়িয়াখানা থেকে তাঁর হস্তীবিম্ব পাখীটি ধার ক'রে আনতুম, তাতেও লঘু-গুরুর গোল ঠিক মিটত না, প্রমাণ—

'নানা তরুবর মৌলিল রে
গঅনত লাগেলী ডালি

একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই
কর্ণ-কুণ্ডল বজ্রধারী ॥'

কিংবা—

'চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট।
মন্দির বাহির কঠিন কপাট ॥'

"এই দুই পদের 'লাগেলী'র 'গে' এবং 'চলইতে'র 'তে' গুরু হলেও লঘুই পড়তে হয়েছে। বিমান-বিহার কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠের নাগাল পায়নি। ভারতচন্দ্র এ পদ্ধতিতে অনেকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অবশ্য খাঁটি বাংলা শব্দ এক রকম বর্জন করেই। যেমন—

'জয়, বিষাক্ত কণ্ঠক কৃতান্ত-বঞ্চক
ত্রিশূল-ধারক হস্তাম্বর
জয়, পিণাক-পণ্ডিত পিশাচ-মণ্ডিত
বিভূতি-ভূষিত কলেবর।'

এ শ্লোকে ক্রিয়া বা সর্বনাম একটিও নেই, অর্থাৎ যেখানে বাংলার বাংলাত্ব তার চিহ্নমাত্রও রাখা হয়নি। বুঝেছ?···এখন, তর্ক থাক। চল গগন-গরুড়ে আরোহণ করে ভুবন পর্যটন করে আসা যাক।"

এই বলে সস্নেহে আমার হাত ধরে ছন্দময়ী অন্তরীক্ষে উঠলেন। আমি সানন্দে বলে উঠলুম—"চমৎকার! চমৎকার!"

ছন্দময়ী তখন আপনার মনে বলেছেন—

"উধাও! উধাও! গগন-গরুড়!
বিমান-বিহার তারায় তারায়,
সেতার, কানুন, সারং, লায়র্
বীণার আওয়াজ হাওয়ায় হারায়।
আকাশ-নদীর লহর লীলায়
যে সুর সে আজ বীণায় আমার,
আমার বীণায় মেঘের গমক
অলখ চমক পুলক-হাওয়ার।

দ্বাদশ রাশির দ্বারের ধূলায়
রবির শশীর যে সুর হারা,—
আচোট আলোর কিশোর যে সুর
আমার যে আজ সবাই তারা।"

ছন্দময়ী গান থামিয়ে বললেন—"দেখ, দেখ, পায়ের নীচে তালীবন ছন্দে শাখা বিস্তার করেছে ; নীড়ে সুপ্ত পাখীর, দোলায় ঘুমন্ত শিশুর নিঃশ্বাসের ছন্দে বুক উঠছে-পড়ছে। ছন্দে সাগর দুলছে, ছন্দে পলটন চলছে, ক্লান্ত কুলি ছন্দের ভরনায় বুক দিয়ে পরিশ্রমের কষ্ট ভুলছে। বিশ্বজগৎ ছন্দে ওতঃপ্রোত। ও শুধু সৌখীনের বীণার তারেই নেই, বিশ্ববীণার সকল তন্ত্রীতেই ছন্দের স্পন্দন।"

হঠাৎ এই সময়ে গগন-গরুড় ডানা স্থির করে রইল, অন্তরীক্ষে ছন্দময়ীকে দেখে কারা মধুর স্বরে গেয়ে উঠল—

"বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরল কেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিণী
জরিরঙ্গা পুরনন্তী॥
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅও
উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবি-মণ্ডল-পরচণ্ডা কহিএ
গঙ্গা কহিএ পানী॥
ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিএ
হর ঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ
কে জান উতপতি তোরী॥"

গরুড় আবার উড়ে চলল। এইবার পাহাড়ী মেয়েদের গান শোনা যাচ্ছে—

"হিমালৈ মাথি লাসার গাঁও
লামা তো টাসি ছ।"

টাসি লামার নাম শুনে কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি এমন সময় দেবী বললেন—"ওই দেখ চীনের আলগ্ পাপ্ড়ি (mono-syllable) শব্দের অপূর্ব ছন্দ, মান্দারিন হংস হয়ে, এই দিকে পাখা মেলে আসছে, তারা বলছে—

'শিস কে দেয় গো আজ ?
তার কি ভিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ সে তার কি পর ?
চাঁদ সে তার কি তাজ ?
কে ওই গায় রে গান !
যা ভাই তার নে খোঁজ ! .
কি গান গায় সে রোজ ;
কি সাধ ছায় সে প্রাণ !
খোঁজ নে, যায় যে দিন,
ছাই যে ছায় রে দিক,
নীড় সে দূর হা ধিক !
দিন যে যায় রে দীন !
যে দিন যায় সে যায়,
যে ভুখ রয় সে রয়,
যে ভুল হয় সে হয়
দু চোখ জল যে ছায়।
হায় রে নেই ক' সুখ ;
চাঁদ সে তার কি তাজ,
বল গো, ফুল কি সাজ,
ফাঁক রে ফাঁক এ বুক।"

গাইতে গাইতে "কফুর্ অঙ্গ্ সফেদ রঙ্গ্" হংসমালা আলোয় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নীল আকাশের কোণ থেকে তিনটে নীলকণ্ঠ পাখী বলে উঠল—

"নয় রে ভিন্
জড় ও জীব,
জড় যে এক,—

দেখ রে দেখ,—
শিব সে শিব
স্বর্-ভূ-লীন !"

ক্রমে এদের আওয়াজও কমে গেল। এইবার পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাঁক বুলবুল-বোস্তাঁ কাকলি করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে এল।

ছন্দময়ী বললেন—"ওরা সব ইরান-আরবের ছন্দ-পাখী ; ওই যে ছন্দ-'মদীদ' বলছে—

'শিউলি ফোটবার এই তো কাল,
ক্ষান্ত-বর্ষণ এই সকাল !'

"ত'বীল গাইছে—

'কাজল চোখ ! যাহোক তুই লোক !
না-হক চাস, ভুলাস দুখ্ শোক !'

"জামীর প্রিয় ছন্দ হজজ কূজন করে বলছে—

'হাজির ফাল্গুন, ভ্রমর গুনগুন
নূপুর রুণরুণ, গোলাম নিমখুন !'

"রজজ্ বলছে—

'কিশমিশ-ডালিম-পেস্তার মুলুক,
বুলবুল ! কোয়েল ! সংগীত চলুক !'

"রমল্ গমক দিয়ে বলছে—

'ডাকতে মন চায়, কিন্তু লজ্জায়
হয় না হায় হায়, এম্‌নি দিন যায় ;
ওই হরিণ চোখ, চাউনি-টুকু তোর
রইল সঞ্চয় ঝাঁজরা পাঁজরায়।'

"খফীফ্ মিহিসুরে বলছে—

'নেই সে ফাল্গুন বুলবুল বিলাপ
করছে বিস্তর,
কুঞ্জে নেই ফুল, নিশ্চুপ সেতার,
গ্রীষ্ম দুস্তর।'

"মতদারিক গাইছে—

'দুঃখ দূর ! দুঃখ দূর !
হস্তে মোর স্বর্গপুর !"

এমনি ধারা ইরানী-আরবী ছন্দ-বিহঙ্গদের সংগীত ফুরোতে না ফুরোতে দেবী বলে উঠলেন—"ওই দেখ গ্রীসের মহাকবি হোমরের প্রধান ছন্দ ষট-পর্বিকা (Hexameter) স্বর্ণ-চক্ষু ঈগল পাখীর মতন শূন্যে ডানা বিস্তার করে সূর্যের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি বলছে, শোনো—

'হিংসা কি সংসারে চিরকালই থাকবে রে
থাকবে কি সংগ্রাম !
জন্তুরে হীন তবে জ্ঞান কর কোন্ দোষে
দাও তারে দুর্নাম ?
শৃঙ্গীরে দন্তীরে নাশ করে দূর করে
বশ করে চেষ্টায়,
অন্তরে ভূত-প্রেতই পুষবে কি, ফুঁসবে কি
রক্তেরি তৃষ্ণায় ?
হায় মানবত্ব কি মিথ্যা সে একবারে ?
সত্য যা স্বার্থ ?
প্রেম স্নেহ ভক্তি কি নইলেও চলবে রে ?
হায় রে লোভার্ত !
দেড়-কড়া ধন নিয়ে আধ-কাঠা ঠাঁই নিয়ে
চলবে কি দ্বন্দ্ব ?
ভুল্‌বি কি সত্যেরে ? সুন্দরে মঙ্গলে
দল্‌বি কি অন্ধ !"

ক্রমে ষট-পর্বিকা আকাশে মিলিয়ে গেল ; নীরবে ছন্দময়ী আমায় সঙ্গে করে আরো ঊর্ধ্বে উঠতে লাগলেন। খানিক পরে আমায় সম্বোধন করে বললেন—

"দেখো দেখো, হাজার হাজার গ্রহ-নক্ষত্র, শূন্যমার্গে বিচিত্র ছন্দ রচনা করে চলেছে, ওদের—

'না হয় ভূষণের ধ্বনি, নাহি নড়ে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজে মঞ্জীর ॥'

"কোথাও একটু তালভঙ্গ হচ্ছে না ; যদি হ'ত তবে অতলে তলিয়ে যেত। সূর্য চলেছেন সাত ঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে, তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার বিরাট ছন্দ রচনা করতে করতে। ছন্দশাস্ত্রের শতাবধি মাত্রার উৎকৃতি, অভিকৃতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ছন্দ, এঁর এই বিরাটরূপা সরস্বতীর কাছে চুট্‌কি অঙ্গের ছন্দ মাত্র। চন্দ্র চলেছেন তারার ফুলে সাতাশ মাত্রার দিব্য-স্রগ্ধরা রচনা করতে করতে, ওঁর মাতানো ছন্দে সপ্তসিন্ধু মাতাল হয়ে উঠল। সিন্ধুর এই চঞ্চলতার ভিতরেও একটি ছন্দ জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম জোয়ার-ভাঁটা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে বাঁধা। যাঁরা এই ছন্দের স্পন্দন নিখিলের অণুপরমাণুতে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই বিশ্বস্রষ্টাকে নাম দিয়েছেন—'কবির্মনীষী'। উদয়াস্তে ছন্দ, আলোয়-অন্ধকারে ছন্দ, জীবনে-মৃত্যুতে ছন্দের স্পন্দন।"—বলতে বলতে ছন্দময়ীর মূর্তি বিদ্যুৎ-শিখার মতন হয়ে উঠল।

গগন-গরুড় তাঁর সারথ্যে আরো ঊর্ধ্বে উঠছিল, কিন্তু লঘু বাতাসে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে দেখে দেবী গতি ফেরালেন।

নেবে আসবার সময় বেগাতিশয্যে আমার মূর্ছার উপক্রম হচ্ছিল, তাই জোর করে নিজেকে চাঙ্গা রাখবার চেষ্টায় চট্ করে চট্‌কা ভেঙে গেল, এবং চেয়ে দেখলুম নিজের ঘরে নিজের শয্যাতেই পড়ে আছি।

পঞ্চম প্রকাশ

[মঞ্জুশ্রী-মূর্তি—বিদ্যুৎতাঞ্জাম বাহন—বুলবুল-গুলজার পদ্ধতি]

শীতকালের হতশ্রী বাদলায় সমস্তটা দিন ঘরে বসে বসে বিরক্ত বোধ হচ্ছে, অথচ বেরবার জো নেই। লিখতে-পড়তেও মন বসছে না। গল্পগুজবের সঙ্গীও কেউ জোটেনি, কাজেই গলির দিকে জানলার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গলির ওপারে অপোগণ্ড ঋষিদের প্রাকৃত বেদগান শুনতে লাগলুম—

"আয় রোদ্দুর হেনে
ছাগল দেব মেনে।"

কিন্তু ছাগলের লোভেও যখন রোদ্দুর তাদের কথায় কর্ণপাত করলে না এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল তখন তারা একটুও না দমে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সুর ধরলে—

"ধিন্‌তা ধিনা, পাকা নোনা
ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা।"

আমি বালাপোশটা পায়ের উপর বেশ করে ঢাকা দিয়ে চোখ বুজলুম। মাথার ভিতর তখন ঘুরছে ঐ "ধিনতা ধিনা, পাকা নোনা।" হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলুম—"বাঃ এ যে চারের ঘরানা ছন্দ, কিন্তু চারে থই পাচ্ছে না। পাকা নোনা হাল্কা হয়ে পড়েছে বলে ছেলেগুলো আপনা হতেই 'পাকা-া নোনা' করে খুব খানিকটা ঝোঁক দিয়ে টেনে উচ্চারণ করছে।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠিক এই সময়ে কে বলে উঠল—

"জেম ন সহই কণঅ-তুলা
তিল-তুলিঅঁ অদ্ধ-অদ্ধেন।
তেন ন সহই সবন-তুলা
অবছন্দ ছন্দ-ভঙ্গেন॥"

আমি বললুম "অর্থাৎ?" আগন্তুক বললেন—

"সয়না সোনার নিক্তি যেমন
ওজন-ফরাক্ আধ-রতির
তেমনি সূক্ষ্ম কানের নিরিখ
একটু খুঁতেই হয় অথির।'

"তুমি যাকে চারের ঘরানা—চারালী বা লাচারী—বলছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালিও বলতে পার।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"সে কি রকম?"

আগন্তুক বললেন—

"লঘুর্ভবেদ একমাত্রো···ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্'—কাজেই 'ডাল ভাতে ভাত' পাঁচ দাঁড়াচ্ছে; 'ধিন্‌তা ধিনা' সাড়ে চার; 'পাকা নোনা' চার, তাকে ঝোঁক দিয়ে পাঁচের কাছাকাছি টেনে আনতে হচ্ছে। কাজেই পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালিও বলতে পার।"

আমি বললুম—"এ নিয়ম খাটালে 'আয় রোদ্দুর হেনে'র কি দশা হবে?"

আগন্তুক বললেন—"কেন? 'আয় রোদ্দুর' সাড়ে চার মাত্রা, কারণ ওতে রয়েছে পুরো তিন আর ঝুরো তিন। পাঁচালি ছন্দে প্রতি পঙ্‌ক্তি-পর্বে ন্যূন পক্ষে সাড়ে চার মাত্রা রাখা দরকার, তার কম হলেই টেনে বুনতে হয়। অথচ পাঁচটা গোটা অক্ষর দিয়ে পর্ব গড়লে শ্রুতিকটু হবে। কাজেই চারটে গোটা এবং একটা কি দুটো আধলা দিয়ে গড়াই যুক্তিসংগত।"

আমি বললুম—"তার মানে, আপনি বলতে চান যে, এর প্রতি পঙ্‌ক্তি-পর্বটিই পক্ষিরাজ, তার চারটে পা আর দুটো ডানা।"

আগন্তুক বললেন—"উপমাটা বেশী দূর চালালে কিন্তু চলবে না, কারণ—

'আয় রোদ্দুর হেনে'

কিংবা—

'আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল।'

অথবা—

'এক পয়সায় কিনেছে সে
তালপাতার এক বাঁশী।'

এদের প্রত্যেকটির প্রথম পঙ্‌ক্তি-পর্বে তিন ঠ্যাং এবং তিন ডানা। এদের বেলায় কি বলবে? তা ছাড়া অনেক সূক্ষ্ম হিসেব এর ভিতর রয়েছে, যেমন—নাওয়া, খাওয়া, চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতির 'ওয়া' দুই না ধরে এক ধরতে হয়, কারণ, ওটা অন্তস্থ 'ব'য়ের সামিল; তারপর বাজিয়ে সাজিয়ে প্রভৃতির 'ইয়ে' পঙ্‌ক্তি-পর্বের পূর্বার্ধে থাকলে এক এবং শেষার্ধে থাকলে দুই হবে, যেমন—'বাজিয়ে যাব মল।' কিন্তু ঐটে উল্টে 'যাব বাজিয়ে মল' লিখলে ছন্দ হবে না। কারণ 'ইয়ে' এখানে দুমাত্রা। শুধু তাই নয়, পঙ্‌ক্তি-পর্বের কোনো জায়গাতেই একটা পুরোর ব্যবধানে দুটো ঝুরো ব্যবহার করতে পার না, করলেই শ্রুতিকটু হ'বে। 'নূপুর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজ্‌ল নূপুর সোনার পায়ে' দুইই শ্রুতিমধুর; কিন্তু 'মঞ্জীর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজ্‌ল মঞ্জীর সোনার পায়ে' শ্রুতিকটু। তোমার পক্ষিরাজের ডানা-দুটো সামনের দু'পায়ে জুড়লেও চলবে না, পিছনের দু'পায়ে জুড়লেও মুশকিল। অনেক ভজকট।

তার চেয়ে এক কাজ কর :—এমন ছন্দ তৈরী কর যার প্রত্যেক হসন্ত এবং স্বরান্ত-অক্ষর হিসেবে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘের পর্যায়-বিন্যাসে নতুন নতুন ছন্দ তৈরী হয়েছে, বাংলায় তেমনি স্বরান্ত এবং হসন্ত, পা এবং পাখনার পর্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দপদ্ধতির প্রবর্তন কর। এতে ক'রে আদ্যা-পদ্ধতির বৈমাত্র-বিড়ম্বনা ঘুচবে, হৃদ্যা-পদ্ধতির যুক্ত-পূর্ব হসন্ত-হরফের স্বরলোলুপতার অবসান হবে। চিত্রা-পদ্ধতির পা ও পাখনার গোল মিটবে; দৃপ্তা-পদ্ধতির হল-স্বরের—দামাল-আলা-ভোলার—হঠাৎ সমাগমে, সংঘাতের স্থলে সাযুজ্য-বিভ্রাটের অন্ত হবে। আমি স্বয়ং পিঙ্গল নাগ তোমাকে মঞ্জু-পদ্ধতির মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, কাজ আরম্ভ কর, বিলম্ব কোরো না।"

হঠাৎ বিদ্যুৎ-শিখার মতন ছন্দকারের ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়ে ছন্দময়ী বলে উঠলেন—

"ঠিক বলেছে পিঙ্গল, তুমি আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম তৈরী করে দাও; স্থির বিদ্যুতের মণিপট্টে চপলা-বিলাস গেঁথে গেঁথে আমার ফুলদার চৌদোল নির্মাণ কর।"

আমি বললুম—"ক্ষমা করুন।"

ছন্দময়ী বললেন—"কেন?"

আমি বললুম—"গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

দেবী বললেন—"আমার হুকুম, কোনো ভয় নেই।"

আমি বললুম—"যুক্তাক্ষর আর ঐকার ঔকার প্রভৃতির কি ওজন ধরা যাবে? দুই ধরব কি?"

দেবী বললেন—"না, দেড় ধর, যুক্তাক্ষরের প্রথমাংশ আধ, শেষাংশ এক, দুয়ে মিলিয়ে দেড়। ঐকার ঔকারের প্রথমার্ধ এক, শেষার্ধ আধ, দুয়ে জড়িয়ে ঐ দেড়ই দাঁড়াবে। কাজেই পুঁজি দাঁড়াচ্ছে পুরো আর আধলা, গোটা আর ভাঙ্‌টা। এই দুয়ের পর্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দস্পন্দের বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্মাণ কর; কলম ধর।"

আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতন কলম হাতে নিলুম; কলম চলতে লাগল—

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্।
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্!

কোন্ ফুল্ তার্ তুল্
তার তুল কোন্ ফুল ?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।"

দেবী বললেন—"হিন্দুস্থানী আলংকারিকেরা একে কি বলবেন জান? শূদ্রজাতি ছন্দ। কারণ এ ব্যঞ্জনবহুল; স্বরবহুল ছন্দ তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ জাতি। এঁরা ছন্দেরও জাতিভেদ কল্পনা করেছেন। এইবার ব্রাহ্মণজাতি ছন্দ রচনা কর দেখি—আগাগোড়া স্বরান্ত।"

কলম আবার চলতে সুরু হ'ল—

"ঘুমেরি মহলে বেশরে মোতিটি
নিশাসে নড়ে।
প্রেমী জেগে আছে মুখে চেয়ে, চোখে
পাতা না পড়ে!

মেঘে-গড়া ঘষা কাঁচেরি ফানুসে
চাঁদেরি আলো;
তাতে কাঁচা সোনা মু'খানি নয়নে,
লাগে যে ভালো।

মেঘে মেঘে ঢাকা আকাশেতে রাকা
চাঁদেরি বিভা,
মাঠো মাঠো আলো চুঞে চুঞে মাঠে
পড়ে বুঝি বা!

আলোতে কালোতে মলয়জে যেন
মিলেছে চুয়া
পহেলি ফাগুনে কে ধরেছে মরি
শাঙনী ধুয়া।

জোছনা আঁধারে মুখোমুখি ক'রে
রয়েছে বসে,
ধারা সে ঝরে না, আলো ফুটিবারে
নারে সাহসে।
হাওয়া থেমে আছে, থেমে আছে যেন
তটিনীটিও,
অচেনা কি পাখী জেগে উঠে বলে
"কি ও! ও কি ও!"
বেণুবনে ঝোপেঝাপে যত ঝিঁ ঝি
ডাকে ঝিমিয়ে,
জোনাকিরা একে একে নিবে গেল
টিম্‌টিমিয়ে।
বেপথু হৃদয়ে ঘুমোনো অধরে
চুমুটি নিতে,—
অচেনা পাখীটা ডেকে ওঠে "কি ও!
ও কি ও!" গীতে।
ঘুমেরি নিছনি নিতে দেরে পাখী,
ওঠ না ডেকে,
স্বপনে সোহাগে মিশে যেতে দেরে
স্মৃতি না রেখে।"

ছন্দময়ী বললেন—"তোমার ব্রাহ্মণ-জাতি ছন্দ একেবারে সারস্বত ব্রাহ্মণ দেখছি।"

আমি বললুম—"উঁহু, ভঙ্গ-কুলীন। একবার এক জায়গায় হসন্ত ব্যাভার হয়েছে।"

দেবীর সহাস্য ইঙ্গিতে আবার কলম চলল—

"তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়,
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়
সব তরুণ আজ ধরায়!

তরুণী আশারে সঙ্গী কর্
আজ আবার মনরে মন,
চির-নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।"

দেবী বললেন—"একে 'ব্রহ্মমূর্ধা' ছন্দ বলতে পার। কারণ এর প্রতি চরণের প্রথমাংশ স্বরবহুল। আচ্ছা, অন্য ছন্দের পত্তন কর।"

কলম চলল—

"পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দেখ তোম্‌রা।"

ছন্দময়ী বললেন—"এটির নাম রইল 'পিউকাঁহা' ছন্দ। তারপর?"

কলম চলল—

"হাঁড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল! রাত্রি এল!"

দেবী বললেন—"পঙ্‌ক্তি-পর্বের মাঝখানে অক্ষরের ওলটপালট দেখছি। এ মধ্যচপলা 'মিশ্র-পর্বিকা'। আচ্ছা, এইবার একটি অন্ত্যচপলা 'মিশ্র-পর্বিকা' রচনা কর।"

কলম চলল—

"জাগ্‌ছে আলো জাগ্‌ছে হৃদয়,
জাগ্‌ছে ভাষা জাগ্‌ছে আশা,
বন্ধ ঘরের ঘুল্‌ঘুলিতে
বুল্‌বুলি সব বাঁধছে বাসা।"

দেবী বললেন—"তারপর ?"

কলম চলল—

"কুগ্রহ কুদৃষ্টি হানে—
দুঃখ দেহে, দুঃখ মনে,
তাই বলে কি হস্ত জুড়ে
বসবে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে।"

দেবী বললেন—"এটির নাম রইল 'পাগলা ভোলা' ছন্দ। তারপর ?"

কলম একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার চলতে সুরু করলে—

"নিশাসে কি সৌরভ
কালো চুলে মেঘ সব
পশলায় পশলায় রূপ ধর গো !
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোনোখানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! তুই স্বর্গ !"

ছন্দময়ী বললেন—"আরও চলুক।"

কলম ভঙ্গীভরে চলল—

—"অ ! বটে এই বুঝি ! দেখলুম দেখলুম।"

—"ছি ! ওকি রাগ ক'রে তুই ভাই যাচ্চিস্ ?"

—"তা তুমি বলবে না, থাকবার দরকার ?"

—"হুঁ, বলি আয় কাছে ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্ !"

—"এ—কি এ ? ছাই কথা, ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্ !"

—ধাঁ করে ভেংচিয়ে কমলীর প্রস্থান।

—হাঁ ক'রে রয় চেয়ে ফটুকের দুইচোখ।

গোঁ হয়ে ভাবছে কি ?—"গম্ভীর মুখখান।"

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে বললেন—

"বা কবি, বেশ তুমি বাংলায় দীর্ঘের
ভা' বুঝি বাংলালে ছন্দ পেয়ে আজ ফের !"

"তারপর ?—"

কলম আবার গোঁ ভরে দাগ পাড়তে লাগল—

"হর-মুকুট ! হর-মুকুট !
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট !
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট !
বিজুলী থির হয়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির,
হীরা ফটিক উজলি দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড় ।"

একটু ভুরু-কুঁচকে দেবী বললেন—"হু ; তারপর ?"

আবার কলমটা মাথা গুঁজে কাগজ আঁচড়াতে সুরু করলে—

"রুনুরুন্ বাজে কার বাজে মঞ্জীর
কাঁপে তার সেতারের স্নায়ু আর শির ;
মৃদু গুঞ্জরে কুঞ্জে কে উন্মন,—
সাথী কার ব্যথা-ভার-ভরা যৌবন !
ফোটে ফুল বকুলের, অশোকের থোপ
হরিয়াল্ লালে লাল ফাগুয়ার ছোপ !
মুখে মুখ সারীশুক লেহা বিস্তর,
মধু-বায় বুলে, হায়, দোলে পিঞ্জর ।
সারঙের তারে রয় যত কম্পন
তারি ঝংকারে, হায়, কাঁপে কায় মন ;
বাঁশরীর অশরীর বাহুডোর, হায়,
এ হৃদয়-কমলের কমলায় চায় ।
রঙে বুঁদ হয়ে কুঁদ হ'ল রঙ্গন,
ঝুনুরুন্ বাজে কার করে কঙ্কণ !
ফেলে বাস ভরা শ্বাস চুয়াচন্দন,
কাঁহা পিউ কাঁহা পিউ ওঠে ক্রন্দন ।"

দেবী প্রসন্ন মুখে বললেন—"এটির নাম রইল 'রুমঝুন্' ছন্দ। ঠিক হয়েছে; আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জামের চাল, চাঁদোয়া, চুড়ো, ঝালর, পাটা, চৌখাম্বা সব তৈরী। এইবার এর একটা পাদান তৈরী করে দাও।"

ক্লান্ত কলম আবার নক্সার কাজে প্রবৃত্ত হ'ল—

"একটুকু উস্‌খুস্
একটা কি ফিস্‌ফাস্
কার মৃদু নিঃশ্বাস
কার নিদ্ টুটল!

ভেদ করে আবলুস্
ঘুটঘুটে রাত্রির
শান-দেওয়া সাত তীর
নিঃসাড় ছুটল!

হিম হাওয়া বিলকুল
ঢুলছিল নিউরে
উঠল সে শিউরে
শিউলির স্পর্শে;

বোল্ বলে বুল্‌বুল্
আর পাখী দেয় শিস্
চন্‌মনে চৌদিশ
চঞ্চল হর্ষে।"

ছন্দময়ী সানন্দে বলে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে, এইবার অক্ষর-সংগীতের সূক্ষ্মতর শ্রুতিগুলি পর্যন্ত ধরা পড়েছে, ছন্দের সংগীত মঞ্জুশ্রী লাভ করেছে। আমার মনের মতন এই বুলবুল-গুলজার-পদ্ধতি,—মনের মতন এই পুষ্পক রথ।"

আমি সাশ্রুনয়নে বললুম—"দেবী, তোমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্মাণ করতে বিদ্যুদ্দামকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধতে আমার দুই চোখ ঝলসে গেছে। আমি

আর তোমায় ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিনে।"—বলতে বলতে দুই চোখ আবার ফুলে ফুলে ভ'রে উঠল। বার বার ক'রে চোখ মুছে যখন চোখ মেলতে সক্ষম হলুম, তখন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতলোচনা ছন্দ-দেবতাকে স্বচ্ছন্দে বহন করে বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম আমার নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে; আর গৌড়-বাংলার ভবিষ্যৎ-কবি-পরম্পরা এক ঝাঁক শুভ্র সুন্দর বলাকার মতন সেই তাঞ্জাম ঘিরে আনন্দে কাকলি করতে করতে পাখার ভরে উড়ে চলেছে।

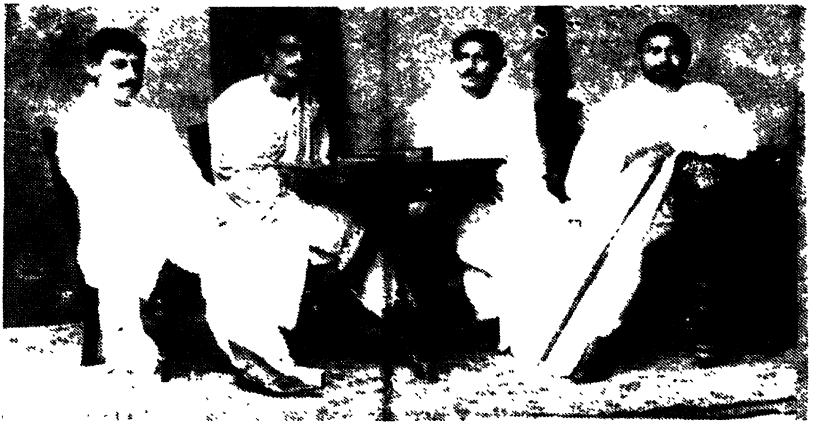

চারবন্ধু

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মস্থান

নিমতা গ্রামের মাতুলালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর জন্মস্থান

(বাম জানালার কক্ষে) ১৯৪৮-৪৯ সালে গৃহীত চিত্র

বিবিধ

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত বিবিধ রচনাবলী, চিঠিপত্র ও গ্রন্থপরিচয়

কেন ?

কেন নাচে ভালুক ? কেন লাফায় ব্যাং ?
আর্সুলায় ওড়ে ?
রাজা কেন বলে লোকে ক্ষমতাহীন
খেতাব-ওয়ালাকে ?
কেন বুড়া শুভ্র সত্য কলপ দিয়ে চুল
কালো করে রাখে ?
মিউনিসিপাল লোক[১] কেন নিত্য নিত্য
রাস্তাগুলো খোঁড়ে ?
পৌষের শীতে ভোর না হতে কেন ঠাণ্ডা
খেজুর রস চাখে ?
কেন টাঙায় মশারি লোক ? ঢুকতে যখন
মশাই আগে ঢোকে ?
ভূত পালায় যে তাঁতীর তানে তারে
কেন তারিফ করে লোকে ?
চাঁদের সাথে রাতে কেন বাদুড় পেঁচা
চামচিকেরা থাকে ?
প্রাণের গভীর পাগলামি সে ; কিংবা
একটা মৌলিকতার বেগে
এ সব কর্ম করে ; এবং তাহা ছাড়া
দশপদী (ও) লেখে ।

ভারতী (চৈত্র, ১৩১৬)

১. বিশেষ কারণে মূল রচনায় মুদ্রিত দু' অক্ষরের একটি শব্দ পরিবর্তন ক'রে 'লোক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

রামছুঁচায়ন

ছুঁচামিতে বড় যারা তারা রামছুঁচা।
দুটা কান কাটা তাই মান ভারী উঁচা॥

*　　*　　*

কিচকিচ স্বরে ছুঁচা কয় একদিন।
'আমি প্রায় ক্ষুদ্রাকায় কস্তুরী হরিণ।'
খাঁদা নাক ফোলাইয়া ব্যাঙ কহে, 'ভাই!
এ খোঁজ রাখে না কেউ কারো নাক নাই॥'

*　　*　　*

সব ঠাঁই গতিবিধি আছে যে ছুঁচার।
এ কথা সবাই জানে—ভুবনে প্রচার॥
ছুঁচার সর্বত্র গতি—জানি ভালো মতে
দরবারে সে যায়, কিন্তু, নর্দমার পথে॥

*　　*　　*

ছুঁচো কয়, 'শোন মোর কুলজীর পাতি।
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি॥
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ-জনায়।
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায়॥'

*　　*　　*

সাপে কাটা ছুঁচো বার হয়েছে রে, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!
কেউটের বিষে বিষিয়ে উঠেছে, রক্ষা নাহিক আর!
মন্ত্র ওষধি কিছু নেই ওর, ঘাঁটাসনে ওরে, বাপু!
সাপে-কাটা ছুঁচো কাটে যদি সাপে সাপই নাকি হয় কাবু!

*　　*　　*

—ছুঁচো প্রতি নাই প্রীতি,—
তবে এ কেমন রীতি?—
ছুঁচোর কীর্তন কেন শোনে জনগণ?
—হায় বন্ধু জান না কারণ?

বৈষ্ণব বাঙালী জাতি
তাই শুধু দিবারাতি
কীর্তনের প্রীতে শোনে ছুঁচোর কীর্তন।[১]

ভারতী (আশ্বিন, ১৩২৩)

তেহিরান গান

(Teheran Song)

বুক পেতে দিছি সুন্দরী,
মার তুমি মার ছুরি!
তোমার চুলের কাঁটা খুলে,
লাগাও জোরে আমার চুলে,
বর্শা বিঁধে দাও ললাটে
হে সুন্দরী! যাদুকরী!
মাথা পেতে দিছি পায়ে
সুন্দরী গো যাও মাড়ায়ে
গলা পেতে দিছি—ওগো
হান তোমার তরবারি!

ভারতী (ফাল্গুন, ১৩২৯)

বার্ধক্যে

(শী-কিং হইতে)

চটুল শশক সহজে দিত না ধরা,
বনের কপোত কদাচ পড়িত জালে,
চিন্তা ছিল না, ছিল না এমন জরা,
এ দুর্ভাবনা ছিল না কিশোর-কালে,
এবে বিফলতা সহিতে কেবল আছি,
মৃত্যুর কোলে ঘুমাতে পারিলে বাঁচি।

১. কোন বিশেষ ব্যক্তিকে শ্লেষ করে নবকুমার কবিরত্ন ছদ্মনামে রচিত।

চঞ্চল মৃগ সহজে দিত না ধরা,
টোপের লালসে বঁড়শী গিলিত মীন,
রাজ্য তখন সংকটে নহে ভরা
শান্তিতে কেটে গেছে যৌবন-দিন ;
বৃদ্ধ বয়সে যত জঞ্জাল জুটে,
আসুক সে ঘুম, আহা, যাহা নাহি টুটে।
শশক হরিণ পালায়ে ফিরিত খালি,
তখন ও মনে ছিলনাক ভাবনাই,
তখন ফিরেছি হাতে হাতে দিয়ে তালি
এখন যুদ্ধ—এখনই শক্তি নাই !
বয়সের শেষ—শান্তির শেষ নাহি,
চেতনা-হরণ মরণেরে ডাকি—'ত্রাহি'।

ভারতী ফাল্গুন, ১৩২৯)

মেঠো গান

(জিয়া-তুরকী)

সূর্য ডুবিল, ছায়া জমে এল আকাশের কোলে কোলে,
রাখাল ছেলের বাঁশী শোনা যায় মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ;
ওরে তুই কেন বনেতে, এখনো তুই যে দুধের বাছা,
দলের সঙ্গে ঘরে ফিরে আয় মায়ের পরান বাঁচা।
বনে যে অনেক বিঘ্ন বিপদ পশে যে অনেক ভয়,
এ কাঁচা বয়সে ছেড়ে যাওয়া বাছা কিছু বিচিত্র নয়।

ভারতী (চৈত্র, ১৩২৯)

ভাট্‌নেরার যুদ্ধ

(ঠাকর্সি চোলাবৎ চারণ)

মহাকালের কণ্ঠ-লগন মুণ্ডমালার হারে
দেখতে হঠাৎ পেয়ে নারীর তরুণ তাজা মুখ
ঈষৎ যেন ঈর্ষাভরে গৌরী বলেন তাঁরে,—
"তোমার ঘরে, ঠাকুর ! আমার কেটেছে চার যুগ ;-

যুদ্ধে যুদ্ধে বাজিয়ে শিঙা বেড়াও তুমি, জানি,
কুড়িয়ে আনো বীরের মুণ্ড মণ্ডিত যা' যশে,—
গলায় গেঁথে পরতে, উজল করতে মালাখানি,
নারীর মুণ্ড আজ সে মালায় কোন্ খেয়ালের বশে ?"
"রণস্থলেই গৌরী গো আজ পেয়েছি এই শির",
কন্ মহাদেব, "গলায় গেঁথে পরার মতন ধন,
দাতা বটে রাও যশোমন্ত, বীরের বেটা বীর
স্ত্রীর মাথা দান দেছে আমায় আর দেছে আপন।
ভাট্‌নেরাতে চাপ্‌ল যখন রণন ভটের ভার,
লড়তে এল শঙ্কাজয়ী মরণ জেনে স্থির,
ভীষণ যেমন যুদ্ধ তেমন ভীষণ সজ্জা তার,
ঘর ঘরণী চুকিয়ে এল কণ্ঠেতে শির স্ত্রীর।
জ্যান্তে যে অর্ধাঙ্গভাগী ছিল গলার হার
মরতে এল মুখখানি তার গলার মালা ক'রে,
একলা সে বীর দেছে আমায় যুগল অলংকার,
বীরের রীতে স্বামী-স্ত্রীতে অমর হ'ল ম'রে।
লড়াই আমি ঢের দেখেছি, এমন দেখি নাই
নাই তুলনা ভীতি-হরণ এমন পীরিতির।"
গৌরী বলেন, "কথায় তোমার ভয় বাসি গোঁসাই,
অমন ভালবেসে যেন নিয়ো না মোর শির।"
উচ্চ হেসে বলেন মহেশ, "আমার কণ্ঠহারে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির বীরেরই শির শোভে ;
ভীরুর মুণ্ড একটিও নাই, জানে তা সংসারে।
ওগো ভীরু, তোমার মাথা নেব কিসের লোভে ?
ভাট্‌নেরাতে যা দেখেছি তুলনা তার নাই,
বীরের প্রীতি, বীরের রীতি স্বামীর এবং স্ত্রীর,
অভয়ব্রতী বীর যশোমন্ত আর সে বোশী বাঈ।"
সমান উভয়, ঠাকরুসি কয়, সংকটে সধীর।

প্রবাসী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫)

আট্‌কে বাঁধা

(একটি চীনে কবিতার ইংরেজী থেকে)

নীলাব্জ নীল আকাশে মোর থুয়েছি বিশ্বাস,
থুয়েছি থির জলের শান্ত হাসে ;
দৃষ্টি আমার ভেদ করে যায় মেঘেরি নাগপাশ,
ঢেউ দেখে আর কাঁপে না মন ত্রাসে।
ফুলের প্রতি তরুর স্নেহে থুয়েছি প্রত্যয়,
—তরুণ প্রাণের দিব্যভাতি-ভরা,—
বাইরে তারা নেতিয়ে পড়ে, শুকিয়ে ধূসর হয়,
অন্তরে রয় কান্তি-নিরন্তরা।
ভালোবাসি সবুজ বনে শুঁড়ি পথের রেখা,—
পাতার নাচন নিঝুম পথের 'পরে ;
পাৎ-বাদামের ফলটি খসা,—গায়ে আলোর লেখা,—
ভালবাসি নয়ন-পরান ভ'রে।
আসছে যেদিন পূর্ণ সে মোর বিশ্বাসের আশ্বাস
গেছে যে দিন মূর্ত সে বিস্ময়,
সে বিস্ময়ে অপরূপের অরূপ যে আভাস
অভাব্য সব সম্ভাবনাময় !
বিশ্বাসে বুক বেঁধেছি, বল পেয়েছি বিশ্বাসে,
আট্‌কে আমার হয়ে গেছে বাধা,
বিশ্বাসে মন খুশি আমার, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
উড়িয়ে দিল উবিয়ে দিল ধাঁধা।
বিশ্বাসে মোর বাসি ভালো, আঁকড়ে রাখি বুকে,
প্রেমে বাঁধি বিশ্বনিখিল হিয়ায় নিত্য-দিনই;
থুই প্রীতি-প্রত্যয়ের অগ্র তাঁরি চরণ-যুগে
বিশ্বাসের আর ভালোবাসার উৎস স্বয়ং যিনি।

প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩২৫)

ভিক্ষার দীক্ষা

(একটি ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে)

এক যে ছিল খোঁড়া ফকির
তার কাঠের ছিল ঠ্যাং,
কাঠের ঠেঙোয় ভর দিয়ে সে
চল্‌ত ভ্যাভ্যাং ভ্যাং !
জন্ম-গরীব জন্ম-খোঁড়া
ঠেঙোয় দিয়ে ভর
মাগন মেগে পাড়ায় পাড়ায়
ফিরত সে ঘর ঘর।
আজ আমরা সবাই যাব রে ভাই
যাব রে ভিক্ষায়,
বিনি-ঠেঙোয় সাজব ফকির
ক্ষতিই বা কি তায় ?
আমরা যাবই রে ভিক্ষায়।
ঝোলাতে তার ছোলার ছাতু
পুঁটলিতে তার নুন্,
লম্বা ঠেঙোয় ভর দিয়ে সে
চল্‌ত ফারি দূন্ !
আঁজলাতে তার চালকড়ি রে
শিশিতে তার তেল,
আর জল খেতে নারকেলের মালা
দরিয়াই নারকেল !
সেই ফকিরের সঙ্গে রে ভাই
ঘুরে বছর সাত
নিত্যি মেগে হ'ল আমার
মাগন্-মাগা ধাত !

সেই হাত-পাতায় ওস্তাদের লেগে
পেতেছি হাত ঢের,
এখন নিজের মালিক নিজেই, তবু
ঘোচেনি হেরফের,
বদল হয়নি স্বভাবের—
রোজই পাত্‌ছি যে হাত ফের!
গাছের হাঁড়ল বাসা আমার
ভোগ করি নিষ্কর,
খুশি আছি খোদার দয়ায়—
সেই দয়া নির্ভর।
পেশার সেরা ভিক্ষা করা
তুলনা তার নাই—
ক্লান্ত হলে জিরোও পড়ে
বকবে না কেউ, ভাই।
দুষমন আমার নেই দুনিয়ায়,
দুয়ারে নেই খিল,
লোকালয়ের বাইরে থাকি
আমির হেন দিল্‌
আমার আমির হেন দিল্‌!
যদি ভিক্ষেতে ভাই এতই মজা
আমিরী কে চায়
তবে চল্‌ রে সবাই চল্‌ ওরে ভাই
চল্‌ চলি ভিক্ষায়—
সবাই চল্‌ চলি ভিক্ষায়।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৫)

আদ্য-মার্কিন যুদ্ধ-সংগীত

(মূল ওজিবোয়া ভাষায় রচিত গানের ইংরেজী হইতে)

আমার আওয়াজ শোন্ তোরা আজ
লড়ায়ে-বাজপাখী।
শত্রু মেরে ভোজ দেব রে
আয় রে তোদের ডাকি।
শত্রু-সেনার গণ্ডী তোরা
যাস ডিঙিয়ে, তাকাই মোরা—
মোরাও যাব গণ্ডী ভেঙে
রক্ত-পাগল আঁখি।
মোর কামনা তোদের ডানার ক্ষিপ্রগতি, ভাই,
শত্রু-শাতন তোদের নখের তীক্ষ্ণতা মোর চাই;
চল্‌ব মোরা তোদের সমান,
আয় তোরা বীর আয় রে জোয়ান!
রোষের আগুন আয় জ্বালিয়ে
বীর-মাটি গায় মাখি!

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩২৫)

কর্মীজনের মনের কথা

(Nepoleon)

কর্তৃত্বের রাজটীকা লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে পারে না। সে শুধু অবস্থা দেখে, এবং গুরুত্ব অনুসারে ব্যবস্থা করে।

মহম্মদের ধর্ম দশ বৎসরে অর্ধ পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; খ্রীষ্টের ধর্ম তিন শত বৎসরে কথঞ্চিৎ মাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মানব-সমাজ স্বভাবতঃ মন্দ নহে। অধিকাংশ লোকই যদি দুর্বৃত্ত হইত এবং কোমর বাঁধিয়া কুকাজে লাগিয়া যাইত তবে তাহাদের দমন করিত কে?

জাতীয় শিল্পশালায় যে যুদ্ধের অনুষ্ঠান হয়, শত্রু মর্দনের পক্ষে উহা অমোঘ। অধিকন্তু সে যুদ্ধে রক্তপাতের নামগন্ধও নাই।

পরিণয় সব সময়ে প্রণয়ের স্বাভাবিক পরিণতি নহে।

রাজার ভালবাসা ধাত্রীর ভালবাসা নয়।

শহর-কোতোয়াল খোঁজ করিয়া যাহা বাহির করে, তদপেক্ষা বানায় বেশী।

রাষ্ট্রনীতির প্রচলিত ধারা অনুসারে বাক্যদানে এবং তদনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

রাজসিংহাসন—জিনিসটা কি? খানিকটা কাঠ—মখমল-মোড়া।

একটা মাত্র তুচ্ছতম ঘটনায় যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হইয়া যায়; আবার অম্‌নিতর একটা মাত্র খণ্ডযুদ্ধে সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হইতে পারে।

খেল্‌নার লোভ দেখাইয়া, মানুষকে দিয়া সবই করানো যায়। চুষি-ঝুমঝুমি,—তা সকল বয়সের উপযুক্তই তো আছে।

সকল রকম সুবিধার শুভ সম্মিলনের প্রতীক্ষায় যদি বসিয়া থাকি, তবে কোনো বড় কাজেই আমরা হাত লাগাইতে পারিব না।

খেতাবে ও খাতিরে সকল লোকই কিছু খুশি হইতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে নগদের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভালবাসা নিষ্কর্মার নেশা, যুদ্ধব্যবসায়ীর কৌতুক, সম্রাটের পথের কাঁটা।

হয় হুকুম করি, নয় তো মুখ বন্ধ করিয়া থাকি।

বিচারশক্তি অপেক্ষা স্মৃতিশক্তিকেই আমরা বেশী খাটাইয়া থাকি।

যে দিতে জানে না, সে লইতেও পারে না।

পৃথিবীর পক্ষে বাতাস যেমন, মানুষের তেমনি উচ্চাভিলাষ ; উভয়ের মধ্যে যেটিকেই বাদ দাও, জীবনের লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইবে।

যাহা কিছু পুরাতন, তাহা অন্যায় হইলেও আমরা ন্যায়সংগত বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

যে জাতির অনুযোগ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না, সে জাতি চিন্তা-শক্তি হারাইতে বসিয়াছে।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে একটা পোশাকী ধর্মবুদ্ধির আবরণ সর্বদাই ব্যবহার করিতে হয়।

যদি নির্বাচনের অবসর থাকে, তবে, অপরের দ্বারা গ্রস্ত হওয়ার চেয়ে নিজেই গ্রাস করিয়া ফেলা ভাল।

মনে রাখিয়ো, (বাইবেলের মতে) মাত্র ছয় দিনে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাহা চাও দিতে পারি। কিন্তু সময় বাড়াইয়া দিতে পারি না। উহা আমার ক্ষমতার অতীত।

দেশের মধ্যে বুদ্ধিমান লোক যথেষ্ট আছে। এখন যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেককে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করিতে পারিলেই হয়। যে লাঙ্গল ঠেলিতেছে সে হয়তো মন্ত্রণাগারে আসন পাইবার যোগ্য ; আবার যিনি মন্ত্রী তাঁহাকে দিয়া লাঙ্গল ঠেলানই হয়তো সুব্যবস্থা।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে জয়ডঙ্কাই শ্রেষ্ঠ ; উহা কখনো বেসুর বাজে না।

যোদ্ধার ধর্ম যুদ্ধ—সুতরাং আমি ধর্মত্যাগী নহি। লোকে যাহাকে ধর্ম বলে সে তো মেয়েদের এবং পুরোহিতদের ব্যাপার। আমি যখন যে দেশ শাসন করি, সেই দেশের ধর্মই আমার ধর্ম। মিশরে আমি মুসলমান ; ফ্রান্সে আমি রোমান ক্যাথলিক। যদি কখনো ইহুদীদের শাসনকর্তা হইতে পারি তবে সলোমানের বিধ্বস্ত মন্দির পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিব।

মানব-জাতির মানসপটে যেটুকু স্মৃতি রাখিয়া যাওয়া যায়, আমার মতে, তাহাই অমরতা।

যাহাদের দ্বারা কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রাজা কেবল তাহাদিগকেই ভালবাসেন। যতদিন সে সম্ভাবনা থাকে, ভালবাসাও ততদিন।

মানুষ সৃষ্টিকরা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে; যাহা পাওয়া যায় তাহাই কাজে লাগাইয়া লইতে হয়।

অব্যবস্থিতচিত্ত রাষ্ট্রনায়ক এবং পক্ষঘাতগ্রস্ত রোগী উভয়েরই সমান অবস্থা। ইচ্ছা আছে, গতি নাই।

বন্ধুর ইষ্টচেষ্টা অপেক্ষা শত্রুর অনিষ্ট-চেষ্টা অনেক বেশী প্রবল।

যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন দুইই কৌশলের কাজ।

কেবল নাচিয়া-কুঁদিয়া মানুষ, মানুষ হয় না।

ধ্বংসক্রিয়া এক মহূর্তেই সম্পন্ন হইতে পারে; গঠনক্রিয়া সময়ের কাজ।

প্রবাসী (বৈশাখ, ১৩২০)

আভিজাত্যের নির্ভরভিত্তি

[এগুলি জার্মান দার্শনিক (Nietzsche) নিচির উক্তি। নিচি আভিজাত্যের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অভিজাত্য অর্থাৎ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। ইঁহার অনেক উক্তি প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, তত্রাচ ভাবের ও চিন্তার উদ্বোধক বলিয়া সেগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।]

প্রচলিত সংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলার মধ্যে একটু ভীরুতা আছে, একটু জড়তা আছে এবং ভাবের ঘরে বেশ একটু বড় রকমের চুরি আছে।

কল্পনাতেই মানুষের কৃতিত্ব; এমন নিজস্ব জিনিস আর নাই।

যে ভাবুক নিজের ভাবকে মূর্তি দিতে পারিয়াছে, আপনার সারভাগটুকু স্থায়ী করিতে পারিয়াছে, সে দেহ বা মনের শক্তি হ্রাসে বিচলিত হয় না। কালের নিঃশব্দ সঞ্চারে সে বিদ্রূপের হাসি হাসে। নিধি যখন অন্যত্র সুরক্ষিত তখন রিক্ত ভাণ্ডারে চোর ঢুকিলে ক্ষতি কি?

সংসারে যাহাদের 'কাজের লোক' বলিয়া খ্যাতি আছে, ভাবের জগতে তাহারা অকর্মণ্য। কাজের আবরণে তাহারা মনের দৈন্য ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

বনিয়াদী বংশের সন্তান হওয়ায়, অন্ততঃ একটা সুবিধা আছে; ঘরানা-ঘরের ছেলে দারিদ্র্যের মধ্যেও মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে সক্ষম।

যে দেশে ভদ্রলোকের আধিপত্য কমিয়া গিয়াছে সেখানে শিষ্টাচার লুপ্তপ্রায়, ভদ্রতাও সুদুর্লভ। দেশের রাজাকে ঘিরিয়া অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া না উঠিলে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব; সাক্ষী ইতিহাস।

বর্তমানকালের দণ্ডবিধি এক অদ্ভুত সামগ্রী; ইহাতে অপরাধী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধিও হয় না, প্রায়শ্চিত্তও হয় না; এখন মানুষকে পাপে যত না কলঙ্কিত করে, প্রায়শ্চিত্তের আড়ম্বরে—সংশোধনাগারের কুসংসর্গে—তদপেক্ষা অনেক বেশী করে।

যে মানুষ অপকর্ম করিয়াছে তাহাকেই যখন সাজা দেওয়া হইতেছে তখন সে আর সে মানুষ নয়।

কোনো একটা কাজ করিয়া শেষে যদি মনে খট্‌কা উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সে কাজ করিবার মতো যোগ্যতা আমার নাই এবং চরিত্রটি ঠিকমত গঠিত হইতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। ভালো কাজ করিয়াও সময়ে সময়ে মনে খট্‌কা লাগে, তাহার কারণ অনভ্যাস, এবং পুরাতন পরিবেশের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্যের অভাব।

তাঁবেদার হইয়া থাকা যাহার পক্ষে অনিবার্য তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা আবশ্যক, যাহাতে উপরওয়ালা তাহাকে খাতির করিয়া চলে। সে জিনিসটা সাধুতাই হোক, স্পষ্টবাদিতাই হোক, আর দুর্মুখতাই হোক।

যে ঘনিষ্ঠতার জন্য লালায়িত, সে মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পারে না; যে মনের কথা বাহির করিয়া লইয়াছে সে আর ঘনিষ্ঠ হইতে চায় না।

'সাধু' উদ্দেশ্যকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে হইলে 'অসাধু' উপায়

অবলম্বন করা ভিন্ন গতি নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপায় লোকে অবলম্বন করিয়া থাকে 'সাধু' উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও ঠিক সেইগুলিই অবলম্বনীয়, যথা—হঠকার, শঠতা, অসত্য, অন্যায়, বিপক্ষের কুৎসা, গ্লানি।

খোশামোদ করিয়া, মন ভুলাইয়া, যাহারা কার্যসিদ্ধি করিতে যায়, তাহারা ভারী দুঃসাহসের কাজ করে। যাহার খোশামোদ করা হইতেছে সে বুঝিতে পারিলেই মুশকিল। খোশামোদ ঠিক ঘুমপাড়ানোর ঔষধের মতো, ঔষধ যদি ধরিল ভালই, নহিলে ঘুম চটিয়া গিয়া মানুষকে অতিমাত্রায় সজাগ করিয়া তোলে।

ভক্তি-শ্রদ্ধাই বল, আর কৃতজ্ঞতাই বল, প্রকাশের বেলায় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। বাড়াবাড়ি করিলেই নিজেকে খাটো বলিয়া মনে হইবে, হীন বলিয়া মনে হইবে, খোশামোদ করিতেছি বলিয়া মনে হইবে। যতই স্বাধীন-চেতা হও আর যতই সাধু প্রকৃতির লোক হও, মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, সত্যের নিকট তুমি অপরাধী।

মানুষ যখন নিজে না বুঝিয়া পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন পুণ্য-কর্ম পাপকর্মের সামিল এবং সমান ভয়ংকর। মানুষ বাহিরের চাপে যে কাজ করে তাহাতে কখনো তাহার গুণের পরিচয় থাকিতে পারে না; যাহা তাহার অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্তি পায় তাহাতেই তাহার যথার্থ পরিচয়।

আমি তোমাদিগকে ভবিষ্যতের গর্ভস্থিত লোকোত্তর মানবের (Superman) কথা শুনাইব। তোমরা মানুষের বর্তমান অবস্থা অতিক্রম করিবার মতো কোন্ কাজ করিয়াছ? অস্ফুট-বুদ্ধি পশু এবং লোকোত্তর মানব—এই দুয়ের মাঝের অবস্থা হইল বর্তমান কালের মানুষ, অর্থাৎ এই আমরা।

"অমুক আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ" এমন কথা মনে হইলে চারু প্রকৃতির লোক মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করে। আর "আমি অমুকের কাছে ঋণী" এই কথাটা মনে পড়িলে হীন স্বভাবের লোক মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতে থাকে।

যাহাদের ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবল তাহারাই বলে "নারীজাতি আমাদের জীবনের বিঘ্নস্বরূপ, শত্রু।" এই কথাতেই কিন্তু তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে; তাহাদের অসংযত প্রবৃত্তিগুলো আতিশয্যের বসে যেন আত্মঘাতী

হইয়া মরিতে চায়, এবং শেষে সেই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায়টিকে পর্যন্ত ঘৃণা করিতে শিখে।

প্রেমার্থী পুরুষেরা কল্পনায় নারীজাতিকে যেমনটি দেখে, প্রেমের প্রভাবে বাস্তবিকই স্ত্রীজাতি ঠিক তেমনই হইয়া উঠে। যে সম্পর্ক আমাদিগকে উন্নত করিতে না পারে, তাহা আমাদিগকে অবনত করিতে বাধ্য। সেই জন্য বিবাহের পর অধিকাংশ পুরুষের মানসিক অবনতি ঘটে এবং স্ত্রীলোকের উন্নতি হয়।

"যাহাকে বিবাহ করিতে বসিয়াছি, বুড়া বয়স পর্যন্ত তাহাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিব কিনা", বিবাহের পূর্বে ইহাই একমাত্র বিবেচনার বিষয়, বাকী শুধু বাক্যাড়ম্বর।

স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে তাহাকে অন্ধের মতো ভালবাসে; যাহাকে ভাল না বাসে তাহার সম্বন্ধে একেবারে অন্যায় করে। স্ত্রীলোকদের ভালবাসা ভারী বিচিত্র, উহার মধ্যে রাত্রির সঙ্গে দিন, আলোর সঙ্গে অন্ধকার একত্র বসতি করে।

যুদ্ধের প্রধান দোষ এই যে উহা বিজয়ীকে অহংকারে বিমূঢ় করিয়া তোলে এবং বিজিতকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে। যুদ্ধের প্রধান গুণ এই যে, উহা মানুষের কৃত্রিম আবরণ কাড়িয়া লইয়া স্বাভাবিক দোষগুণ পরিস্ফুট করিয়া দেয়। ইহা শিক্ষা ও সভ্যতার শিশির-রাত্রি। সেইজন্য যুদ্ধের অবসানে মানুষের ভাল করিবার এবং মন্দ করিবার দুইটা শক্তিই বেশ প্রবল হইয়া ওঠে।

ভাল বলে কাহাকে? যাহাতে মানুষের শক্তিসামর্থ্যের অনুভূতি মনের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া ওঠে তাহাই ভাল;—যাহাতে শক্তিসঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রবুদ্ধ থাকে তাহাই ভাল। মন্দ কাহাকে বলে? যাহা দুর্বলতা হইতে প্রসূত তাহাই মন্দ। সুখ কি? নিত্য-বর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের অনুভূতিই সুখ, বিঘ্ন-বিজয়ের নামান্তর সুখ।

ভাবের প্রাবল্য মহত্ত্বের চিহ্ন নয়; ভাবের স্থায়িত্বই মহাপুরুষের লক্ষণ।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মনের গড়ন একই। দু'জনেই এক সুরে গান গায়; তফাতের মধ্যে একজন চড়া পর্দায় আর একজন নীচু পর্দায়। অথচ এই

সামান্য প্রভেদেই উভয়ের মধ্যে মনান্তরের অন্ত নাই। পরস্পর পরস্পরকে ক্রমাগত ভুল বুঝিয়া জীবন দুর্বহ করিয়া তোলে।

যে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের প্রাবল্য ঘটে পুরুষমানুষ তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পালায়; যে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের একান্ত অভাব, পুরুষ দেখিলে সে নিজেই পলাইয়া যায়।

"পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যায় কি করিয়া?" ভাবিবার সময় নাই, চড়াই সুরু করিয়া দাও।

নৈতিক বিধান আমাদের ভাব-জীবনেরই সাংকেতিক ভাষা।

বাঁচিয়া থাকা বলে কাহাকে? আমাদের শরীর ও মনের যে যে অংশ মরিতে বসিয়াছে তাহা ক্রমাগত প্রতিমুহূর্তে সতর্কতার সহিত নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ার নামই বাঁচিয়া থাকা। যাহা কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহা জরাতুর হইয়াছে, তাহা নির্মমভাবে পরিত্যাগ করার নামই বাঁচিয়া থাকা।

যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারাইয়াছে, তাহার কথা কেউ মানে না, সে কখনো জন-নায়ক হইবার দাবী করিতে পারে না।

ইচ্ছাশক্তির পক্ষাঘাত! সে এক ভয়ংকর সামগ্রী। সভ্যতা যেখানে অধিক দিন আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, মতের বৈচিত্র্য যেখানে অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে, সেই খানেই এ ব্যাধির প্রবল প্রকোপ।

যাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই, সুতরাং যে শত্রুর সম্মুখীন হয় না তাহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারে; কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত নাই, সে একেবারে অমানুষ; সে ঘৃণার্হ।

পুরুষের চোখে স্ত্রীজাতি পক্ষীজাতির মতো; যেন পথ হারাইয়া আকাশ-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে ভারী কোমল, আঘাত সহিতে পারে না; আর একদিকে ভারী দুর্বিনীত, পোষ মানিতে চায় না। ভারী আশ্চর্য, ভারী চমৎকার, ভারী মায়ার জিনিস; ঠিক পাখীর মতই। সেই জন্যই বোধহয় খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়—পাছে পাখীর মতো হঠাৎ উড়িয়া পালায়

তোমরা কানে আঙুল দিতে পার, আমি একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলি; অহংকার মহৎ অন্তঃকরণের একটি প্রধান উপাদান। কথাটা একটু

খুলিয়া বলি, যে বড় হইবে, তাহার কথা যে সকলকে বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হইবে, এ সম্বন্ধে তাহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

(১) সাধারণের কর্তব্য এবং নিজের কর্তব্যের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলা, (২) কর্তব্যের অনুষ্ঠানকে 'ভাগের মা' না করা, এবং (৩) নিজের বিশেষত্বটুকু বিকশিত করিয়া প্রাপ্য সম্মানাদি আদায় করা—এইগুলি আভিজাত্যের লক্ষণ ; প্রতিভার চিহ্ন।

প্রকৃতির রাজ্যে আইন-কানুন আছে বলিলে ভুল বলা হয় ; আইন-কানুন নাই, অবশ্যম্ভাবিতা আছে। কারণ প্রকৃতির আধিপত্যের ভিতরে কেহই হুকুম করিতে আসে না, হুকুম মানিতেও কেহ চায় না ; আইনও নাই, সুতরাং আইন লঙ্ঘনও নাই ; আছে কেবল অবশ্যম্ভাবিতা।

নিজের দুর্গতিতে যে দুঃখ প্রকাশ করে সে ঘৃণার্হ, উহা দুর্বলতার লক্ষণ। দুর্গতির মধ্যে যে মানসিক তেজ রক্ষা করিতে পারে সেই মানুষ, সে অভিজাত।

দুর্দশার মধ্যে পড়িলে সাধারণ মানুষ হয় নিজেকে দোষে, না হয় আর পাঁচজনকে দোষী করে ; দুর্দশাকে সুদশায় পরিণত করিবার চেষ্টা প্রায়ই করা হয় না।

সগর্বে বাঁচিয়া থাকা যখন অসম্ভব, তখন সগৌরবে মরিয়া যাওয়াই শ্রেয় ; যিনি প্রকৃত অভিজাত তিনি ইহাই করিয়া থাকেন।

স্বাধীনতার অর্থ কী ? নিজের নিজের আচরণের জন্য স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছার নামই স্বাধীনতা। নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই স্বাধীনতা।

মানব-জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি, শিক্ষা-সংস্কারের সম্যক অনুশীলনের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বাস্থ্য, শারীর-ক্রিয়া, সামাজিকতা এবং পাথ্যাপথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা-সংস্কার প্রয়োগ করিতে হইবে, জ্ঞান বাড়াইতে হইবে। বাকী কাজ আপনা হইতে হইবে। আত্মার কথা, এখন কিছুদিনের জন্য, শুধু ধর্ম-বক্তারাই ভাবুন।

সাম্যবাদের মতো মারাত্মক বিষ দ্বিতীয় নাই। যে তোমার যোগ্য তাহার সঙ্গে যোগ্যের মত ব্যবহার করা এবং যে অযোগ্য তাহার সঙ্গে যোগ্যের মতো ব্যবহার না করা,—ইহাই তো যুক্তিসংগত কথা। যাহা স্বভাবতঃ অসমান তাহাকে কখনো সমান করিতে যাইয়ো না। অনর্থ ঘটিবে।

ইচ্ছাপূর্বক অযৌক্তিক কথার দ্বারা কোনো বিষয়ের পোষকতা করায় উক্ত বিষয়ের যত ক্ষতি সংসাধিত হয়, এমন আর কিছুতে হয় না।

যে সমস্ত ধর্মমতের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্মই ধ্রুব এবং চিরন্তন।

"সকলের সমান অধিকার" ইহা অসত্য এবং অন্যায়ের একটা অদ্ভুত ছদ্মবেশ। কারণ, এতদনুসারে সমাজ গড়িলে যে ব্যক্তি যথার্থ বড় সে কখনো ন্যায্য প্রাপ্য পাইবে না।

আমরা এতদিন কেবল ভিক্ষা করিয়াছি, এইবার ভিক্ষা দান করিবার মতো যোগ্যতা অর্জন করিব।

বিষয়-নির্বাচনেই কবির বিশেষত্ব; শিল্পই শিল্পীর শ্রদ্ধাপ্রকাশের একমাত্র ভাষা।

মৌলিকতা কি? সে সামগ্রীর বা যে ভাবের এখনো নামকরণ হয় নাই, অথচ যাহা সকলের চোখের সামনে রহিয়াছে, তাহাকে নাম-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট করার নাম মৌলিকতা; যাহার নাম নাই তাহা সাধারণ লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। নাম কর্ণগোচর করিতে পারিলে, তখন জিনিসটাও দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে। অধিকাংশ মৌলিকতা বিশিষ্ট ব্যক্তি নামকরণে সুদক্ষ।

যাহাদের মনের গড়ন খুব সূক্ষ্ম এবং সুন্দর, বিপদের আঘাতে তাহাদেরই বিকল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। যাহাদের মনের গড়ন মোটা ধরনের তাহারা ওরূপ বিকল হয় না। মানুষের আঙুল কাটা পড়িলে আর গজায় না, কিন্তু টিকটিকির লাঙ্গুল পর্যন্ত কাটা পড়িলে আবার গজায়।

বিপদের মধ্যে যে বাস করে, বাঁচিয়া থাকার তুচ্ছতম উপকরণটির মধ্য হইতেও সে যথেষ্ট আনন্দ-রস দোহন করিয়া লইতে পারে। আগ্নেয়গিরির উপত্যকায় নগর বসাও, দুর্গম সাগরে জাহাজ লইয়া যাত্রা কর, বিরোধের মধ্যে বাস করিতে শেখ, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগকে কিছু দিয়া যাইতে পারিবে।

স্মরণশক্তি যাহার প্রখর সেই কথা দিয়া কথা রাখিতে পারে; কল্পনাশক্তি যাহার তীব্র সেই পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম। বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে নৈতিক জীবনের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ধর্মনীতির সূত্রে যাহার যত বেশী দখল, মানুষের প্রতি ঘৃণা তাহার তত প্রবল। নীতিশাস্ত্রকে মান্য করার অর্থ মানুষের জীবন-যাত্রাকে অপমান করা।

মানুষের "বড় কাজের গোড়া আত্মম্ভরিতা, মাঝারি কাজের মূল অভ্যাস, এবং ছোট কাজের গোড়া ভয়" যদি বলা যায় তবে নিতান্ত ভুল হয় না।

যে যে জিনিস দুর্বলতা এবং অবসাদের জনক, মানুষকে আমি সে-সকলের মুখের উপর 'না' বলিতে শিখাই। আর যে যে জিনিস তেজের উদ্দীপক এবং বলের বর্ধক, সে সকলের সম্মুখে 'হাঁ' বলিতে শিখাই।

আত্মস্থ শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিবার অনেক প্রণালী আছে, সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশও আছে। কতকগুলি উপদেশ, কেবল, আত্মসংযমী, শক্তি-উদ্বোধনে এবং শক্তি-প্রয়োগে, অংশতঃ অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য, আর কতকগুলি সংযমে অনভ্যস্ত সাধারণ লোকের জন্য। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মধ্যে আছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে খ্রীষ্টের ধর্মে।

সংকীর্ণ ধর্ম-বিশ্বাসের যেখানে অবস্থান, শিল্পের সেইখানে আরম্ভ।

শিক্ষা-সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রসব এবং চিত্ত-প্রসাধনের চরম উপাদান সংগীত।

প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩২০)

স্বপ্ন-দর্শন

(বানান-বিষয়ক)

ডালহারাদের মেয়েটাকে ছাগল দুধের দাম চুকিয়া দিয়ে সেদিন দুপুর বেলার গুমোটে, মিন্‌মিনে বর্জাইস হরফে ছাপা একটা দেড়গজী প্রবন্ধ পড়তে পড়তে চোখের ভিতর যখন ক্রমাগত কর্‌কর্‌ করতে লাগল তখন অগত্যা চোখ বুজলুম। কিন্তু এই ল্যালানোতেই যে ল্যালানো তা বুঝ্‌তে পারিনি। চোখ যে বুজেছি এইটুকুই জানি, সঙ্গে সঙ্গে নাক যে ডেকেছে তার খবর রাখিনি।

হঠাৎ মনে হ'ল, কাঁচা বয়সের কাঁচা-মিঠে গলায় কে যেন বলে উঠল, "ইদো, ইদো সহীও!" আরে! এ যে চেনা গলা! এ যে শকুন্তলার কথা। কল্পনালোকের এই অনিন্দ্যসুন্দরীকে চোখে দেখবার লোভে, যেদিক থেকে

গলার আওয়াজ শুনেছিলুম সেই দিকটা লক্ষ্য করে একটু জোরে চলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কেন জানি না, পারলুম না ; আওয়াজ মিলিয়ে গেল, কাউকে দেখতে পেলুম না।

যখন শকুন্তলার আশা ছাড়লুম, তখন খেয়াল হ'ল যে, যে-রাস্তা দিয়ে চলেছি সে একটা অচেনা রাস্তা, অজানা নগরের একপ্রান্তে তার অবস্থিতি। পথে জনমানব নেই। খানিক চলেই যেমন মোড় ফিরেছি, দেখি সামনে একটি ছোট্ট নদী ঝিরঝির ক'রে বয়ে যাচ্ছে, আর তার ধারে ধারে সার-বাঁধা যজ্ঞি-ডুমুরের গাছ। আরে! এ তবে শিপ্রা! উজ্জয়িনীর শিপ্রা! "শিপ্রাবাতঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরানাম্।" হাল্কা হাওয়া মিহি ঢেউয়ের জাল বুনে সুন্দরী শিপ্রার বুকের উপর খেজুর-ছড়ি ওড়না জড়িয়ে দিচ্ছে—"শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা চাটুকারঃ।"

হায়! এমন জায়গায় এসেও শকুন্তলাকে দেখতে পেলুম না ; এখন করা যায় কি? উজ্জয়িনীর কোন্ "রসবৎ ফলের" আস্বাদ গ্রহণ করি? সামনে তো কেবল ডুমুর গাছ ; ভাল, যজ্ঞিডুমুরের ফল, শুনেছি, খেতে খুব মিষ্টি, সেটা এইখানেই—এই কাননোদুম্বরের বনেই পরখ করে দেখলে কেমন হয়? চল্লুম ফল খুঁজতে খুঁজতে গ্রীষ্মবিরল-পাদপচ্ছায়া সেই পথ ধরে। কিন্তু একটা গাছেও কি ফল আছে? নাঃ। হয়রান হয়ে পড়া গেল। উজ্জয়িনীতে লেমনেড্ পাওয়া যায় না? কিংবা বরফ-জল? অন্ততো ডাব? ঐ যে একটা বাড়ী, মস্ত বাগান-বাড়ী। দরজায় আবার কি যেন লেখা রয়েছে! ও! তাই নাকি?…"বররুচির বৃক্ষবাটিকা!" হন্‌হনিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ডাকলুম, "বেয়ারা।"

ভিতর থেকে স্নিগ্ধ গম্ভীর আওয়াজ এল, "কে বাপু?"

"পথ চল্‌তি লোক। একটু বরফ-জল খাওয়াতে পারেন? ডাব হলেও হয়।"

"ভিতরে এস।"

ভিতরে গিয়া দেখি একজন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আধা-বয়সী লোক এক রাশ শিরীষ ফুল আর একরাশ ভূর্জপাতার পুঁথির মাঝখানে বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন,—"বরফ এখানে দুর্লভ হলেও এবং হিমালয়

সুদূর হলেও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রসাদে বররুচির ঘরে বরফজলের অভাব নেই। কিন্তু তার চেয়ে কর্পূর-দেওয়া মহিষের কাঁচা দুধ আমি উপাদেয় মনে করি। বিশেষতো পথশ্রমের পর।...এখন তোমার যা অভিরুচি।"

আমি বললুম, "বররুচির যা' রুচি-রোচন, অন্ততো সেটা পরখ ক'রে দেখতে কোনো ভদ্রলোকের আপত্তি থাকতে পারে না।" খুশি হ'য়ে বররুচি ঈষৎ হেসে বললেন, "তোমার নাম কি বাপু?"

"আজ্ঞে, নবকুমার কবিরত্ন।"

"কবিরত্ন? বেশ, বেশ তা' হলে আজ খানিক কাব্যালাপ হবে। তোমার বাড়ী কোথায়?"

"মাফ করবেন, এটি বলতে পারব না।"

"সে কি? কেন?"

"আজ্ঞে আমার দেশের নাম বাংলা, কি বাঙ্গলা, কি বাঙ্গালা তা কিছুই আজ পর্যন্ত ঠিক হয়নি, সুতরাং কোন্‌টা বলব ঠাউরে উঠতে পারছিনি।"

বররুচি হো-হোঃ শব্দে হেসে উঠে বললেন—"আচ্ছা, লিখে বল।"

—"আজ্ঞে মুখে বলায় ত্রিবিধ দুঃখ, লিখে বলায় ততোধিক—পঞ্চবিধ—এই দেখুন—বাংলা, বাঙ্‌লা, বাংগলা, বাঙ্গলা, বাঙ্গালা।"

"অতো হাঙ্গামায় প্রয়োজন কি? যেমন বলে থাক ঠিক তাই লেখ।"

"আজ্ঞে, তা' হলে যে ভাষায় অতিচার হয়।"

"আর তা না হলে যে লেখনীর মিথ্যাচার হয়, তার কি? মুখ যা উচ্চারণ করছে হাতের আঙুলগুলো তা লিপিবদ্ধ না ক'রে হঠাৎ গুরুমশায় সেজে কান মলার মতন করে জিভ্‌ মলে দিতে আসবে সেটাই বা কি রকম? আমরা বাক্‌কেই দেবতা বলে স্বীকার করি, হংসপুচ্ছ তো আর দেবতা নয়। সে দেবতার ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ করে থাকে, এই তার কাজ। কোথায় হংস সরস্বতীর পায়ের তলায় থাকবে, না বাক্‌-দেবতাকে তোমরা হংসপুচ্ছের তলায় রাখতে চাও?"

—"আজ্ঞে তা না হলে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ থাকবে না যে,—আমাদের ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা—অর্থাৎ কিনা দেবভাষার দুহিতা কিংবা দৌহিত্রী কিংবা প্রদৌহিত্রী তা ঠিক লোকে চিনে উঠতে পারবে না। তার উপায়?"

—"দেখ বাপু! এটা তোমার কবিরাজ-কবিরত্নের মতন কথা হ'ল; আমি শুধুই কবি, কাজেই স্বভাবের দোষে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতের ভক্ত। প্রাকৃতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়েছি, আর তার রসবোধে অন্যের সুবিধা হবে বলে প্রাকৃতের ব্যাকরণও রচনা করা গেছে। তাতে সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যোগ বাগ্‌দেবতা যতটুকু রক্ষা করেছেন, সেইটুকুই রক্ষা করে চলেছি। আমি আমার লেখনীর বেড়া দিয়ে দুটোকে এক খোঁয়াড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করিনি। কারণ ব্যাকরণে বৈয়াকরণের নিজের করণীয় কিছুই নেই। জ্যোতির্বিদ যেমন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করে থাকেন, বৈয়াকরণ তেম্‌নি বাণীর চরণাঙ্ক ভূর্জপাতায় ধরে নেবেন, তার উপর কোনো কারিগরি ফলানো তাঁর এলাকার বাইরে। আর পুরনোর সঙ্গে নূতনের যোগ? তাও কি জোর করে রাখা চলে? প্রসবের পরে প্রসূতির সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর যোগ যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই মঙ্গল। নইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। সেইজন্যে শিশুর নাভি থেকে সদ্য নাড়ী কেটে ফেলার ব্যবস্থা আছে।"

"আচ্ছা, মা'র যদি পটল-চেরা চোখ হয়, তবে মেয়েরও চোখ কি সেই রকম পটল-চেরা হবে না?"

"উচ্ছে-চেরাও হতে পারে, আটক নেই। দশভুজার মেয়ে লক্ষ্মী সরস্বতীর দুটো দুটো বই হাত নয়; সংস্কৃতের সাতটা বিভক্তির জায়গায় প্রাকৃতে মোটে গোটা দুত্তিন। তবে মা পদ্মপলাশ-লোচনা বলে, যে পোটো কুক্কুটনয়না মেয়েকে পদ্মপলাশলোচনা-রূপে অঙ্কিত করে সে মিথ্যাচরণ করে। সে মিথ্যাবাদীর অধম। কারণ একশোটা মিথ্যে বলা আর একটা মিথ্যে লেখা তুল্যমূল্য। সংস্কৃতের "দর্পগর্বিত ভৃত্য" বাক্‌-দেবতার অলঙ্ঘ্য অনুজ্ঞায় প্রাকৃতে "দব্ব গব্বিদ ভিচ্চ" হয়ে পড়ে, তার রেফ ঋফলা, তার শিখা উপবীত স্খলিত হয়ে পড়ে, প ব হয়, ত চ হয়, স্বয়ং ব্রহ্মাও তা আটক করতে পারেন না।"

"আপনি এ বলছেন কি? আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

"কেন সন্দেহ কিসের? সন্ধির নিয়মগুলো কি করে হয়েছে তা জানো? মানুষের চিরচঞ্চল জিভ কথা কইবার সময় জিহ্বামূল থেকে দন্ত পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়; সেই সময়ে বর্ণে বর্ণে ধাক্কা লেগে যে সব ভাঙচুর

আপনি হয়ে পড়ে এবং যে-সমস্ত মাঝামাঝি রফা অনিবার্য হয়ে ওঠে সেই-গুলোকেই সূত্রের আকারে লেখা হয়েছে বই তো নয়? এ-সব যে রসায়নের নিয়মের মতন বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এখনো কি সন্দেহ ঠেকছে। পাণিনিকে ডাকব? না পদ্মযোনির কাছে যাবে? কার কথায় তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হবে?...অবাক্ কাণ্ড!...এই যে মহাত্মা পাণিনি! স্মরণ করবামাত্রেই উপস্থিত হয়েছেন। আসুন, আসুন, আসনে সুখাসীন হৌন। আপনি অনেক দিন বাঁচবেন দেখছি।"

পাণিনি হেসে বললেন, "বাঁচব কিহে? আমি যে ঢের দিন মারা গিয়েছি?"

বররুচি। "কীর্তির্যস্য স জীবতি।"

"ভাল, ভাল কিন্তু 'মরে বেঁচে কিবা ফল ভাই!' বছরে গণ্ডুষকয়েক জল আর গোটাকতক তিল ছাড়া তো কিছু খাদ্যপানীয় পাবার জো নেই। এখন, অসময়ে স্মরণ করেছ কেন? তা বল।"

"এই অভ্যাগতের সন্দেহ মোচন করতে হবে।"

"কি সন্দেহ?"

"এঁর জিজ্ঞাস্য,—যা বলি তাই লিখব? না, যা বলতুম বা আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলতেন বলে শুনেছি বা যা কেবলমাত্র আর্য-এম্পারাণ্টো অর্থাৎ যা কেউ কস্মিনকালে বলেন নি তাই লিখব?"

"এ সম্বন্ধে তুমি তো আমার মতামত জানো। প্রপিতামহের বুলিই যদি লিখতে লিখতে নখের ছন্দ খোয়াব তবে আমার বুলি লিপিবদ্ধ করবে কে? প্রপৌত্র? সম্রাট সর্বদমন যখন সিংহাসনে তখন দুষ্মন্তের নাম কি স্বর্ণমুদ্রায় উঠবে? না রামচন্দ্রী মোহরে ককুৎস্থের বলদ-চড়া মূর্তি অঙ্কিত কর্তে হবে? মনুষ্য-জন্মের পূর্বে মানুষের গো-জন্ম হয়ে থাকে, তাই বলে সেই পুরাতনের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে কেউ কি মুকুটের বদলে একজোড়া গরুর শিং মাথায় পরে?"

"তবে?"

"তবে আর কি? কানে যা শুনছ চোখে তাই দেখতে হবে। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ রাখলেই গোলে পড়বে। পুরাতনের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ বুঝিনি। আমি

যখন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ লিখছিলুম, তখন বৈদিক সংস্কৃতের পাণ্ডা স্বয়ং লোক-পিতামহ যদি চতুর্মুখে 'হাঁ-হাঁ-হাঁ' করে হামার হয়ে আমাকে মানা করতেন, তা'হলেও আমি তাতে কর্ণপাত করতুম না। যাকে ভগবানের ভাষা বলে মেনে থাকি সেই বেদের ভাষাকেও যখন রেয়াৎ করিনি তখন 'অন্তে পরে কা কথা?' "

বররুচি বললেন, "আমিও যখন প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচনা করি তখন, "হেতুচক্র-হমরু" রচয়িতা তার্কিকচূড়ামণি দিঙ্‌নাগও আমাকে বাধা দেননি। তাঁর উপাস্য শাক্য বুদ্ধ প্রাকৃতের পক্ষপাতী ছিলেন বলে তিনিও আমায় অতিচারী বলতে সাহস করেন নি।"

পাণিনি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে হঠাৎ দ্বাদশ সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলোয় দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দেখলুম একজন দিব্যকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ অনিমেষ চক্ষে বররুচির দিকে চাইতে চাইতে হাসতে হাসতে আসছেন। নিকটে এসে তিনি বললেন, "তোমরা অতিচারের কথা কি বলছ? এবারকার পাঁজি দেখেছ? আমি বৃহস্পতি, দেবতাদের গুরু, এবার আমিও যে অতিচারী হয়েছি। যে রাশিতে এক বৎসর থাকবার কথা সেখানে চার মাস থেকেই সরে পড়েছি। অতিচারের কথা কি হচ্ছিল?"

আমি অভিবাদন করে সহসা সাহসভরে বললুম—"আপনি অতিচারী হয়েছেন বলে আমরা অতিচারী হলে লোকে গতানুগতিক বলবে। যদিচ ফোর্ট উইলিয়মের বাংলা অতিচারী হয়ে পঞ্চাশ বছরের ভিতর খোল নল্‌চে দুই বদ্‌লেছে আর তা সবাই জানে, তথাপি দূষতে কেউ ছাড়বে না। কথা হচ্ছে এই, বাংলা বানান সম্বন্ধে গুটিকতক আমার প্রশ্ন আছে, আপনি তার সদুত্তর দিলে কৃতার্থ হব; আপনি বৃহস্পতি, বাচস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই, সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রশ্নের উত্তর দিন।"

তখন তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ সুর-গুরু অগ্নিশিখার মতন ঋজুভাবে অবস্থিত হয়ে বললেন—"তোমার প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই, তোমার যা যা জিজ্ঞাস্য তা সবই আমি জানি। একে একে তোমার মানস প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্চি, অবহিত হও।

একটি কথা বানাতে বাক্‌যন্ত্রের যে যে পর্দার ব্যবহার হয় তারি বর্ণনা হ'ল

বানান। যে যে হরফ দিয়ে কথাটি বানানো হয়েছে, কথাটি বানিয়ে, কিনা, চিরে চিরে তাই দেখিয়ে দেওয়াকেও বানান বলতে পার।

(১) গোড়ার কথা এই, তোমরা বর্ণমালা ঠিকমত চেন না, সেই জন্যে, গোড়ায় গলদ থেকে গেলে যা' হয় তোমাদের তাই ঘটেছে। উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে পাকা-রকম জ্ঞান থাকলে আর বর্গীয়-জ অন্তস্থ্য-য দন্ত-স তালব্য-শ বলবার দরকার হয় না। সেই সেই জায়গা থেকে বর্ণগুলির উচ্চারণ করতে পারলেই বানান ঠিক হয়। তখন যা বাংলার নয় তা আর বাংলায় লাগাতে যাবে না। এমন কি লাগাতে পারবে না। যা বাংলার ধাতে খাপ খায় না তা আপনি অদর্শন হবে, বেড়াচির লেজের মতন খসে পড়ে যাবে। তখন সংস্কৃত আর তোমাদের হাতে পড়ে বিকৃত হবে না। বাংলাও বানানের গোলযোগে জংলা হয়ে উঠবে না। উচ্চারণ সম্বন্ধে কাশীও তোমার গুরু নয়, দাক্ষিণাত্যও নয়। বাক্‌যন্ত্রই হচ্ছে উচ্চারণের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। কোন্‌টা মূর্ধা কোন্‌টা তালু সেইটে চিনলে সকল গোলই মিটবে।

(২) তোমরা জিহ্বামূলীয় পঞ্চমকে উঁআ বল। তালব্য পঞ্চমকে ইঁয়োঁ বল। 'য়' কে ইঅ বল, 'ক্য' কে 'কিঅ' বল, 'ক্ষ' কে 'খিয়ো' বল, এ কী অদ্ভুত? এক হরফের নাম একাধিক অক্ষরে প্রকাশ করবার মূঢ়তা, আর যে দেশেই থাক ভারতবর্ষে ছিল না, অবশ্য ইকার উকার ইত্যাদি স্বরচিহ্ন বাদে। অন্য দিকে একই ধ্বনি বোঝাবার জন্যে কখনো একাধিক চিহ্নও চলিত ছিল না। কিন্তু তোমরা আধুনিকেরা কেন এরকম কর? জিহ্বার জড়তা এর জন্যে দায়ী, না শিক্ষকের মূঢ়তা? 'য়' র মধ্যে ই এবং অ দুইই আছে, সত্য, কিন্তু আধ আধ মাত্রা। যার জিভ চটপটে সে ঠিক উচ্চারণ করবে, যে জবড়জং সে 'ইঅ' বলে হাস্যাস্পদ হবে।

'ড'র উচ্চারণ 'তিঙন্তে' রয়েছে, লুঙে, লঙে, বিধিলিঙে রয়েছে, ব্যাকরণের অনেক সূত্রে রয়েছে। তোমাদের কৃত্তিবাস লিখেছেন—"ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদে বসতের সাধ।" শূন্যপুরাণ লিখেছেন—"কাত্তিকের সোলুঙেতে নাহিক আফুলা, অঘ্রাণে পাকয়ে শিষ নামিএ পড়ে কলা॥" 'ঙ'র প্রকৃত উচ্চারণ তোমাদের রাঙায় রয়েছে, ভাঙায় রয়েছে। যদি রাঙ্গা লেখ, ভুল লিখ্‌বে। কারণ তা'হলে দাঙ্গা হাঙ্গামা লিখে শেষে দাঙা হাঙামা পড়ে ফেলবে। তালব্য

পঞ্চমের উচ্চারণ তালু থেকেই করতে হয়, বলা বাহুল্য। মূর্তিমান "ঞ" ভূস্বর্গ কাশ্মীরে প্রচুর, যেমন—মানে=মাঞি, বোন্=ব্যঞ; পোঞ্=জল, পণ্ডিতানী=পণ্ডিতাঞ্; বেনেবউ=বাঞ্যঞ। ধান=দাঞ্; হুঞ=কুকুর, তঞর=তন্তুতা, কৃশতা। স্বাধীন 'ঞ' আসামেও আছে, যেমন—চিঞবিলে =চেঁচাইলে। প্রাচীন বাংলায়ও প্রচুর—"এক ঠাঁই হঞাছেক পর্বত অপার", "মুঞি-ব্রহ্মা, মুঞি বিষ্ণু, মুঞি মহেশ্বর"—কৃত্তিবাস। "মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাঞি, সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি।"—চৈতন্য-ভাগবত। এখন, বোধ হয়, বুঝতে পেরেছ ঙ ঞ অন্য ব্যঞ্জনের তুল্য পৃথক আসন পেয়ে থাকে, অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এর একমাত্র ধর্ম নয়।

(৩) বাংলায় দুই স্বরাক্ষর যে পরে পরে বসে এ বিষয়ে তোমার যে সন্দেহ-মাত্র হয়েছে এইটেই আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে। দেখতে চাও? এই 'এই'ই দেখ, 'আইরী' ক্ষেতে দেখ, 'আইলে' ফকিরের 'আওন-যাওনে' দেখ। 'ওই' দেখ—"ইন্দ্র 'আউল' ঐরাবতে"। আবার, আইনে দেখ, বে-আইনীতে দেখ, পরে পরে দুই স্বর বসে কিনা। তুমি উড়িয়ে দিলে কি হবে, ওই দেখ—"হাসিয়া চায় 'আউদড়' দিষ্টি, ডাক বলে ওই সে নষ্টি"। যারা "দুধ আউটে ক্ষীর করে" তারাও যে একথা জানে। যারা আওতার চারা ফাঁকে বসায়, তাদেরও এ অবিদিত নেই। যারা আউড়ে আউড়ে পড়া মুখস্থ করে তাদের তো কথাই নেই। এর গোড়া কোথায় জান? ওই শোন কালিদাস কি বলছেন—

"অঅং মিও, অঅং বরাহো, অঅং সদ্দুলোত্তি"

"কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ!"

(৪) অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু আর জিহ্বা-মূলীয় পঞ্চমের মাঝামাঝি। বাংলায় প্রায় 'ঙ'র মতন হয়ে পড়েছে। সুতরাং হসন্ত 'ঙ'র জায়গায় অনুস্বার দিলে মারাত্মক হয় না। তবে ওর ভিতর যদি 'গ' এর গন্ধ পাও তা'হলে প্রহ্লাদের 'ক' দেখে কেঁদে অজ্ঞান হওয়া হবে। মারাঠিতে অনুস্বার ত্রিবিধ; (ক) বর্গস্থানোদ্ভূত অর্থাৎ 'ং'=ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্। যেমন শঙ্কা=শংকা···(খ) নাসিক্য, প্রণবে এর প্রকৃত উচ্চারণ দেখতে পাবে। (গ) ং=বঁ্, যেমন—সংহার=সবঁ্হার (দন্ত্যোষ্ঠ্য)।

(৫) এখন স্বরবর্ণের গায়ে আকার ইকার দেওয়া যায় কিনা এই তোমার

জিজ্ঞাস্য ? আচ্ছা প্রথমে বিচার করে দেখ যে বাংলায় যাকে স্বরবর্ণ বলা হয় সেগুলি খাঁটি স্বর না বর্ণমালার বর্ণসংকর ? না হিব্রুর মতন সমস্তই তোমাদের ব্যঞ্জন মাত্র, কখনো কখনো 'া' 'ি' 'ী' 'ে' প্রভৃতি স্বর তন্মাত্রের সাহচর্যেও শব্দিত হয়ে থাকে। তোমাদের 'গাওনা' 'পাওনা' 'নওলা' 'দওলা' দেখলে তো তাই মনে হয়। ভাউলে, আউলে, সাউথুরি দেখলেও তাই মনে হয়। তোমাদের 'আইরী ক্ষেতের' 'পাইরী আমের' 'ই' কি স্বরবর্ণ, না বর্ণচোরা ব্যঞ্জন ? না হসন্ত স্বর ? পাইট বোতলের 'ই'কারের যে ওজন 'পাইরী' আমের 'ই'ও কি তাই ? হসন্ত 'ও'র জায়গায় অন্ত্যস্থ 'ব' চলতে পারে, কিন্তু ডাইনীর ইকার কোন্ সর্বে পড়ায় বশ করবে ?

(৬) সংস্কৃতের স্বরমালা যদি বাংলায় এসে সত্যই কতকটা ব্যঞ্জন-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তবে তার গায়ে ফলা দিতে হানি কি ? বিশেষতো যখন বিবৃত 'এ'কার অর্থাৎ অ্যাকারটার দরকার রয়েছে, তখন ঠ্যাকার করে ঠেকিয়ে রেখে লাভ কি ? হ্যাদে ছ্যাখো, বাপু, ব্যাকরণকে না হয় বেআকরণ বা ব্-য়াকরণ পড়লে, কিন্তু 'হ্যাদে'টা পড় কি ক'রে ? হেআদে ? না হিআদে ? ওটা কিন্তু খাঁটি বাংলা কথা।

(৭) বিসর্গকে বিসর্জন দেবে ভাবছো ? ভালো। মুখে দুক্খ বলে, লেখবার বেলায় দুঃখ লিখে আর মায়া বাড়ানো কেন ? শেষের বিসর্গ উঠিয়ে দিয়ে প্রাকৃতের নিয়মে ওকার যোগকরা সমীচীন। যেমন—'ক্রমশো,' নইলে ক্রমশ লিখলে লোমশ শব্দের সঙ্গে মিল দিতে ইচ্ছা হতে পারে। সংস্কৃতে বিসর্গ অনেকটা ফার্সীর হে-হাওয়াজ, অর্থাৎ হাওয়ার মতো হাল্কা 'হ'। তাই বলে নমোনমঃ=নমোনমহ নয়। র-জাত স-জাত বিসর্গে 'ঃ' এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খাটতে-নারাজ বাক্‌যন্ত্র 'র্' বা 'স্' স্পষ্ট উচ্চারণ করার পরিশ্রমটুকু বাঁচাবার জন্যে কণ্ঠের উপর বরাত দিয়ে ছায়, আর কণ্ঠও বেগারের কাজ বেগার ঠেলার মতো করে অর্থাৎ সিকি মাত্রা হসন্ত 'হ' বলেই ছুটি নেয়। দুর্ভিক্ষে ভিখিরীরাই আগে মারা যায়, যে আশ্রয়-স্থানভাগী তার উপর কারো দরদ নেই। তার মরণই মঙ্গল।

(৮) তোমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে ভাষাকে কটমটে করলে তেজব্যঞ্জক হয় কিনা। তার সোজা উত্তর এই, যে, প্রাণে তেজ না জন্মালে বাণীতে তেজ

আসবে না, তা পুরোনো হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে হেঁসেল ঘরটা যুক্ত অক্ষরের হাণ্ডি-কুণ্ডি দিয়েই সাজাও আর বাঙালীকে বাঙ্গালীই বল আর যাই কর। বাংলা বলা ও বাংলা লেখার এক রকম চেহারা হলে তোমাদের সংস্কৃত উচ্চারণও খাঁটি হবে, চণ্ডীও আর অশুদ্ধ হবে না, নইলে "জা দেবি শর্বভূতেষু ত্রিশ্‌টা-রূপেন শংস্থিতা নমস্তশ্‌শৈ নমস্তশ্‌শৈ নমস্তশ্‌শৈ নমোনমহ" বলে চণ্ডীপাঠ করলে চণ্ডী রাগে উগ্রচণ্ডী হয়ে তোমাদের মুণ্ডে প্রচণ্ড বেগে চপেটাঘাত করবেন, এটা স্থির নিশ্চয়, জেনো।"

বৃহস্পতির এই বাক্যে ঘনীভূত আশঙ্কার উদ্বেগে অকস্মাৎ ঠক্ করে টেবিলে মাথাটা ঠুকে গেল। চট্‌কা ভেঙে চেয়ে দেখি, আমি যেখানকার ঠিক সেইখানেই বসে আছি, কোথায় বা বররুচির বৃক্ষবাটিকা আর কোথায় বা সুরগুরু বৃহস্পতি। রাস্তা দিয়ে ফিরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে "রুটি-ই-ইস্কে—পোও্‌উরুটি-ই!"[১]

প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩২৩)

তেহাই

(সাহিত্য রসাশ্রিত দার্শনিক-দানাদার নাট্যরঙ্গ)

নাটকীয় পাত্র-পাত্রী

আমি	কামার
মগজ	কুমার
কাগজ	দালাল
গজকাঠি	তাঁতী
বর্গীয় জ (ওরফে জগন্নাথ, ওরফে জগৎ-পিতামহ)	ঢাকী
ওড়িয়া পাণ্ডা	টিকটিকি

[দৃশ্য—চুরোটের ধোঁয়া, চিমনীর ধোঁয়া ও চুলার ধোঁয়ার ত্রিবেণী-সংগম]

আমি ॥ দিনে আলো আছে, নিশীথে কালো আছে, আসমানে ব্লু আছে, জমিনে সবুজ আছে, আসামে কমলা আছে, হলুদে হলদে আছে, কীর্তিবাসের

১. রচনাটি সত্যেন্দ্রনাথের ছদ্মনাম শ্রীনবকুমার কবিরত্ন নামে প্রকাশিত হয়।

রামায়ণে নীল আছে, ইউরোপে ভার্সেই উদ্যানে ভায়োলেট আছে, লঙ্কায় ঝাল আছে, আবার লাল আছে, কিন্তু বেগুনী কই ? সে যে স্বর্গে ছিল, স্বর্গের রাজার রামধনুটিকে সে যে সুনিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, সে গেল কোথায় ? সে যে স্বর্গের জিনিস, মর্ত্যের পথে কোথায় পথহারা হইল ? সে কোথায় গেল ? আমার বেগুনী কোথায় গেল ?

মগজ ॥ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, সে বোধ হয় হদিস দিতে পারিবে। অনেক সময়ে আমি যে-কথার জবাব দিতে পারি না, হৃদয় অতি সহজেই তাহার একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলে। বলিতে কি স্বয়ং হৃদয়েশ্বর যাহা না জানেন, হৃদয় তাহাও জানে।

আমি ॥ বটে বটে, আমি হৃদয়কে ডাকিতেছি। হৃদয়! ও হৃদয়! ও আমার হৃদয়বন্ধু হৃদয়! জবাব দাও, বল আমার বেগুনী কোথায় ?

মগজ ॥ রোস রোস আমি ভুল করিয়াছি। তোমার হিদে জোলার নাতি হৃদয়ের আর তুমি সাড়া পাইবে না। বর্তমান জ্ঞান-গরীয়ান যুগে হৃদয় বেচারা বয়ঃপ্রাপ্ত বেঙাচির লেজের মতো খসিব খসিব হইয়া আছে। বেচারা বড় কাবু হইয়া মনস্তত্ত্ববিদের হাসপাতালে পড়িয়া অসাড় অচৈতন্য অবস্থায় আছে। উহাকে ডাকিলেও সাড়া পাইবে না। এখন হৃদয়ের শূন্য জায়গাটাতে খানিকটা কাগজ পুরিয়া রাখা হইয়াছে। কাগজ এখন হৃদয়ের একটিনি করিতেছে। সুতরাং মগজ ও কাগজে মিলিয়া যে জুড়ি হইয়াছে বর্তমান সভ্যতা সেই জুড়ি হাঁকাইয়া মানুষকে তাহার ঈপ্সিত অর্থাৎ তুমি যাহাকে বেগুনী বলিলে, বোধ হয় তাহারই অভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

আমি ॥ এখন উপায় ? বেগুনীর সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে ?

মগজ ॥ কাগজের কাছে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কাগজ ॥ বেগুনী ? বেগুনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? এ ভারী কঠিন প্রশ্ন। বিশেষতঃ এই ত্রি-ধোঁয়ার রাজ্যে। দেখ, আমি একজন ওড়িয়াকে বেগুনী খাইতে দেখিয়াছি। উহার পেটের মধ্যে বেগুনী পাওয়া যাইতে পারে। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর। চট্ করিয়া ঐ ওড়িয়া পাণ্ডাটিকে ধরিয়া আন তো। উহার কাছে সমস্ত সমাচার পাওয়া যাইবে। আমি যদিও কাগজ অর্থাৎ সমাচার-পত্রিকা অর্থাৎ বর্তমান যুগের হৃদয়ের নাড়ী, তথাপি রিপোর্টার

ভিন্ন আমার গতি নাই। ঐ ওড়িয়া পাণ্ডার বাক্য আজকে আমার রিপোর্টারের পত্র হইবে। ডাক, ডাক উহাকে ডাকিয়া আন।

আমি ॥ পাণ্ডা ঠাকুর! ও পাণ্ডা ঠাকুর! ও ওড়িয়া!

ওড়িয়া পাণ্ডা ॥ আরে কাঁই কি এমতি হউছ?

আমি ॥ বলি, আমার বেগুনী কোথায়?

ওড়িয়া পাণ্ডা ॥ কঁড়? বেগ্‌গুনী? বেগ্‌গুনীর কথা কউছ? সিয়ে আহ্ম ওড়িয়া সব্ব সোরিষত্যালের ভাজি কীরি বেসম্ম দেই কীরি মজা করি কীরি কাড়ি রাত্তিকু খাইথিলে। বেগ্‌গুনী আর কুথা?

আমি ॥ হায় মগজ! হায় কাগজ! সর্বনাশ হইয়াছে। এই ওড়িয়া আমার বেগুনীর প্রাণ সংহার করিয়াছে। নববর্ষায় রামধনুকের একটা শুঁড় যখন একাগ্রভাবে ধরণীতে মুখ জোবড়াইয়া শিলীন্ধ্র অর্থাৎ বেঙের ছাতা ভোজন করিতেছিল, আমার বেগুনীও সেই সঙ্গে মর্ত্যে নামিয়াছিল, এবং নামিবামাত্র কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেগুন বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই ওড়িয়া বোধ হয় তাহাকে নামিতে দেখিয়াছিল এবং বেগুনের অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া একীভূত হইতে—অভেদাত্মা হরিহর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সবুজ ফলে যে মুহূর্তে বেগুনী আভার সঞ্চার, সেই মুহূর্তে এই হতভাগা ওড়িয়া তাহাকে ভাজিয়া খাইয়াছে। হায় বেগুনী আমার বেগুনী!

মগজ ॥ তুমি কাগজের শরণাপন্ন হও। এ বিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত।

টিকটিকি ॥ টিক্ টিক্! সাহিত্য-গঞ্জে Smoke Nuisance সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার ফল কি হইল? টিক্ টিক্।

কাগজ ॥ দেখ দেখ আন্দোলনের ফল কিরূপ হইবে বলিতে পারি না, কারণ টিক্ টিক্ ডাকিয়াছে।

আমি ॥ আমি টিকটিকি বিশ্বাস করি না। আমি টিকটিকি-নাস্তিক।

মগজ ॥ বেদান্তবাদীরা জগন্নাস্তিক; কিন্তু তাতে কি?—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। দেখ আমার খাসমহলে একজন বুড়া রাইয়ৎ আছে। তাহার নাম সংস্কার। সে বলে, হাঁচি-টিকটিকি বাধা যে না মানে সে গাধা। অনেকে বলেন, অমন কুসংস্কারাপন্ন প্রজার চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু

ও তাড়াইলেও যায় না। দিনের বেলা তাড়াইয়া দিলাম। রাত্রে দেখি আবার সেই সব ঝুলি কাঁথা পাতিয়া দিব্য আসর জমাইয়া বসিয়াছে। সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিই, খিড়কির দরজা দিয়া একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া বসে। আর তাছাড়া আজকাল বড় একটা তাড়াহুড়াও করি না। কারণ, পণ্ডিতেরা, এমন কি বড় বড় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদেরা বলিতেছেন, যাহা আছে তাহাকে থাকিতে দাও। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে কেহ কখনও কোন দিন বিশেষ কোন আচার বা সংস্কার বা আর কিছু মানিয়া লইতে পারে না। বিশেষ ধুমধামের সহিত আজকাল এইপ্রকার ধূম উদ্গিরিত হইতেছে। আমার তো Asphyxia হইবার যোগাড়।

আমি॥ তা হউক। তোমাকে পরে আপীলে বাঁচাইব। আমি নিজে এ কথায় বিশ্বাস করি। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই আমাদের শরীর ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, ডিসেণ্ট্রী প্রভৃতিকে গ্রহণ করে। উহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে যাওয়ার মানে, ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ করা, কেবল ডাক্তারের পেট ভরানো। এখন টিকটিকির টিকৃটিকের ভয়ে কাগজে আন্দোলন তো বন্ধ করিলাম, কিন্তু বেগুনীর উদ্ধারের কি হইবে?

মগজ॥ দেখ, কাগজে যখন আন্দোলনে বাধা পড়িল, তখন এক কাজ কর। দেখিতেছি এই ব্যক্তি ওড়িয়া। ওড়িয়া জগন্নাথের প্রজা, জগন্নাথকে খুবই মানে। সুতরাং তুমি জগন্নাথের দরবারে নালিশ রুজু কর।

আমি॥ কিন্তু আমি তো জগন্নাথকে মানি না। আমি যে নেতি নেতি করিয়া বেদান্তের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; জগন্নাথ আমি মানি না।

মগজ॥ জগন্নাথ মান না? অর্থাৎ বলরামের কনিষ্ঠ সুভদ্রার জ্যেষ্ঠ যে জগন্নাথ তাঁহাকে মান না। কিন্তু—

আমি॥ না না, আমি ঠিক ওরূপ বলিতে চাহি নাই বরং ঐরূপ মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই তো আমি জগন্নাথকে মানি। আমি যে বৈষ্ণব Philosophy পড়িয়াছি। অক্ষর মূর্তি বর্গীয় জ, আমাদের বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে দাদা, চাচা, না বলিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইব কিরূপে।

স্বর্গ-রাজ্য পাইব কিরূপে। আমি জগন্নাথকে মানি। তবে একবার তাঁহার কাছেই অভিযোগ উপস্থিত করি। (করজোড়ে) প্রভু, জগন্নাথ! স্বামী!

ওড়িয়া পাণ্ডা ॥ নইয়ন—পথ-গা-আমী ভবতু মেঅঁ এঁ—

জগন্নাথ ॥ নাথ্‌নী! আমায় ডাকিতেছ?

আমি ॥ আপনি আমায় নাত্‌নী বলিলেন?

জগন্নাথ ॥ না, না, তুমি ভুল শুনিয়াছ। আমি তোমায় নাথ্‌নী বলিয়াছি। তুমি যখন আমায় জগতের জবানী নাথ বলিয়াছ, তখন আমি তোমাকে নাথ্‌নী তো বলিবই। ইহাতে সম্পর্কবিরুদ্ধ কিছুই বলা হয় নাই। আর যদি নাত্‌নী বলিতাম তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি জগৎ-পিতামহ, সুতরাং জীব মাত্রই আমার নাত্‌নী। কেন জান? আমি পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই একমাত্র পুরুষ! সুতরাং জীবমাত্রই আমার নাত্‌নী। স্ত্রীলোকও নাত্‌নী, পুরুষও নাত্‌নী। আর নাত্‌নীরা যখন পিতামহদের প্রভু অর্থাৎ হুকুম করিবার মালিক, তখন নাত্‌নী ও নাথ্‌নী তো একই। তুমি বৈষ্ণব Philosophy পাঠ কর নাই?

আমি ॥ পাঠ করি নাই? আমি পাঠ করি নাই? এমন কি গ্রন্থ পৃথিবীতে আছে যাহা আমি পাঠ করি নাই। কাগজে যাহা ছিল তা সমস্তই মগজে পুরিয়াছি। তবুও আমার মগজ Tabula rasa অর্থাৎ সাদা কাগজ। আর হৃৎপিণ্ডের জায়গায় ছাপার কাগজ গুঁজিয়াছি। অত্যধিক পড়াশুনায় ঊর্ধ্ববাহুর বাহুর মতো চর্চার অভাবে হৃদয়টা শুকাইয়া গিয়াছিল। সেটাকে বাতিল করিয়াছি। শূন্যস্থান কাগজে পূর্ণ করিয়াছি। কাগজে কাগজে কাগজী-রাজ হইয়াছি। আমি পড়ি নাই? কি বলিব আপনি জগৎ-পিতামহ, বৃদ্ধ হইয়াছেন, নহিলে একবার দেখিতাম। এই যে নিমকাঠের কুঁদো বসিয়া আছেন, আপনি যে আপনি নন তাহা জানেন? আপনার কতটুকু অসিরিস্, কতটুকু ইন্দ্র, কতটুকু জিয়োভা, কতটুকু ওডিন, কতটুকু ব্রহ্মা, কতটুকু জুপিটার, কতটুকু শক্তি, কতটুকু ভক্তি, কতটুকু কাষ্ঠ, কতটুকু তৈল, কতটুকু রঙ, কতটুকু রাইট তাহা আমি সমস্তই একটি দেড়গজি Thesis-এ Cosine Theta-র সাংকেতিক ভাষায় লিখিয়া আপনার জগমন্দিরের পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণে সভা আহ্বান করিয়া পাঠ করিয়া শুনাইতাম। মুসলমান পণ্ডিতেরা

কবি আমির খস্রুকে তুতী-ই-হিন্দ্ অর্থাৎ হিন্দুস্থানের তোতাপাখী বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুস্থানের একমাত্র তোতাপাখী যে আমি, তাহা আমি আপনাকে প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা এই দণ্ডেই বুঝাইয়া দিতে পারি।

জগন্নাথ ॥ আচ্ছা বুঝাইয়া দাও। আমার পা নাই পালাইতে পারিব না, কাজেই শুনিতে হইবে।

আমি ॥ আমার বিদ্যার অধিক পরিচয় আমি দিতে চাই না। আমি আপনার সম্বন্ধে যেটুকু তত্ত্ব. গ্রন্থ কেতাবাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া মগজের মধ্যে জগা-খিচুড়ি অর্থাৎ ভবদীয় খিচুড়ি পাকাইয়াছি, শুধু তাহাই উদ্‌গিরণ করি, অবধারণ করুন। হে জগন্নাথ! আদিতে আপনার বর্গীয় জ সুতরাং আপনি জবরদস্ত জবরজং; তৎপরে গ, অর্থাৎ আপনি গদাধর; আপনাকে নাথ বলা হইয়া থাকে, অথচ আপনি পিতামহ। এ দুই-এর সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে? শ্রবণ করুন। হিন্দুর দেশে পিতামহেরা ঠাট্টা করিয়া নাতনীদিগকে পত্নী সম্বোধন করিয়া থাকেন। সেইজন্য আপনি পিতামহ হইয়াও নাথ। এইখানে আপনাতে ও আমাতে রসের সম্বন্ধ। আপনি শূন্যবাদীর শূন্য। অজ্ঞেয়বাদীর x! শূন্যবাদীর শূন্যের সহিত অজ্ঞেয়বাদীর x জুড়িয়া মহাসমন্বয় করিয়া আমরা আপনার মূর্তির কল্পনা করিয়াছি। x-এর স্কন্ধে শূন্য চাপাইলে ঠিক আপনার মূর্তিটি হয়। ঐ শূন্যের গর্ভে সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ গুণের প্রতিভূস্বরূপ তিনটি বিন্দু বসাইয়া দিলেই আপনার দুই নেত্র ও শ্রী হাঁ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শূন্যের ভিতর অর্থাৎ নির্গুণের ভিতর ত্রিগুণের বিন্দুপাত হইয়াছে। কথায় বলে নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ বাড়া। এই সামান্য প্রবাদবাক্যের মধ্যে আর্যজাতি গূঢ়ভাবে ভবদীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উহাতে আমাদের জাতির আধ্যাত্মিক দৌড়ধাপের পরিচয় বিদ্যমান। এক্ষণে আপনার বিষয়ে আমার বক্তব্য ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বলিলাম। সুতরাং আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন। আপনার খাসমহলের প্রজা বর্তমান ওড়িয়া পাণ্ডা স্বর্গীয় বেগুনীকে মর্ত্যে পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার শাস্তিবিধান করুন এবং অগস্ত্য যেমন ইল্বল-বাতাপির পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন, বিশ্ব-সংসারের চিরপ্রিয় বেগুনী রামধনু-রঞ্জিকা বেগুনীও সেইরূপ ওড়িয়ার উদর চিরিয়া বাহির হইয়া পড়ুন।

জগন্নাথ ॥ কি ভয়ানক! ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমার তো হাত নাই।

আমি ॥ হাঁ, তাই তো, আপনার যে হাত নাই।

ওড়িয়া পাণ্ডা ॥ হাত্ত অচ্ছে, আঙ্গুড়-অ নাই।

আমি ॥ চুপ্ রাও বেয়াদব। আমার মগজে জগবন্ধুর এই হাত না থাকায় বেশ একটি Philosophy গজাইয়া উঠিতেছিল। তোর চীৎকারে ভাবের ডিম্ব একেবারে গাঁজিয়া গেল। হতভাগা বদমায়েস্। বাজে বকিয়া idea আমার ওলটপালট করিয়া দিতে এলি। জানিস্ তুই বেগুনী খাইয়াছিস্!

কাগজ ॥ এ বিষয়ে কাগজে একটু লেখালেখি হোক্।

মগজ ॥ কাগজ হতে মগজে যায়
মগজ হতে কাগজে,
গজ্‌কাঠিটা গেল কোথায়
রফা হ'ত সহজে।

গজকাঠি ॥ চেঁচিও না, চেঁচিও না। গজকাঠি কখনও গরহাজির হয় না। সম্প্রতি কিন্তু একটু ব্যস্ত আছি। রোস, রোস। তিন যবোদরে এক ইঞ্চি, উনচল্লিশ ইঞ্চিতে এক মিটার; কিন্তু ক মিটারে এক যোজন? (চিন্তা) যবোদর হিন্দু, ইঞ্চি ইংরেজী, মিটার ফরাসী, আবার যোজন হিন্দু। গোড়ায় যবোদর শেষে যোজন। গোড়ায় হিন্দু, চরমেও হিন্দু। পাশ্চাত্যেরা কেবল মাঝের কটা ধাপ। হুঁঃ, পাশ্চাত্যেরা পিছনে পড়িয়া আছে। থাকিবারই তো কথা। পশ্চাতে অস্তি ইতি পাশ্চাত্য! নামেই পরিচয়। হুঁঃ তুমিও যেমন।

আমি ॥ গজকাঠি তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু হায়, কিন্তু হায়, জগন্নাথ, জগবন্ধু, জগৎ-পিতামহ, আপনার হাত নাই। হায়, তবে বিশ্বসৃষ্টি হইল কি করিয়া?

মগজ ॥ হুঁঃ, এই না তোমার মগজের মধ্যে এখনি হাত না থাকায় Philosophy তৈয়ারি হইতেছিল।

আমি ॥ হাঁ, হইতেছিল তো। কিন্তু এখন মনে হইতেছে—ধোঁয়া, ধোঁয়া সব ধোঁয়া। সৃজনকার্য চলিতেছে। তবু সমস্তই যেন ধোঁয়ার অবস্থায় রহিয়াছে। সব যেন নীহারিকা।

মগজ ॥ নীহারিকা থেকেই তো বিশ্বের সৃষ্টি। এই দেখ। ধোঁয়াটে ভাবের ক্রমশ জমাট চেহারা ফুটিয়া উঠিতেছে। আচ্ছা ধর, জগন্নাথের হাত নাই। অর্থাৎ জগৎ-পিতামহের হাত নাই, সেইজন্য তাঁহার কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবীরও হাত নাই। পৃথিবী ভাঁটার মতন গোলাকার, সেইজন্য সূর্য গোলাকার, চন্দ্র গোলাকার, গ্রহনক্ষত্র সব গোলাকার। যেন রাশি রাশি ধোঁয়া তালগোল পাকাইয়া রহিয়াছে।

আমি ॥ জগৎ-পিতামহের যে হাত নাই তাহা তো জগন্নাথকে দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। আর তাহার পুত্র, কন্যা, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীও যে গোলাকার, ভূ-গোলে তাহার প্রমাণ আছে দেখিয়াছি। কিন্তু আমার জগৎ-পিতামহী কই? তিনি দেখিতে কেমন? তাঁহার নাম কি?

কাগজ ॥ আমার পুরানো File উল্টাইয়া Domestic Occurences-এর স্তম্ভ খুঁজিয়া দেখ। যদি বিবাহ হইয়া থাকে নিশ্চয়ই নাম পাইবে।

মগজ ॥ তুমি থাম বলিতেছি। আদিতে জগৎ-পিতামহ হাই তুলিয়াছিলেন।

আমি ॥ বটে! কিন্তু কেন হাই তুলিয়াছিলেন? হাই তুলিবার নিশ্চয়ই কারণ ছিল। সে কারণ কি?

মগজ ॥ কেন হাই তুলিলেন? হাই উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? নেহাত শুনিবে? তিনি দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ—তোমার ভাবী প্রবন্ধ পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

আমি ॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি ধন্য! আমি ধন্য হইলাম! আমার জন্ম ধন্য! আমার প্রবন্ধ-নিবন্ধ ধন্য! তাহার পর? তাহার পর?

মগজ ॥ তাহার পর সেই হাই-হাওয়া জমিয়া ধোঁয়া হইল। সেই ধোঁয়া ত্রিধারা হইল। একটি ধারায় নীহারিকার উৎপত্তি, একটি ধারায় চিত্ত-কুজ্ঝটিকার জন্ম এবং তৃতীয় ধারায় জগৎবিখ্যাত সাধনাসহায় শ্রীশ্রীগঞ্জিকার আবির্ভাব। এই হইল হাই-এ-আওয়ল্ অর্থাৎ আদিম হাই।

আমি ॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ ॥ তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টা আকাশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সূর্য একদিন পবনের গায়ে হাই তুলিয়া দিলেন। সূর্যের আর একটি নাম

আদিত্য, ইহুদী ধর্মশাস্ত্রে আদিত্যকে আদম বলা হইয়াছে। এবং হাই হইলেন শ্রীমতী হবা। ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের কাহিনীটা একটু খাপছাড়া। আমি পূর্বাপর বলিতেছি শ্রবণ কর। হাই Highly ছোঁয়াচে। তাহাতে পবনেরও হাই উঠিতে লাগিল। সে ঢুলিতে ঢুলিতে পৃথিবীর গায়ের উপর হাই ছাড়িয়া দিল। তাহাতে পৃথিবী বলিলেন, "তুমি একি করিলে? আমার গা মাটি-মাটি করিতেছে।" এইরূপে পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি হইল এবং ঐ মাটি হইতে মটর, মর্কট, মহুয়া পক্ষী, এবং মনুষ্য জন্মিল।

আমি॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! আচ্ছা, সব তো বুঝিলাম, কিন্তু হাই-হাওয়া হইতে সন্তান হইল কিরূপে তাহা তো বুঝিলাম না।

মগজ॥ পারিলে না? মুক্তোপাতির গাছ দেখিয়াছ? উহার পাতায় পাতায় যখন মুক্তোর মতো কুঁড়ি ধরে, তখন প্রত্যেক পাতাটি মুক্তো ঘেরা ইয়ারিং-এর মতন দেখায়। ঐ কুঁড়িতে ফুল হয়। ঐ ফুলে আবার সরিষার মতো ছোট ছোট ফল হয়; ঐ ফলের ভিতর বীজ থাকে; ঐ বীজেও গাছ হয়।

আমি॥ উদ্ভিদবিদ্যার কেতাবে পড়িয়াছি বটে, দেখি নাই।

মগজ। পাতার গায়ে ফুল ফল হইতে পারে, আর হাইয়ের হাওয়ায় সন্তান হইতে পারে না।

আমি॥ ঠিক বলিয়াছ। এখন বুঝিলাম, পরিষ্কার বুঝিলাম। কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ॥ তাহার পর? হাঁ হাঁ ভাল কথা মনে পড়িল। বলিতে ভুলিয়াছি যে জগৎ-পিতামহের হাত না থাকায় তদীয় হাই হইতে যে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সৃষ্ট হইল তাদেরও হাত হইল না।

আমি॥ বেশ বুঝিলাম। কিন্তু পৃথিবীর পুত্র মানবের হাত হইল কেন?

কাগজ॥ হাতাহাতি করিবার জন্য।

মগজ॥ ফের তুমি বক্‌বক্ করিতেছে? চুপ কর। আমরা যাহাকে হাত মনে করি উহা ঠিক হাত নয়। অজা-গল-স্তন যেমন স্তন নয়, সেইরূপ।

আমি॥ যদি মানুষের হাত অজা-গল-স্তনের মতন হইবে, তবে তিন হইতে দুই বাদ দিলে হাতে এক থাকে কি করিয়া? আর ডাক্তারেরাই বা হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করেন কি করিয়া?

মগজ ॥ তুমি ঠিক ধরিয়াছ। হাত না থাকিলে হাতে রাখা অসম্ভব বটে। কিন্তু উহারও প্রতিকার হইবে। ভবিষ্যতে হাত-বিষয়ক আইন হইবে। যাহাকে তোমরা এখন হাতিয়ার-বিষয়ক আইন বলিয়া জান, একজন প্রেরিত-পুরুষ জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া উহার নূতন ব্যাখ্যা করিবেন। তখন মনুষ্য মাত্রেই বৈষ্ণব ভাবেই মশগুল হইয়া নিজ নিজ হাতকে বেহাত করিবেন। এবং জম্বুদ্বীপের এই আদর্শ সমস্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সেই প্রেরিত পুরুষের গুম্ফমাত্র মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাকে লোকে ধূমকেতু বলিয়া ভুল করে।

আমি ॥ তবে বেগুনী কি চিরতরে বেহাত হইল ?

মগজ ॥ না না। তুমি এই ওড়িয়ার সাহায্যে স্বদেশে একটি ওড়িয়ার দোকান প্রতিষ্ঠা কর। এইরূপ করিলে হাজার হাজার বেগুনী অচিরে তোমার হস্তামলকবৎ হইবে। যাহা স্বর্গে ছিল তাহা যুগপৎ স্বর্গে ও মর্ত্যে অধিষ্ঠান করিবে। তখন রামধনুকের সেই বেগুনী আকাশের মেঘ বেগুনের ক্ষেত এবং ওড়িয়ার দোকান এই তিন স্থানে ত্রিমূর্তিতে প্রকাশমান হইবে। ইহাকেই বলে True to the kindred points of sky and shop। তখন চন্দ্রের ত্রিকোণ এবং ওড়িয়ার দোকান একাকার ধারণ করিবে।

আমি ॥ চমৎকার! চমৎকার! শূন্যবাদীর শূন্য—

সকলে ॥ গোল!

আমি ॥ জগৎ-পিতামহের হাত নাই, সুতরাং একরকম—

সকলে ॥ গোল!

আমি ॥ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, হাঁড়ি, কুঁড়ি, মালসা—

সকলে ॥ গোল!

আমি ॥ জগৎ-পিতামহের কন্যা জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী—

সকলে ॥ গোল!

আমি ॥ আমরা মনুষ্যেরা ভবিষ্যতে অর্থাৎ হাত-বিষয়ক আইনের আমলে—

সকলে ॥ গোল।

আমি ॥ তখন পাবলিক কাগজে মিটিয়া যাইবে—

সকলে ॥ গোল !

আমি ॥ তখন Private মগজের ঘুচিয়া যাইবে—

সকলে। গোল !

আমি ॥ তখন ভূলোকে গড়ের মাঠে মোহনবাগানের—

সকলে ॥ গোল !

আমি ॥ ভোজন-লোকে দীনু ময়রার রসগোল্লার মধ্যে—

সকলে ॥ গোল !

আমি ॥ স্বর্গলোকস্থ গোলকের Two thirds—

সকলে ॥ গোল !

আমি ॥ তোমরা আনন্দে রক্তপাগল মোগলদের মতন তালগোল পাকাইয়া হট্টগোল এবং সোরগোল করিতে থাক। আমি ততক্ষণ একখানা খোল লইয়া আসি।

টিকটিকি ॥ ঠিক ঠিক। (স্বগত) বুদ্ধিবৃত্তির গঙ্গাযাত্রার সময় হইয়াছে।

গজকাঠি ॥ টিকটিকি তোমার বাক্য সত্য হউক। ইহা কাকতালীয় কি না জানি না, কিন্তু তুমি ঠিক্ সময়েই ঠিক ঠিক বলিয়াছ। আমি সাংখ্যের মতো ইঞ্চি ফুটের ভাষায় তর্জমা করিয়াছি। পাতঞ্জল জল করিয়া তাহার মধ্যে ডুবুরী-ওলোন হইয়া ডুব দিয়াছি। মীমাংসা-দর্শনের মাংস ওজন করিয়াছি, কিঞ্চিৎ ভোজনও করিয়াছি। বেদান্তের দণ্ডে গুণিয়াছি, ন্যায়দর্শনের ল্যাজ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এ প্রকার দেখি নাই। এ যে হাই Philosophy অর্থাৎ জৃম্ভ-দর্শন। ইহাতে জগৎ-পিতামহ হইতে টিকটিকি পর্যন্ত কাহারও হাই উঠিতে বাকী নাই। বিগত অর্ধঘণ্টার মধ্যে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহার তুলনা নাই। ইহা রসে এবং কষে, মগজে এবং কাগজে সমান শোভা পাইতেছে। ইহা অতুলনীয় অবর্ণনীয় অভাবনীয়। হিন্দু তোমার মরা হাড়ে এখনও কেমন ভেল্কি খেলে তাহা দেখিলে? নিত্য প্রত্যহ দধি ইচ্ছা করিয়া দধীচির হাড়ে একবার ভেল্কি খেলিয়াছিল। হিন্দু আবার দধি পান সুরু করিয়াছে, অর্থাৎ পাকস্থলীর মাথায় ঘোল ঢালিতে শিখিয়াছে। সুতরাং হাড়ে যে ভেল্কি খেলিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু তুমি হাভী। লোকে তোমায় মরা বলে। সে কথা স্বীকার করিলেও তোমার মূল্য লাখ টাকা।

জগৎ-পিতামহ একবার হাই তুলিয়াছিলেন। সে একহারা হাই। তাহাতে জগৎ জুড়িয়া কি কাণ্ডই না হইয়াছিল। তাহার পর সূর্য এবং পবন যুগপৎ হাই তুলিলেন। সে হইল জোড়-হাই, অর্থাৎ দো-হাই। আর অধুনা আর্য, ইস্‌লামীয় ও ইউরোপীয় উনুন বিড়ি ও চিমনীর ধোঁয়ায় ধূম্রলোচন হইয়া জম্বুদ্বীপের যে প্রকাণ্ড হাই উঠিয়াছে তাহাই হইল—

সকলে ॥ তে-হাই।

টিকটিকি ॥ ফিক্ ফিক্
করে ভারী কারখানা,
তিন ঝুড়ি তার ব্যাখানা।

আমি ॥ কই? তোমরা ভাল করিয়া সোরগোল করিতেছ কই? মগজে এখনো গোলমাল বাঁধে নাই? আমি যে খোল আনিলাম, বাজাইব।

ঢাকী ॥ আমি ঢাক আনিয়াছি, বাজাইব।

কামার ॥ আমি হাতুড়ি আনিয়াছি, বাজাইব।

কুমার ॥ হুঁ, হুঁ, আমি হাঁড়ি বাজাইব।

দালাল ॥ আমি ও সব বুঝি না। আমি কাজ বাজাইব।

তাঁতী ॥ আমি বগল বাজাইব।

টিকটিকি ॥ ধিক্ ধিক্! তুমি কি হনুমান? তুমি কি সূর্যি ঠাকুরকে বগলে পুরিয়াছ? যে বগল বাজাইবে? ধিক্ ধিক্!

সকলে ॥ (গীত) লাক্ চড়া চড়্ লাক্ চড়া চড়্
গিজদা গিজম।
নেই ধরাপর মোর বরাবর,
বিদ্যা কি কম?

বাক্য বকম মগজ জখম
ভাবনা কিবা,
সরগরমে সরদ গরম
হয় বুঝি বা।
আসমানে কি হাই উঠেছে
ভাইরে ও ভাই

সেই হাই-এ ব্রহ্মাণ্ড হ'ল
কি হাই দোহাই।
হাই তুলেছে স্থবির ঠাকুর
বলছি খাঁটি,
সেই হাইয়ে হায় পিরথিমির গা
মাটি মাটি।
তাতেই মাটির সৃষ্টি হ'ল,—
নাইরে রেহাই,—
মানুষ হনু মর্কটাদি
বরণ সেহাই।
সেই মানুষের মগজে আজ
উঠলো কি হাই
তিন তালে এক ফাঁক পেয়েছে
পড়ল তেহাই।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বজবজিয়ে
উঠল মগজ—
বুদ্ধি গেল নজ্‌গজিয়ে,—
বেজায় হয়জ!
হাই তুলে তাই হালকা হলাম;
হাই কি সোজা?
হাইয়ের হাওয়ায় যায় উড়ে
ব্রহ্মাণ্ড-বোঝা।
তিনটি হাইয়ে তিন ভুবনের
ব্যক্ত নিয়ম,
তোমার নেহাই আমার তেহাই
গিজদা গিজম।

(এই সময়ে পুঞ্জ পুঞ্জ সাঁজালের ধোঁয়া ঢুকিয়া যবনিকার কার্য হাসিল করিল।[১])

ভারতী (আষাঢ়, ১৩২২)

১. বিশেষ প্রয়োজনবোধে এই নাটকের কয়েকটি শব্দ পরিবর্তিত হয়েছে।

চিঠিপত্র

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

॥ ১ ॥

বন্দেমাতরম্[১]

প্রিয়বরেষু,

ধীরেন, মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় কিনা জানি না। কলিকাতায় কিন্তু কাল রাত্রি হইতে বিশ্রী রকম বাদলা, ঘরের বাহির হইবার জো নাই। এবার Christmasটা নিতান্ত নিরামিষভাবে কাটান গেল। থিয়েটার, সার্কাস কিছুই দেখি নাই, কেবল মনশ্চক্ষে খবরের কাগজরূপ চশমা লাগাইয়া সুরাট-সার্কাসে মডারেট কুলের antiques দেখিলাম।[২]

বড়দিনের পূর্বে স্টারে একদিন 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অমৃত বসু—চন্দ্রশেখর মানাইয়াছিল, অভিনয় ভাল লাগিল না। এমন কি অমৃত মিত্রের চেয়েও খারাপ। শৈবলিনী চমৎকার, তুলনা হয় না। বিশেষতঃ প্রতাপকে মুক্ত করিবার জন্য মত্ততার ভান এবং রামানন্দ স্বামী কর্তৃক গুহা মধ্যে বন্দী অবস্থায় প্রকৃত মত্ততায় যে পার্থক্য সেদিন দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না।

দলনীর চলনসই কথাবার্তা অতি দ্রুত সুতরাং পূর্ব অভিনেত্রী অপেক্ষা খারাপ।...গ্রে স্ট্রীটের পথ[৩] অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় ঐ পথেই ফিরি। 'মেজদা'র[৪] সঙ্গে মাঝে দেখা হইয়াছিল। ভাল আছে। প্রমথবাবু[৫] বেচারা ক্রমাগত অসুখে ভুগিতেছেন এবং ছুটি পাইলেই শান্তিপুর যাইতে ভুলিতেছেন না। Chatterjee

১. শব্দটি হাতে লেখা।

২. সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদিগের বিরোধ।

৩. স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের তৎসাময়িক বাস-ভবন। [এই বাড়ি তখন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর পিতা রায় বাহাদুর মথুরানাথ গুপ্তর, এখানে দত্তরা ভাড়া ছিলেন।—সম্পাদক।]

৪. কানুনগো হিরণ্ময় রায়। অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তর ভাগিনেয়।

৫. প্রমথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিবেশী। শান্তিপুরে তাঁহার শ্বশুরালয়।

junior[৬] এখনও শান্তিপুরে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং এখনও দর্শনলাভ ঘটে নাই। তোমাদের পাড়ার সংবাদের মধ্যে মহেন্দ্র সরকারের[৭] মুখে ভয়ানক ঘা। আর কি—আর খবর জানি না। বাগচীদের[৮] বাড়ি প্রায়ই যাই না। কারণ সেখানে বড় কয়লার[৯] কথা হয়। দ্বিজেনবাবু[১০] বোধ হয় কয়লা গর্তের মধ্যে ডুবিলেন। যদিও তিনি কলকাতায়। ডাক্তারবাবু[১১] ভাল আছেন। রাজেনবাবু[১২] সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন। উপেনবাবু[১৩] বড়দিনের সময় আসিয়াছিলেন। আমি এখন Psychology of Sex এবং Stipphen Phillips-এর Paola and Francesca পড়িতেছি। আলমারী[১৪] এসেছে। এবারকার মেলার[১৫] সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু[১৬] কোথায় ছিলেন? কণ্ঠ কাহার মত?[১৭] নিজেকে সামলে নিতে পেরেছ—ভাল; কিন্তু অসামাল হলে কেমন করে? অধ্যাপক সমিতি[১৮] ব্যাপারটা কিরূপ? তুমি প্রবন্ধ পড়েছ?[১৯] হার্মোনিয়াম শিক্ষা[২০] একদন বন্ধ—French leave নিয়েছে। আমি কিছুই লিখিনি, কয়েকটা অনুবাদ করেছি মাত্র।

৬. প্রমথবাবুর পুত্র।

৭. জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়ির সরকার। সারদাবাবু কবি সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের উইলের Executor ছিলেন।

৮. কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীদের গৃহ।

৯. ইঁহারা কয়লার ব্যবসা করিতেন।

১০. কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

১১. দ্বিজেনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার জ্ঞান বাগচী।

১২. ডাক্তার জ্ঞান বাগচীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১৩. বাগচীদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন বাগচী এম. এল.।

১৪. Chatterjee Furnishing Company হইতে। বর্তমানে সত্যেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্থান পাইয়াছে।

১৫. বোলপুরে ৭ই পৌষের মেলা।

১৬. কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ।

১৭. দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮. বোলপুরের অধ্যাপক সমিতি।

১৯. বোলপুরের অধ্যাপক সমিতিতে তখন প্রবন্ধ পড়া হইত।

২০. কবি সত্যেন্দ্রনাথ কিছুদিন হার্মোনিয়াম শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। —

কলিকাতায় লাজপত রায় আসিয়াছিলেন। আছেন কিন্তু গোখেলের বাসায়। সোমবার গোলদীঘিতে তাঁহার অভ্যর্থনা সভা হইবে। তোমার অভ্যর্থনার জন্য সুরাটীদের মত গুণ্ডা ভাড়া করব কি ?[২১] লিখিও।

French Revolution পড়িতেছ শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কাহার রচিত ? কংগ্রেসের কেলেঙ্কারি 'সুলক্ষণ' জীবনের চিহ্ন। আমার অন্ততঃ এইরূপ বোধ হয়। কলিকাতায় এক গোলদীঘি ছাড়া সমস্ত উত্তরাংশে Public Park-এ সভা নিষিদ্ধ। 'যুগান্তর'-এর নতুন Printer-কে ধরিয়াছে। ডাক্তারখানার[২২] খবর রাখি না, ভনির[২৩] সঙ্গেও দেখা হয় নাই। গিরীশের[২৪] ভাই চারুর[২৫] সঙ্গে একদিন পথে দেখা হওয়ায় তোমার ঠিকানা জানিয়া লইয়াছে। চিঠি লিখিয়াছে কি ?

আমার খবর :—প্রাতে গাত্রোত্থান, ভ্রমণ, সতীশ ডাক্তারের[২৬] বাড়ি কাগজ পাঠ, স্নান, আহার, পাঠ, জলযোগ, হ্যারিসন রোড [বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড] গমন, পুরান গ্রন্থ মন্থন,[২৭] ক্বচিৎ বাগচী ভবন গমন, নচেৎ প্রত্যাবর্তন, পাঠ ! নৈশ-ভোজন এবং নিদ্রা। শীঘ্র চিঠির উত্তর চাই। ইতি—

আমার সম্মান নিত্য
হইতে বিশ্বাসী ভৃত্য।[২৮]
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭শে পৌষ, রবিবার
১৩১৪

২১. সুরাট কংগ্রেসে ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা মারামারি করিয়াছিল।

২২. Hindu Medical Hall.

২৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা।

২৪. ডাঃ গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

২৫. চারুচন্দ্র ঘোষ, এ্যাটর্নি।

২৬. ডাঃ সতীশচন্দ্র বরাট।

২৭. সত্যেন্দ্রনাথকে হ্যারিসন রোডে পুরানো বইয়ের দোকানে প্রায়ই দেখা যাইত।

২৮. I have the honour to be, Sir, your most obedient servant-এর অনুবাদ।

॥ ২ ॥

বন্দেমাতরম্[১]

১৩১৪, মাঘ

সুহৃদ্বরেষু,

যখন তুমি এই চিঠি পাইবে তখন আমার জীবনের পঁচিশটি বছর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। জীবনকালের পরিমাণ পূর্ণ একশত বৎসর ধরিলেও তাহার তিন ভাগ মাত্র রইল। কিন্তু জীবনের আদর্শ বহু দূরে। Keats এ বয়সে তাহার অন্তরের সমস্ত রসসৌন্দর্য ঢালিয়া একটি অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মৃত্যু-খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি ?-?-?-?-?

আমার কথা যাক্। তোমার সংবাদ কি? তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ[২] তাহার অন্তরে যে কতখানি মহৎ শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা উপলব্ধি করিবার জিনিস বটে। বিকাশোন্মুখ তরুণ মনকে তোমার মনের অনুকূল হওয়ার মধ্যে এক-একটি করিয়া পাপড়ি খুলিতে অবসর দেওয়া যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার, তাহা আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি।

সেদিন পরেশনাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর মধ্যে দিয়া আসিতেছিলাম, একটা দুর্গন্ধের উদ্‌বেজনায় মনটা এই পল্লীর অধিবাসীদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবে বাঁকিয়া বসিতেছিল। পচা আমানির গন্ধ, পচা ডিমের গন্ধ, পাঁকের গন্ধ এবং গোহাটার অকথ্য দুর্গন্ধ বাতাসটাকে একেবারে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর কলের ধোঁয়া, গাড়ির ধূলা, গাভী বিক্রেতাদের বাক্‌বিতণ্ডা, ঋণকারী বৃদ্ধ চাচার শ্মশ্রু উৎপাটনকারিণী ভোজপুরবাসিনীর বীর রসাত্মক গ্রাম্য ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর ও পল্লীর মিঞা মহলে উত্তেজনা। ইহারই মধ্যে,—তুমি কি মনে করিতেছ? রূপের ঝলক? না, একটি সদ্যজাত নিতান্ত শিশুর ক্রন্দন শব্দ! এক মুহূর্তে—আমার সমস্ত অবজ্ঞা, সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই আবর্জনার মধ্যে যে ক্ষুদ্র

১. শব্দটি হাতে লেখা।

২. গোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনা।

মানব সন্তানটির কণ্ঠস্বর শুনিলাম, সে স্বর আমাদের নিতান্ত পরিচিত, সে আমার কিংবা তোমার ঘরে যে মূর্তিতে প্রকাশ হইয়া থাকে, এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। সে স্বর মনের যে পরদায় আঘাত করে এবং যে অপূর্ব সংগীতের সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের সংগীত রচনা করে, তাহা স্থান ও কালের একবারে অতীত হইয়া মনের রাজ্যে সনাতন হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানব শিশু! মানবের সমস্ত আশা-ভরসা! মানবের ভবিষ্যৎ! মানবের সর্বস্ব! তুমি সেই শিশুদের অপূর্ব এবং অপরিণত জীবনের পথ-প্রদর্শক, সহচর এবং গুরু একাধারে। তোমার জীবন ধন্য। এইমাত্র পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর[৩] পত্র পাইলাম। পত্র পড়িয়া আনন্দিত যে হইয়াছি তাহা বোধহয় লিখিয়া জানাইতে হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন, "হোমশিখা[৪] পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। নামটি সার্থক হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে, যাহা পূর্বতন ঋষিদের হোমশিখাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বাক্য আছে যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সাম্যরসের একটা স্রোত বহিতেছে। শেষ কবিতাটিতে ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে। আমার মতে 'সাম্যসাম' কবিতাটাই প্রচ্ছন্ন শ্রেষ্ঠ অংশ, যেন একটি বৃন্ত বাড়িতে বাড়িতে একটি সুন্দর পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। আমার রাশি রাশি আশীর্বাদ।" তুমি কি মনে করিতেছ জানি না, আমার পক্ষে এই সমগ্র চিঠিটা না পড়াইয়া থাকিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। আমার বই হয়ত এতটা ভাল না হইতে পারে। কিন্তু এই চিঠি আমার দেহে যতটা জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে সেই পরিমাণে যদি লিখিয়া উঠিতে পারিতাম তাহা হইলে আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিত। মানুষ মিষ্ট কথার একান্ত কাঙাল। এই ফাল্গুনের প্রথম দিনে তুমি পূজনীয় রবীন্দ্রবাবুর 'বসন্ত যাপন' মর্মে মর্মে অনুভব করিবে এবং বোলপুরের শাল এবং মহুয়া গাছের আকস্মিক কিশলয় এবং মুকুল অঙ্কুরিত

---

৩. রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪. 'হোমশিখা' সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ; ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত।

হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষে 'বসন্ত যাপন' নিতান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কারণ শহরে যে বসন্ত[৫] বিকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দাগ রাখিয়া যাইতে ভুল করে না। অতএব তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার। তুমি ডাক্তার বাবুকে[৬] যে চিঠি লিখিয়াছ তাহা পড়িলাম। যাহারা নিজে না লিখিয়া কেবল অন্যের লেখা সমালোচনা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের সঙ্গে যাহারা নিজে বিবাহ না করিয়া অন্যের বিবাহের কথা আলোচনা করে তাহাদের প্রভেদ কি? লিখিও। আমার মনে হয় যাঁহারা নিজে সুলেখক (যেমন Goethe এবং রবীন্দ্রনাথ) তাঁহারাই সুসমালোচক। এবং যিনি নিজে সুবিবাহিত, তিনিই নিজে সুঘটক। তুমি কি বল?

কলিকাতা
৪৬, মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রীট
মাঘ-সংক্রান্তি

তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ

॥ পত্র দু'খানি সম্পর্কে ॥

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত এই পত্র দু'খানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। কেবলমাত্র এই দু'খানিই নয়, উক্ত সংখ্যায় আরও তিনখানি অর্থাৎ মোট পাঁচখানি পত্র প্রকাশিত হয়। বাকী পত্রগুলি আমরা এই গ্রন্থাবলীর পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশ করব।

'প্রবাসী'তে এই পত্রগুলি প্রকাশ করেন শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় 'লিপিকার সত্যেন্দ্রনাথ' নামক একটি পরিচিতিসহ। এই পরিচিতির মধ্যে তিনি লেখেন—

"কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গুটিকয়েক চিঠি এখানে প্রকাশিত হইল। এই চিঠিগুলি কবি সত্যেন্দ্রনাথ কিছু কম এক বছরের মধ্যে তাঁহার অন্তরতম বন্ধু স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন। মূল

৫. বসন্ত ব্যাধি।
৬. ডাক্তার জ্ঞান বাগচী।

চিঠিগুলি স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় যেরূপ যত্নের সহিত এই দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহা তাঁহার পরলোকগত বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন। পরলোকগত দত্ত মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা কালে কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় কলিকাতার অভিজাত বংশীয় (হাটখোলার দত্ত বংশীয়) কাব্যরসিক অকৃতদার পুরুষ ছিলেন। একদা তিনি কলিকাতায় সামাজিক, সাহিত্যিক বিবিধ কাজের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত দত্ত মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। সুগভীর রবীন্দ্র-ভক্তি এবং সত্যেন্দ্র-প্রীতি তাহার একক জীবনের অক্ষয় পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। এই চিঠিগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। চিঠিগুলির হস্তলিপি দেখিলে বুঝা যায় যে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ কত দ্রুত এই চিঠিগুলি রচনা করিয়াছেন। ভাবিয়া-চিন্তিয়া মুসাবিদা করা চিঠি এগুলি নয়। দুইখানি চিঠিতে কবির নাম স্বাক্ষরও নাই। সম্ভবত স্বাক্ষর করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন [পরবর্তী খণ্ডের চিঠিতে এরূপ দৃষ্ট হইবে], তবুও ইহাদিগের বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা অপূর্ব। মন ও হৃদয় যখন সুনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি ও ভাবদ্বারা চালিত হইয়া একযোগে মস্তিষ্কের সহিত কাজ করে, লেখনীমুখেও তখন বিনায়াসে বাক্যাঢ্য প্রকাশ পাইয়া রচনা যে বহুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে ইহা তাহারই নিদর্শন। চিঠিগুলির পাদটীকা আমার দেওয়া।"

সহধর্মিণী কনকলতা দত্তকে লিখিত

॥ ১ ॥

রবিবার

কনক,

আমরা নিরাপদে দার্জিলিং পৌঁচিয়াছি। শারীরিক ভালই আছি।

তোমার শরীর কিরূপ লিখিবে। হোমিওপ্যাথিক ওষধ খাইয়া কোন উপকার হইল কিনা লিখিবে।

মার শরীর কিরূপ লিখিবে। খুব সাবধানে থাকিবে। ইতি—

সত্যেন্দ্র

॥ ২ ॥

দার্জিলিং
শনিবার

কনক,

তোমার চোখের ফুলা সারিয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমরা খুব সম্ভব আগামী বুধবার যাত্রা করিয়া বৃহস্পতিবার কলিকাতায় পৌঁছিব।

আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি তুমি এবং বাড়ির সকলে কুশলে আছ এবং আছেন।[১]

ইতি—

সত্যেন্দ্র

১. এই দু'খানি পত্রই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণী কনকলতাকে দার্জিলিং থেকে লেখেন। স্ত্রীকে লেখা অধিকাংশ পত্রই তাঁর এরূপ সংক্ষিপ্ত এবং সাল তারিখ বর্জিত। কোথাও পত্রের মধ্যে তাঁর প্রগল্‌ভতা বা প্রেম-প্রীতির আতিশয্য প্রকাশ পায়নি। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দৃষ্টে মনে হয় এই পত্র দু'খানিই ইংরেজী ১৯১৯ সালে লিখিত। পত্র দু'খানি এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদকের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে মুদ্রিত। এ সময় সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত স্বাস্থ্যাবাস 'লুইস জুবিলী স্যানেটোরিয়ামে।'

গ্রন্থপরিচয়

তীর্থরেণু (কাব্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : ললিতা সপ্তমী, ১৩১৭ (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১০)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০১+১২। পরবর্তীকালে এর পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় বৈশাখ, ১৩৫৪ (ইং ১৯৪৭)।

সত্যেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অনুবাদ কার্যের জন্য তীর্থ-সলিল, তীর্থরেণু ও মণিমঞ্জুষা নামক যে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ, সেই তিনখানির মধ্যে তীর্থ-সলিল-এর পরই 'তীর্থরেণু'-র স্থান। তীর্থ-সলিল প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে তীর্থ-সলিল মুদ্রিত হয়েছে।

'তীর্থরেণু'-র পরিচিতি হিসাবে কবি কর্তৃক গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রকাশিত এই কবিতাটি নিম্নে মুদ্রিত হ'ল—

তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
করিয়াছি এক ঠাঁই,
বিশ্ব-বীণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই ;
প্রাচীন দিনের অচিন জনের
কুড়াই বিভূতি রাশি,
মৃত কবিদের অমৃত অশ্রু
বকুল-সুরভি হাসি !

রোলি, পবিত্রী, ঠুম্‌রা এনেছি,
এনেছি স্বর্ণ-মাখি,
শ্যাম-বিন্দু কি রামরজ,—আমি
কিছুই রাখিনি বাকি ;
কাব্য কাজল, সতী সিন্দুর—
এনেছি ভিক্ষা মাগি',
আশা-পূরী ধূপ এনেছি বঙ্গ-
ভাষার পূজার লাগি।

হরি-বিরহিনী ব্রজ গোপিনীর
খিন্ন তনুর শেষ—
এনেছি গো সেই গোপীচন্দন,—
জুড়াতে মরম দেশ !
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর
এনেছি যতন ক'রে,
সরস্বতীর চরণ সরোজে
অর্ঘ্য দিবার তরে।

ধরার আঁচলে আঁখিজল কা'রা
মুছেছিল ব্যথা স'য়ে,
অতীত দিনের অশ্রু, হের গো,
রয়েছে অভ্র হয়ে।
অতীত ফুলের পুলকে অরুণ
হয়েছে আবীর গুলি,
আবীর গভীর পুলকের স্মৃতি,—
হরষ হাসির ধূলি।

বঙ্গবাণীর চরণে নিবেদি
অভ্র-আবীর রাশি,
অঞ্জলি দিই নিখিল কবির
আকুল অশ্রু হাসি ;
আমার অশ্রু আমার পুলক
তারি সাথে যায় মিশে,
খুঁজি না, বাছি না, বুঝি না, কেবল
চেয়ে থাকি অনিমেষে।

আমার বীণা সে ধন্য আজিকে
সকল সুরেতে বেজে,
নাড়া পেয়ে তার সকল তন্ত্রী
নিঃশেষে ওঠে নেচে !
নিখিল কবির নিশ্বাসে হের
ভরিয়া উঠেছে বেণু,
ভাব-নগরীর ভাবের ব্যাপারী
বিতরি তীর্থরেণু।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্য 'তীর্থরেণু' শব্দটি ফার্সী ছাঁদে সর্বাগ্রগণ্য বরণীয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকে দেন এবং সেটি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণেই ভিতরে গ্রন্থারম্ভের পূর্বে একটি স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'তীর্থরেণু' প্রকাশিত হলে তিনি লেখেন, "এক রকম অনুবাদ আছে রূপ হইতে প্রতিরূপ আঁকার মতো তাহাতে কেবল চেহারাটা দেখা যায়, কিন্তু সে চেহারা কথা কহে না—অর্থাৎ তাহাতে খানিকটা পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই বাদ পড়ে। তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে তোমার এই অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব-নিবাসের পাস দেখাইয়া চলিতে হইবে না।...তোমার তীর্থরেণু পুষ্পরেণু হইয়া উঠিয়া নূতন গন্ধে বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন, "তীর্থরেণু গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। এরূপ নানা দেশের কবিতার সংগ্রহ বঙ্গভাষায় আর কখনও হয় নাই। কবিতাগুলির বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়।"...

উক্ত সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলিতেও 'তীর্থরেণু' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গবাসী' বলেন, "সত্যেন্দ্রনাথ স্বভাব সুকবি। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কবির কবিতা-ভাব বাংলা কবিতা-সৌন্দর্যে ফুটাইয়া বাঙালী পাঠকের

চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ ব্যাপারে এত কৃতিত্ব আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। সত্যেন্দ্রনাথেরই 'তীর্থ-সলিলে' তাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলাম আর 'তীর্থরেণু'তে তাহার পরিচয় আবার পাইলাম। একাধারে জ্ঞান, বিদ্যা, গবেষণা, ভাব, সুষমা প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয়।"

'প্রবাসী'তে (আশ্বিন, ১৩১৭) প্রকাশিত হয়, "অনুবাদগুলি এরূপ সরস ও কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে, যে লেখক মহাশয় এগুলিকে অনুবাদ বলিয়া ছাপিয়া না দিলে কেহই তর্জমা বলিয়া মনে করিতে পারিত না।...সত্যেন্দ্রবাবুর নানা ছন্দের উপর দখলও অসামান্য।" এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে 'প্রবাসী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬) আরও লেখেন, "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিগণের বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা ও গভীর দেশপ্রীতিমূলক উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি।...কবিতাগুলির অনুবাদ পড়িয়া মনে হয়, যেন সম্পূর্ণ মৌলিক কবিতার রসাস্বাদন করিতেছি।"

'ভারতী' বলেন, "...গ্রন্থের আরও একটি বিশেষ গুণ, কবিতাগুলির বৈচিত্র্য। একবার আরম্ভ করিলে সমস্ত কবিতাগুলি পড়িতে হইবে। এমন কথা একমাত্র রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সম্বন্ধেই খাটে। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের পর কবিতা পাঠে এমন আনন্দ আর কখনও উপভোগ করি নাই।"

'মানসী'ও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখেন, "...কবি বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধান করিতেছেন।...বেদ ও উপনিষদ হইতে যে অংশগুলি অনূদিত হইয়াছে, অনুবাদেও তাহার গাম্ভীর্য ও সরসতা বর্তমান।

'তীর্থরেণু' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র ও মুদ্রাকর পরিচয়টি নিম্নরূপ:

তীর্থরেণু। / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / মূল্য এক টাকা / প্রকাশক / শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়/ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস/২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা/ কান্তিক প্রেস/২০, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।/

রহস্য-কুঞ্চিকা

('তীর্থরেণু' গ্রন্থের কবিতা ও কবি-পরিচয়)

অমরু—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হন। কথিত আছে, যে শঙ্করাচার্য অমরু নামক একজন রাজার মৃতদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, মণ্ডন মিশ্রের পত্নী শারদাদেবীর প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ অমরু-শতক রচনা করেন। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে, কিন্তু, এ কথার উল্লেখ নাই।

অল্‌রিচি—প্রাচীন রোমাণ্টিক যুগের কবি, জন্মভূমি, জর্মনি।

আরানী—(খ্রীঃ ১৮১৭-১৮৮২) হাঙ্গেরির কবি; গাথা রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন।

আর্নৎ—(খ্রীঃ ১৭৬৬-১৮৩৮) ইনি নেপোলিয়নের পরম ভক্ত ছিলেন; পৃথ্বীরাজের যেমন চাঁদ কবি, নেপোলিয়নের তেমনি আর্নৎ।

আসায়াসু—জাপানের কবি। ইঁহার পিতা য়াসুহিদেও কবি ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম-গ্রহণ করেন।

ইকুজু—ইনি জাপানী কবি। তান্‌কা রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

উকন্—ইনি একজন স্ত্রী-কবি; জন্মভূমি জাপান।

ওয়াইল্‌ড্ (অস্কার)—ইঁহার রচনা সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য বিখ্যাত। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

ওয়াং-চাং-লিং—চীন দেশের কবি ও সাহিত্যিক; লুশানের বিদ্রোহের পর, রাজপুরুষের সন্দেহে ধৃত ও নিহত হন।

ওয়াং-সেং-জু—চীন দেশের কবি; জন্ম, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

ওয়াট্‌সন্—ইংলণ্ডের কবি; ইনি জীবিত।

ওয়ার্টিমার—জর্মনির কবি; জন্ম ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে।

কণ্ণ গনর—দাক্ষিণাত্যের কবি।

কপিলর—দ্রাবিড় কবি; বেদ-ব্যাসের মতো ইঁহার পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতা দাসজাতীয়া ছিলেন।

কামৈন্স—পোর্তুগালের কবি; প্রধান রচনা 'লুসিয়াড'।

কিনো—জাপানের বিখ্যাত বীর উচিশকুনির পৌত্র। জন্ম খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে।

কিপ্লিং—ইনি জাতিতে ইংরাজ; জন্ম, পঞ্জাবের রাধিয়ার হ্রদের নিকট; হইয়াছেন মার্কিনবাসী। ইঁহার রচনায়

সহৃদয়তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিস্‌ফালুডি—(খ্রীঃ ১৭৭২-১৮৪৪) হাঙ্গেরির কবি; ইঁহার ভাইও কবি ছিলেন।

'কুরাল'-গ্রন্থ—'কুরু' অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র'; ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি কুরাল; কপিলর নামক দ্রাবিড় কবির সহোদর তিরু বল্লুবর কুরাল-গ্রন্থের রচয়িতা। জন্ম মান্দ্রাজের নিকটস্থ মাইলাপুরে।

কুরেন্‌বার্গ—ইনি জর্মনির প্রাচীন যুগের কবি।

কোমাচি—(খ্রীঃ ৮৩৪ - ৮৮০) ইঁহাকে জাপানের স্যাফো বলা যায়। ইনি সুকবি এবং সুন্দরীও ছিলেন।

কোমিয়ু—ইনি জাপানের রানী ছিলেন; কবিতাও লিখিতেন।

ক্যাপলন্—শিশু-জগতের কবি; জন্ম ইংলণ্ডে।

গায়গার—নব্য জর্মনির কবি; জন্ম ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। মনস্তত্ত্বের রহস্যবিদ্।

গেটে—(খ্রীঃ ১৭৪৯-১৮৩২) ইনি কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও রসজ্ঞ সমালোচক। জন্ম জর্মনিতে।

গোকু—জাপানের বিখ্যাত ফুজি-বারা বংশের সন্তান; জন্ম খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে।

ঘোষ (অরবিন্দ)—ইনি "স্বদেশ-আত্মার বাণী মূর্তি" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

চাং-চি-হো—(খ্রীঃ ৭০০-৭৫০) কবি ও 'তও'-পন্থী, ইনি 'কুজ্ঝটিকার প্রবীণ ধীবর' নামে বিখ্যাত।

জয়নাব—ইনি তুরস্কের একজন স্ত্রী-কবি; স্বামীর হুকুমে ইঁহাকে কাব্যালোচনা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

জাফর—ইনি তুরস্কের কবি ও দ্বিতীয় বায়াজিদের একজন অমাত্য ছিলেন। রাজভৃত্যদিগের ষড়যন্ত্রে ইনি হারুণ-অল্-রসীদের মন্ত্রী জাফরের মতো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জামি—(খ্রীঃ ১৪১৪ - ১৪৯২) পারস্যের স্বনামধন্য কবি ও সুফি। ইঁহার পুরা নাম নূরদ্দিন্ আব্দর রহমন্ জামি। ইনি নির্লোভ ছিলেন। একবার তুরস্কের সুলতান্ পাঁচ হাজার মোহর পাঠাইয়াছিলেন, ইনি তাহা স্পর্শ করেন নাই।

জিউলে—হাঙ্গেরির কবি; ক্ষুদ্র গাথার প্রবর্তক।

জুম্ সুল্‌তান্—(খ্রীঃ ১৪৫৯-৯৫) ইনি তুরস্কের সুল্‌তান্ দ্বিতীয় বায়াজিদের কনিষ্ঠ। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অর্ধেক রাজ্য দাবী করেন। কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই।

মহম্মদীয় শাস্ত্রানুসারে কন্যারাও পুত্রের ন্যায় পিতৃধনের অংশ পায়; কিন্তু রাজপুত্রেরা এই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করিতে পান্ না; ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতৃ-বিরোধের মূল এইখানে, জুম্ সুল্তানের যুদ্ধের কারণও এইখানে। পক্ষপাতহীন মহম্মদীয় আইনের নির্দেশ, বোধ হয়, সাম্যবাদের দিকে; ইহার স্বাভাবিক পরিণতি, সম্ভবতঃ, Democracyতে।

ঝিন্দন—পাঞ্জাবের কবি।

টেনিসন্—(খ্রীঃ ১৮০৯-১৮৯২) ইনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি ছিলেন।

ডান্বার—কাফ্রি কবি, ইঁহার পিতা ক্রীতদাস ছিলেন; কানাডায় পলাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অনেকের বিশ্বাস কাফ্রিরা সৌন্দর্য বোধে ও বুদ্ধির প্রাখর্যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন; ডান্বারের কবিতা এই মতের অসারতা প্রমাণিত করিতেছে।

ডিরোজিয়ো—(খ্রীঃ ১৮০৯-৩১) ইহাকে লোকে 'ইউরেশিয় বায়রণ' বলিয়া থাকে; কলিকাতায় মৌলা আলির দরগার নিকট ইঁহার জন্ম হয়। ইনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র।

ডুম্ মীরণ—আফগানিস্থানের কবি। আমরা ডোম বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ইঁহার পূর্বপুরুষেরা সেই ডোম ছিলেন। ডোমেরা সংগীতানুরাগের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। য়ুরোপের জিপ্সি, পারস্যের লুরি, আফগানিস্থানের ডুম্ এবং ভারতের ডোম এক।

ডেঙ্কেল (রিকার্ড্)—শিলারের সঙ্গে গেটের যে সম্বন্ধ, ডেঙ্কেলের সঙ্গে লিলিয়েঙ্ক্রয়েনের সেই সম্বন্ধ; বর্তমান যুগে, জর্মনির কাব্য জগতে ইঁহারা দুই জনই নেতা। জন্ম ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। ইনি পল্ ভার্লেনের শিষ্য।

ৎসেন্-ৎসান্—চীন দেশের কবি; মহাকবি তু-ফু ইঁহার বন্ধু ছিলেন। ছন্দের অনেক নূতন নিয়ম ইনি আবিষ্কার করিয়া যান।

তরু দত্ত—(খ্রীঃ ১৮৫৬-৭৭) ইনি রামবাগানের স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কন্যা। ইনি ইংরেজীতে কবিতা এবং ফরাসীভাষায় উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তরু দত্ত একুশ বছর ছয় মাস ছাব্বিশ দিন মাত্র জীবিত ছিলেন।

তাচিবানে-নো-মাসাতো—'তান্কা' ও 'হোক্কু' রচনায় জন্য বিখ্যাত; জন্মভূমি জাপান।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও

ভজন-রচয়িতা ; পাঞ্জাবের যেমন নানক, বারাণসীর যেমন কবীর, মহারাষ্ট্রের তেমনি তুকারাম। ইঁহার রচনা 'অভঙ্গ' নামে বিখ্যাত।

তু-ফু—(খ্রীঃ ৭১২-৭৭০) চীন-বাসীরা ইঁহাকে 'কাব্যের দেবতা' নামে অভিহিত করেন। ইনি সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কাব্যালোচনার খাতিরে ইনি রাজদরবারে চাকরি ছাড়িয়া দেন। শেষে অশেষ দুর্দশা ভোগ করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। 'হায় মা ভারতী !'

দু-ফ্রেনি—(খ্রীঃ ১৬৪৮-১৭২৪) কবি ও উদ্যান-শিল্পী ; ইঁহার রচিত কমেডিগুলি হাস্যরসে উৎপূর্ণ। জন্মভূমি ফ্রান্স।

দূদেতোৎ (মাদাম)—ইনি ফরাসী দেশের একজন মহিলা কবি। জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে।

দে-জুস্নি—(খ্রীঃ ১৭৬৪—১৮৪৬) ইনি ফরাসী দেশের কবি। অ্যাডি-সনের 'স্পেক্টেটরের' অনুকরণে ইনি অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন।

দে-মুসে—(খ্রীঃ ১৮১০—১৮৫৭) ফরাসী কবি ও নাট্যকার ; ইনি অলংকার শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; এবং তৎসত্ত্বেও সুকবি।

দৈনী-নো-সাম্মি—বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক মুরাসাকি শিকিবুর কন্যা ; জন্মভূমি জাপান।

'নাল-আদিয়ার'-গ্রন্থ—দাক্ষিণাত্যের জৈন কবির রচিত কোষ-কাব্য। এই গ্রন্থে একাধিক কবির রচনা আছে।

নিমতুল্লা—ইনি সৈয়দবংশ সম্ভূত এবং কবি।

নেজাতি—ইনি তুরস্কের কবি ; ক্রীতদাসের পুত্র হইয়াও চরিত্রগুণে সুলতান বায়াজিদের পুত্রগণের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তুরস্কের সমালোচকেরা বলেন, 'সিদ্ধপুরুষ ও ঐন্দ্রজালিকে যে তফাত, নেজাতি ও তাঁহার সমসাময়িক কবিদের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ।'

নৈলি—(খ্রীঃ ১৬৬৩-১৭৩৮) তুরস্কের কবি। ইঁহার পিতা কন্‌স্টান্টি-নোপলের হাকিম ছিলেন। ইনি স্মর্না, কাইরো ও শেষে মক্কার মোল্লা হইয়া-ছিলেন।

পট্টণত্তু পিল্লাই—দাক্ষিণাত্যের কবি ; ইনি শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু, গোঁড়ামি সহ্য করিতে পারিতেন না। জন্ম খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।

পাউণ্ড—ইংলণ্ডের উদীয়মান কবি ; জাতিতে ইহুদী।

ফজুলী—ইনি তুর্কী, আরবী ও

ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখিতেন; বোগদাদ নগরে ইহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্লেগে মারা যান ইনি 'হৃদয়ের কবি' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ফর্দুসী—ইহার প্রকৃত নাম আবুল কাসিম মনসুর; ইহার প্রধান রচনা 'শাহ-নামা'। ত্রিশ বৎসরে এই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সুলতান মামুদের কৃপণতায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইনি এক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন।

ফিজ্‌বল্‌—ইনি একজন ইংরেজ কবি।

ফৈজী—আকবরের সভাকবি ও আবুল ফজলের সহোদর; ইহার কতকগুলি রচনা 'মস্ক্‌-গজল্‌' বা কস্তুরী কবিতা নামে প্রসিদ্ধ। বেদমর্ম জানিবার জন্য সম্রাট আকবর ইহাকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া দেন। এই কাহিনী অবলম্বনে 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'সবিতা-সুদর্শন' নামক কাব্য রচনা করেন।

বড্‌ম্যান—নব্য জর্মনির কবি; জন্ম ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে; ইনি একজন ব্যারন্‌।

বদ্‌লেয়ার—(খ্রীঃ ১৮২১-১৮৬৭) ফরাসী কবি; ইনি 'সুন্দরকে মন্দ' দেখিতেন না, কিন্তু 'মন্দকে সুন্দর' দেখিতেন। ইহাকে বীভৎস রসের কবি বলা যাইতে পারে।

বাবর (ভারত সম্রাট)—সম্রাট আকবরের পিতামহ; ইনি কবিতাও লিখিতেন।

বায়েব্‌বম্‌—(খ্রীঃ ১৮৬৫ - ?) জর্মনির বর্তমান যুগের কবি।

ব্রাউনিং (এলিজাবেথ্‌) (খ্রীঃ ১৮০৬-১৮৬১) সাত বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। নারীর হৃদয়, পণ্ডিতের বুদ্ধি এবং কবির প্রাণ একাধারে ইহাতে সম্মিলিত ছিল। ইনি রবার্ট ব্রাউনিঙের পত্নী।

ব্রাউনিং (রবার্ট) (খ্রীঃ ১৮১২-৮৯) —ইহার রচনা স্থল বিশেষে অস্পষ্ট এবং শ্রুতিকটু হইলেও ইনি প্রকৃত কবি ছিলেন। মানব-হৃদয়ের ভাব-বৈচিত্রের সঙ্গে এরূপ গভীর পরিচয় অল্প কবিরই দেখা যায়।

বেইলি—ইংলণ্ডের সৈনিকদিগের প্রিয় কবি।

বেমন—তেলুগু কবি; রচিত গ্রন্থের নাম 'পদ্যমূলু'।

ভর্তৃহরি—রাজা ও কবি, প্রধান রচনা বৈরাগ্যশতক ও নীতিশতক।

ভল্‌তেয়ার—(খ্রীঃ ১৬৯৪-১৭৭৮) ফ্রান্সের সাহিত্য-সম্রাট। হাস্য-বিদ্রূপে অদ্বিতীয়।

ভার্লেন্ (পল্)—(খ্রীঃ ১৮৪৪-৯৬) ইহার কবিতা ভাব-সংকেতে অতুলনীয় ; জন্ম ফ্রান্সে।

ভিক্ষু—ইনি একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

ভোয়াজমার্টি—(খ্রীঃ ১৮০০-৫৫) ইনি হাফেরির কাব্যের ভাষার চেহারা বদলাইয়া দেন। ইহার পূর্ববর্তী কবিদের ভাষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মরিস্ (উইলিয়ম্)—সাম্যবাদের কবি ; জন্ম ইংলণ্ডে।

মাণিক্য-বাচকর — দাক্ষিণাত্যের কবি ; খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধান রচনা 'তিরু বাচকম্' অর্থাৎ আনন্দ-বাণী।

মামুদ শাবিস্তারী—ইনি একজন সুফি ছিলেন।

মায়গেল্ (অ্যাগ্নেস)—নব্য জর্মনির মহিলা-কবি ; ইহার মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য ; জন্ম ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে।

মিচি-নোবু-ফুজিবারা — কবি ও রাজমন্ত্রী ; জন্মভূমি জাপান।

মিলার—ইনি আমেরিকার কবি।

মিহ্রি—ইহার পুরা নাম 'মিহ্র'-মাহ্' বা 'সূর্য শশী'। ইনি তুরস্কের কবি নেজাতির শিষ্যা। ইনি রসিকা এবং স্বভাবতঃ প্রেমশীলা হইয়াও চরিত্র নির্মল রাখিতে পারিয়াছিলেন। মিহ্রি চিরকুমারী ছিলেন।

মীরাবাই—ইনি রাণা কুম্ভের পত্নী এবং পরম বৈষ্ণবী। ইহার ভক্তিমূলক সংগীতসমূহ অতীব মধুর।

মেং-হৌ-জান্—(খ্রীঃ ৬৮৯-৭৪০) ইহার রচনা 'অনুশোচনার অশ্রুর মতো মনোজ্ঞ।' ইনি চিরজীবন সাহিত্য-সাধনায় নিরত ছিলেন। জন্ম চীনদেশে।

মেসিহি—(খ্রীঃ ১৪৬০-১৫১২) ইনি তুরস্কের কাব্যে নবজীবন সঞ্চার করেন, সেইজন্য ইহাকে মেসিহি বা মেসায়া বলা হয় ; ইহার প্রধান রচনা 'গুল্-ই-শদ্বর্গ', 'শহর-এঙ্গিজ্' প্রভৃতি। 'শায়ের শহরের শাহ' নামেও ইনি পরিচিত।

যজুর্বেদ—চতুর্বেদের অন্যতম ; ইহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতায় বিভক্ত। এই দুই বিভাগকে সাধারণতঃ কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদ বলা হয়।

যুনাস্—ইনি তপ্তুখ্ নামক মহাপুরুষের শিষ্য ; যুনাস্ গুরুর জন্য যে ইন্ধন আনিতেন, তাহার মধ্যে একখানিও বাঁকা থাকিত না, গুরু এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন 'স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও যাহার আদর

নাই তাহা তোমার ঘরে কেমন করিয়া আনিব ?' যুনাস্ নিরক্ষর, কিন্তু কবি।

রসেটি (ক্রিষ্টিনা)—(খ্রীঃ ১৮৩০-১৮৯৪) ইংলণ্ডের স্ত্রী-কবি।

রাবেয়া—বসরা-বাসিনী স্ত্রী কবি ও ধর্মিষ্ঠা সুফি। ইনি চিরকুমারী ছিলেন। ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে জেরুসালেমে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রুমি (জালালুদ্দিন্)—(খ্রীঃ ১২০৭-১২৭৩) ইনি পারস্যের একজন প্রধান কবি ; জন্মভূমি বাল্খ। ইঁহার চরিত্র অতি মধুর ছিল, ইনি পথ দিয়া যাইবার সময় শিশুদিগকে অভিবাদন করিতেন।

রেক্সফোর্ড্—ইনি আমেরিকার কবি।

লাওয়েল—ইনি আমেরিকার কবি ; হুইট্ম্যানের পরে ইঁহার নাম উল্লেখযোগ্য।

লাতাঞ্চাঁ—ফ্রান্সের কবি ; হাসির গানের জন্য বিখ্যাত।

লায়াল (আলফ্রেড্) — সিভিলিয়ান কবি। জন্মভূমি ইংলণ্ড।

লি-পো—(খ্রীঃ ৭০২-৭৬২) চীনদেশের কবি ও যোদ্ধা ; ইঁহার কবিতা বিচিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ।

লিলিয়েঙ্ক্রন্—(খ্রীঃ ১৮৪৪-১৯০৯) জর্মনির কবি ও সৈনিক পুরুষ ; চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা রচনা করেন। ইঁহাকে 'মুক্ত বায়ুর কবি' বলে।

লী-হাণ্ট—(খ্রীঃ ১৭৮৪-১৮৫৯) ইংলণ্ডের কবি ; ইঁহার গদ্য রচনাও সুখপাঠ্য।

লেকঁৎ-দে-লিল্—(খ্রীঃ ১৮২০-১৮৯৪) 'কীর্তি ভবন যাত্রী' নামক ফরাসী কবিদিগের অগ্রণী ; জন্মভূমি রি-ইউনিয়ন্ দ্বীপ।

লেবিয়ে—ডাক্তার, কাব্য-রচয়িতা ও নারীহন্তা ; জন্মভূমি ফ্রান্স।

লেরেন্ (হার্ট)—(খ্রীঃ ১৮৬৪-১৯০৫) জর্মনির কবি।

ল্যাণ্ডর—(খ্রীঃ ১৭৭৫-১৮৬৪) ইংলণ্ডের কবি ; ইঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'Imaginery Conversations', বা 'কাল্পনিক কথাবার্তা'।

শাক্যো-নো-তায়ু-আকিসুকে — জাপানের কবি ; 'শ্রাব্য-চিত্র' রচনায় অদ্বিতীয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

'শি-কিং'-গ্রন্থ—কং ফুশিয়ো বা প্রভুপাদ কং কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন চীনদেশীয় কবিতার চয়ন-গ্রন্থ।

শিলার—(খ্রীঃ ১৭৫৯—১৮০৫) কবি ও নাট্যকার ; ইঁহার নাটকগুলি, সাধারণতঃ, উদ্দেশ্যমূলক হইলেও

কাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট নহে। জন্মভূমি জর্মনি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ— একশত পঞ্চাশখানি উপনিষদের অন্যতম।

সাউদী—(খ্রীঃ ১৭৭৪-১৮৪৩) ইংলণ্ডের কবি; ইনি আমাদের নবীনচন্দ্রের মতো অনেকগুলি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন।

সাগামি—ইনি একজন স্ত্রী কবি; জন্মভূমি জাপান।

সাদায়োরি—জাপানের কবি; ইঁহার পিতাও কবি ছিলেন।

সুইন্‌বার্ন—(খ্রীঃ ১৮৩৭-১৯০৮) ইঁহার কবিতাসমূহ সৌন্দর্যের খনি। ইনি অনূঢ় ছিলেন।

সুকুঙ—(খ্রীঃ ৮৩৪-৯০৮) কবি ও দার্শনিক; ইঁহার কাব্য সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও আধ্যাত্মিকতায় অতুলনীয়। জন্ম চীন দেশে।

সেন (দেবেন্দ্রনাথ)—'অশোক-গুচ্ছের' কবি। ইনি গদ্য রচনাতেও সুনিপুণ। ইংরাজীতেও কবিতা লিখিতেন।

হাইন্—(খ্রীঃ ১৭৯৯-১৮৫৬) ইনি 'ছোট ছোট ফুলে মালা' গাঁথিতেন; সেগুলি প্রফুল্ল মল্লিকার মতো চিরসুরভিত; ইনি জাতিতে ইহুদী। জন্মভূমি জর্মনি।

হাউটন্ (লর্ড)—(খ্রীঃ ১৮০৯-১৮৮৫) ইঁহার পূর্ব-নাম রিচার্ড মংটন মিল্‌নেজ; ইংলণ্ডের কবি।

হাতিফি — নূরুদ্দিন জামির শাগিনেয়; খোরাসানের অন্তর্গত জাম নামক স্থানে ইঁহার জন্ম। ইঁহার 'লয়লা-মজনু' কাব্যের প্রথম শ্লোক জামির রচিত।

হুইট্‌ম্যান্ — (খ্রীঃ ১৮১৯-৯২) আমেরিকার কবি; বাতাসের মতো ইঁহার ছন্দ কাহারও বশে আসিতে চায় না। বিশ্বপ্রেমের অগ্রদূত।

হুগো (ভিক্তর)—(খ্রীঃ ১৮০২-১৮৮৫) ইঁহার কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের অলংকার; ইঁহার উপন্যাস ফরাসী দেশের মহাভারত। টেনিসন্ ইঁহাকে 'হাসি ও অশ্রুর সম্রাট' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হুড—(খ্রীঃ ১৭৯৮-১৮৪৫) ইংলণ্ডের কবি; হাস্য-রসাত্মক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত।

হেষ্টিংস্ (ওয়ারেন্)—বঙ্গের প্রথম গবর্নর; ইনি কবিতা লিখিতে পারিতেন।

হোপ্—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ কবি।

হোরিকায়া—মন্ত্রীকন্যা ও রাজ-মাতার সহচরী; জন্মভূমি জাপান; খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

হোল্‌জ্‌ (আর্নো)—নব্য-জর্মনির কবি; জন্ম ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে।

ছায়া-সুষমা—ভারতীয় চিত্র-শিল্পীরা, ইংরেজীতে যাহাকে Shading বলে, তাহাকে 'সায়া-সুস্‌মা' বা 'ছায়া-সুষমা' বলিয়া থাকেন।

পাস্তম্‌—ইতালির যেমন সনেট্‌, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পাস্তম্‌। পাস্তম্‌ অর্থে গান বা গীতি-কবিতা। পাস্তমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরবর্তী শ্লোকের প্রথম এবং তৃতীয় চরণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণতঃ চারি শ্লোকে একটি পাস্তম্‌ সম্পূর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের, সংগমস্থলে গঙ্গা যমুনার মতো একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্তর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পাস্তমের অনুবাদ করেন। হুগো মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা না করিলেও তৎকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পাস্তমের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মৌলিক পাস্তম্‌ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দ-বিদ্যা ও কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বোটা—মরুযাত্রীরা জল রাখিবার জন্য যে চামড়ার বোতল ব্যবহার করে তাহাকে 'বোটা' বলে। ইংরেজী bottle শব্দ, বোধ হয় এই বোটা হইতে উৎপন্ন।

লম্ব—মাদাগাস্কারবাসীরা কম্বলকে 'লম্ব' বলে। সংস্কৃত, ভদ্রবেশধারী, 'লম্বশাট পটাবৃতের' ভিতর হইতে ঐ মাদাগাস্কারী পরিচ্ছদটা দেখা যাইতেছে না তো! 'জুজু'টা তো ঐ দিকেরই আম্‌দানী।

ফুলের ফসল (কাব্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল: ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৩১৮ (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৫। এই কাব্যগ্রন্থের আরও তিনটি সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালে, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেডের পক্ষে এলাহাবাদ হইতে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বসু কর্তৃক। উক্ত গ্রন্থের প্রিণ্টার ছিলেন শ্রীশরৎশশী রায়, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, ১এ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা। এই তৃতীয় সংস্করণের মূল্য ছিল এক টাকা এবং

উক্ত সংস্করণে কোন বিশেষ কারণে ভূমিকা এবং উৎসর্গপত্রটি বর্জিত হয়। এস্থলে আমরা উক্ত ভূমিকা এবং উৎসর্গপত্রটি মুদ্রিত করে দিলাম।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের দশ-বারটি কবিতা ইতিপূর্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকী নূতন।

এই কবিতাগুলি ১৩১৩ সাল হইতে ১৩১৭ সালের মধ্যে রচিত।

বিখ্যাত আর্টিস্ট শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের জন্য 'ফুলের ফসল' নামটি পুষ্প-ভূষিত করিয়া আঁকিয়া দিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা,
ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৩১৮ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* * *

উৎসর্গ

সতীর্থ-সুহৃদ
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
করকমলেষু—

* * *

'ফুলের ফসল' সম্পর্কে 'ভারতী' (আশ্বিন, ১৩১৮) পত্রিকা লেখেন, "শোভায়, সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে, মাধুর্যে 'ফুলের ফসল' যেন সত্যই একখানি ফুলের বাগান। ছন্দে যেনন লীলা-প্রবাহ, সুরে যেমন মধুরতা, ভাবেও তেমনি অভিনবত্ব! আমরা আগাগোড়া সকল কবিতাগুলি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ হইয়াছি।...কবি ছন্দ গাঁথিয়া দিয়াছেন, যেন ছবির পর ছবি সাজাইয়াছেন। শব্দচয়নেও অসাধারণ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। সংক্ষেপে, একথা অসংকোচে বলিতে পারি, 'ফুলের ফসল' বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একখানি উৎকৃষ্ট লিরিক।"

'সুপ্রভাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯) পত্রিকা বলেন, "এখানি কবির মৌলিক কবিতার বই। ইতঃপূর্বে কবি বিদেশী কবিদিগের কবিতাগুলি আপনার কবিত্বে মণ্ডিত করিয়া বঙ্গবাসীকে কাব্যসুধাপানে আনন্দিত করিয়াছেন। 'ফুলের ফসলের' কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা সমধিক আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কবিতাগুলি ফুলেরই মতো কোমল, মধুর, সৌরভময়। তাহা পড়িয়া কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে, 'ফুলের ফসল লুটিয়া যায়,' কে তার মধু আস্বাদন করিবে এস।"

প্রথম সংস্করণ 'ফুলের ফসল'-এর নামপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের পরিচয়-পত্রটি নিম্নরূপ :

ফুলের ফসল/শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/মূল্য আট আনা/প্রকাশক/শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত/ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস/২২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা/কান্তিক প্রেস/২০ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট,/কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত/।

কুহু ও কেকা (কাব্য)। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়: রাখী পূর্ণিমা, ১৩১৯ (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৭। পরবর্তীকালে এই কাব্যগ্রন্থের পরিবর্তিত আরও কয়েকটি সংস্করণ হয়। কবির মৃত্যু হয় ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ়। সে কারণ তৃতীয় সংস্করণ যেটি প্রকাশিত হয় ১৩৩১ (খ্রীঃ ১৯২৪) সালে, তার নামপত্রে মুদ্রিত ছিল স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সংস্করণ শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র কর্তৃক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

পরবর্তী সপ্তম সংস্করণে উল্লেখযোগ্য যা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা'হল: পরিশিষ্ট হিসাবে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বিরচিত কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও টীকা-টিপ্পনীর সংযোজন। এই সংস্করণের মূল্য তিন টাকা এবং এর প্রকাশক ছিলেন কলিকাতার আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স-এর শ্রীঅজিত শ্রীমানী। এই সংস্করণে উল্লিখিত পরিশিষ্টের 'টীকা-টিপ্পনী' অংশটি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা না হওয়ায় গ্রন্থাবলীর মধ্যে গৃহীত হয়নি।

অতঃপর এই গ্রন্থ দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকার পর ১৩৬৯ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার মিত্র ও ঘোষ নামক প্রকাশন সংস্থা উক্ত 'টীকা ও টিপ্পনী'সহ আর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'সবিতা'কে কবির প্রথম কাব্য-পুস্তিকা হিসাবে ধরা হলে, 'কুহু ও কেকা' সত্যেন্দ্রনাথের প্রকাশিত অষ্টম কাব্যগ্রন্থ। কবির অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয়-বিধৃত এই গ্রন্থখানি এক সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার নির্বাচন অনুযায়ী বঙ্গভাষার একশত গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয়। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পর্কে 'প্রবাসী' লেখেন, "সমগ্র কাব্যখানি বারংবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়া ইহা আমরা অসংকোচে বলিতে পারি, তাঁহার সমসাময়িক কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসনখানি দাবী করিবার পক্ষে কায়েম হইয়া গিয়াছে।"

'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে ভারতী (আশ্বিন, ১৩১৯) পত্রিকা বলেন, "ইহাতে একদিকে যেমন বসন্তের ললিত-মধুর, লঘু অথচ পরিপূর্ণতার আনন্দ-সুর, তেমনি বর্ষার বেদনানত অশ্রুভরা সকাতর করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে।"

'কুহু ও কেকা'র প্রথম সংস্করণের নামপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকর পরিচয়টি এইরূপ :

কুহু ও কেকা / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / এক টাকা / প্রকাশক / শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস/২২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট/কলিকাতা/ কান্তিক প্রেস/২০, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট/কলিকাতা/শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত/।

ধূপের ধোঁয়ায় (নাট্য)। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৩৩৬ (১২ই জুলাই, ১৯২৯)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর 'বেলা শেষের গান,' 'বিদায় আরতি' প্রভৃতি যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, 'ধূপের ধোঁয়ায়' তাদেরই অন্যতম। ১৩২৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যা থেকে এটি ধারাবাহিক প্রকাশ-লাভ করে। সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত গদ্য রচনাতেও যে কি পরিমাণ পারঙ্গম ছিলেন, এই নাটিকাটির মধ্যে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এটি তাঁর মৌলিক হাস্যরসাত্মক পৌরাণিক নাটক। সংগীতের উপভোগ্য আধিক্য এই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

এ সম্বন্ধে সন্‌জীদা খাতুন তাঁর 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' গ্রন্থে 'গদ্যরচনা' পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ বলেছেন, "এটি দাম্পত্য-জীবনের মান-অভিমান

নিয়ে লেখা হাস্যমধুর মিলনান্ত নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি পৌরাণিক। কাহিনীতেও পৌরাণিক ঘটনার সূত্র রয়েছে। সীতা, উর্মিলা, প্রভৃতির কনিষ্ঠা 'শ্রুতকীর্তি'র দুর্জয় অভিমানই নাটকীয় রস জমিয়ে তুলেছে।"...

'ধূপের ধোঁয়ায়' রচনার একটি ইতিহাস আছে। সেটি হ'ল: "১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রানুরাগী তরুণ লেখকরা 'রবিমণ্ডলী' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা গড়ে তোলেন। 'রবিমণ্ডলী' নামটি সত্যেন্দ্রনাথেরই দেওয়া। চারুচন্দ্র [বন্দ্যোপাধ্যায়], সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন, অসিতকুমার হালদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন 'রবিমণ্ডলী'র প্রধান উদ্যোক্তা। প্রতি পক্ষান্তরে রবিবার বিকেল তিনটের সময়ে পালাক্রমে এক একজন সদস্যের বাড়িতে অধিবেশন বসতো। সদস্যরা স্বরচিত নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। 'রবিমণ্ডলী'র প্রথম অধিবেশন হয় সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে। সত্যেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে তাঁর 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকাটি পড়েন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর স্মৃতিকথায় [যাদের দেখেছি] সেদিনের বৈঠকের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

"কেবল পাঠ নয়, সঙ্গে সঙ্গে কবি মৃদুকণ্ঠে গানগুলিও গেয়ে যেতে লাগলেন। বিস্মিত হলুম। ত্রিশ-একত্রিশটি গান, কিন্তু প্রত্যেকটি গানেই তিনি নিজে সুর দিয়েছেন—সুন্দর সুর, কোন কোন সুর আজও আবার মনে আছে।" [কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী (প্রথম খণ্ড), অলোক রায় লিখিত 'জীবন-কথা']

'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকাটির নামপত্র ও প্রকাশকের পরিচয়টি নিম্নরূপ:

ধূপের ধোঁয়ায়/নাটিকা/৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/আর্য সাহিত্য ভবন/কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,/কলিকাতা/১৩৩৬/প্রকাশক/শ্রীবারিদকান্তি বসু/প্রথম সংস্করণ/শ্রাবণ, ১৩৩৬/দাম পাঁচ সিকে/প্রিন্টার/শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়/বাণী প্রেস/৩৩এ মদন মিত্র লেন,/কলিকাতা/।

ছন্দ-সরস্বতী (প্রবন্ধ)। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: ফাল্গুন, ১৩৭৪ (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। সম্পাদনা করেন, ডঃ অলোক রায়।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির রচনাকাল ফাল্গুন, ১৩২৪। সম্ভবতঃ প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে (১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪) জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'র আসরে সত্যেন্দ্রনাথ পাঠ করেন। 'বিচিত্রা'র আসরে পঠিত প্রবন্ধের নাম 'বাংলা ছন্দ'।

'ছন্দ-সরস্বতী' সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে (পৃষ্ঠা ৫৪৩-৮৭) সম্পাদক সজনীকান্ত দাস সমগ্র প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করেন। 'শনিবারের চিঠি'র সেই সংখ্যায় 'সংবাদ-সাহিত্য' বিভাগে 'ছন্দ-সরস্বতী' সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, সেটির অংশবিশেষ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করে দিলাম—

"আষাঢ় সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের একটি উপাদেয় রচনা 'ছন্দ-সরস্বতী' 'ভারতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে দুই কাজই হইবে ; আমাদের অভিপ্রায় মতো একটি অপেক্ষাকৃত দুর্লভ রত্ন সুলভ করিয়া সত্যকার সাহিত্যসেবীগণের তৃপ্তিসাধন করা হইবে, কারণ যদিও এই রচনা বেশীদিনের নহে, তথাপি ইহা অনেকেরই অপরিচিত ; এবং সত্যেন্দ্রনাথের এমন কোনও রচনা-সংগ্রহ বা সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, যাহাতে উক্ত নিবন্ধ স্থান পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই আষাঢ় মাসের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান-স্মৃতি জড়িত আছে। সত্যেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা যত দিন যাইতেছে ততই নানা দিক দিয়া আমরা উপলব্ধি করিতেছি ; তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ এখনও সদ্য-শোকের মতই জাগিয়া রহিয়াছে। তাই সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রী সাধকের স্মৃতি-তর্পণ-মানসে আমরা এই রচনাটি এবার উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রচনা হিসাবেও বটে, আবার স্মৃতি-তর্পণের উপযোগী বলিয়াও বটে। রচনা হিসাবে ইহার বিশেষত্ব এই যে, আধুনিক বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলির আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য হইলেও, এবং সেই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হইলেও, ইহা ব্যাকরণ বা বিজ্ঞানের ভঙ্গীতে লেখা নয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট রসরচনা। আধুনিককালে কাব্যের আকারে তত্ত্বালোচনার এমন ভঙ্গী বিরল।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় গদ্য ও পদ্য দুই-এরই বিশিষ্ট শক্তি একই কালে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার কাব্যে যে মননশক্তি, তথ্যবিচার ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অসাধারণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সহজেই অনুমান হয়, তিনি গদ্যরচনাতেও বাংলা সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণও আছে—তাঁহার স্বল্প পরিমাণ গদ্য রচনার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা জানেন, সেদিকেও তাঁহার কতখানি শক্তি ছিল। বর্তমান রচনাতে পাঠক সে শক্তির পরিচয় পাইবেন। তথাপি বর্তমান রচনার লক্ষণ এই যে ইহাতে একটি প্রকাণ্ড গদ্য-বস্তু অপূর্ব কাব্যগুণসমন্বিত হইয়াছে—ছন্দ-কবিকে আমরা এখানে গদ্য-কবি রূপে পাইতেছি। এ রচনার আরও মূল্য এই যে, ইহাতে স্বর্গীয় কবি তাঁহার কবি-জীবনের একটা নিজস্ব সাধনার পরিচয় দিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার আত্মকাহিনী বা প্রাণের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু ছন্দ সম্বন্ধে অতি সরস ও সুললিত আলাপ হিসাবেই নয়—কবির কাব্য-চর্চার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় হিসাবে এ রচনা তাঁহার কাব্যগ্রন্থের ভূমিকারূপে সংকলিত হইবার যোগ্য।...সুলেখক হইতে হইলে কতখানি পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও লিপিচাতুর্যের প্রয়োজন, একথা আধুনিক বড় বড় কবি-লেখকরা বুঝিবেন না; কিন্তু যাঁহারা লেখক নন, পাঠকমাত্র অর্থাৎ যাঁহাদের কিছুমাত্র লজ্জা বোধ আছে, তাঁহারা এরূপ রচনা পাঠ করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।" (পৃষ্ঠা ৬৩০-৩২)

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ছন্দ-সরস্বতী'র 'গ্রন্থপরিচয় ও আলোচনা'র মধ্যে (পৃষ্ঠা ৫৩-৭৬) সম্পাদক ডঃ অলোক রায় বিস্তারিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নামপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের পরিচয় এইরূপ:

ছন্দসরস্বতী/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/অলোক রায়/সম্পাদিত/আনন্দধারা প্রকাশন/প্রথম প্রকাশ/ফাল্গুন, ১৩৭৪/প্রকাশক/মনোরঞ্জন মজুমদার/৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট/কলিকাতা ১২/মুদ্রাকর :/বীরেশ্বর চক্রবর্তী/স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স/১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট/কলিকাতা ৯/২'৫০/।